কুমারী মাতা বাসবী

শৌভিক গুপ্ত

সৌদীপ
নিশ্চিন্দা ১ নং, ঘোষপাড়া বালী
হাওড়া-৭১১২২৭

প্রকাশক : সৌদীপ
নিশ্চিন্দা ১ নং,. ঘোষপাড়া বালী
হাওড়া-৭১১২২৭

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৯

প্রচ্ছদ : সাম্পান, দ্য 'জি' জোন
৪৩৮/২, নিশ্চিন্দা (পূ:)
বালি-হাওড়া—৭১১২২৭

অক্ষর বিন্যাস : রীতা পাল
পশ্চিম শান্তিনগর, বেলুড়, হাওড়া

প্রাপ্তিস্থান : বিশ্ববীক্ষা প্রকাশনী
৩৩-এ, বেনিয়াটোলা লেন।
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

—শ্রীশিবশঙ্কর চক্রবর্তী

প্রীতিভাজনেষু।

লেখকের কলমে ঃ

"মহাভারতের কথা অমৃতসমান"—সত্যই অমৃতময় এই কাব্য যার সুধারস পান করে মানুষ সংসার জীবনের যাবতীয় অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করে। জীবনের সুখ দুঃখু, আশা-আকাঙ্খা, ব্যথা বেদনা, আনন্দ নৈরাশ্য, ঈর্ষা, হিংসা, প্রতিহিংসার সঙ্গে মিশে আছে ন্যায়, নীতির সঙ্গে যাবতীয় জীবনবোধ, যার মুল্যায়নে মননের প্রতিটি সূত্র এই মহাকাব্যের মধ্যে আমরা প্রতিফলিত হতে দেখেছি। মহাকাব্যের কবি একেকটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সাংকেতিক ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন জীবনের একেকটি পরম ও চরম সত্যকে। 'কুমারী মাতা বাসবী'—নিছক উপন্যাস নয়, এটি হলো এক নাবী মনের সংঘাতময় জীবন দলিল। এই বাসবী চরিত্রটিকে ঘিরেই মহাভারতের মতো এক বিশাল মহাকাব্যের গতি প্রকৃতি অনেকখানি নির্ধারিত হয়েছে। সামান্য এক নারী কেমনভাবে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে অসামান্যা হয়ে উঠলেন, দাসকন্যা থেকে রাজবধু পরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন রাজমাতা হিসাবে। তার সমগ্র জীবন ঘিরে ফুটে উঠেছে নারী জীবনের শাশ্বত চাওয়া পাওয়ার বিন্যাস। একটি সু-বিখ্যাত বংশধারা ধর্ম পথ ত্যাগ করে কেমনভাবে অধর্মের পথে বাহিত হল, তার যথার্থ উত্তর খুঁজে পেতেই জীবন যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত রাজামাতা বাসবী তমো ও রজো গুণের জটিলতার উত্তরণ ঘটিয়ে, কুমারী অবস্থায় প্রভাবিত ঋষি সন্তানের হাত ধরে আত্মজাগরণে সত্বগুণের মধ্যে জীবনের প্রকৃতসত্যকে উন্মোচিত করেছেন। মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য কোন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন আত্মবিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে কেবল নিজেকে চেনার।

এর আগে "দেবযানী" ও "রাজা যযাতি"—উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে যে পরম্পরার ধারা রচিত হয়েছিল, "কুমারী মাতা বাসবী" হলো—সেই ধারার একটি পরিণত রূপ।

আমার এই রচনাটি আড়ালে আছে বহু বিদগ্ধ পণ্ডিতজনের রচনার প্রভাব। পৃথকভাবে তাদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করতে হলে সেই

তালিকা অবশ্যই দীর্ঘ হবে, বলে সেই পথে না গিয়ে, শুধু জানাই তাদের প্রতি আমার মনের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞ তরুণ প্রকাশক গৌরাঙ্গ নাগের কাছে। সে সাহসী ও উদ্যোগ না নিলে এই লেখা সম্ভব হত না। আপ্রাণ চেষ্টা করেছি রচনাটিকে সুখপাঠ্য করে করার, সেই সঙ্গে আধুনিক দৃষ্টি কোন থেকে মহাভারতকে নতুন চোখে দেখার। একটা কথা মনে রাখতে হবে মহাভারতের ভাষা অত্যন্ত সাংকেতিক। এই সাংকেতিক ভাষার আবরণকে উন্মেচিত করলে, আমরা বর্তমান জীবনকেই যেন স্পষ্টত প্রতিফলিত হতে দেখি—এখানেই বুঝি মহাভারত মহাকাব্যের প্রকৃত সার্থকতা। ভালো লাগা, মন্দ লাগার বিচার করবেন পাঠকেরা। যদি আমার এই লেখা পাঠকমনকে ছুঁতে পারে তাহলেই লোক হিসাবে নিজেকে সার্থক মনে করবো।

শৌভিকগুপ্ত

মহারাজ শান্তনু। হস্তিনাপুরের অধীশ্বর। বিশাল যার সাম্রাজ্য—সেই রাজার মনে সুখ নেই, স্বস্তি নেই, শান্তি নেই। চোখের পাতা বুজতে চায় না। ঘুমহীন রাত পার হয়ে যায় নি:শব্দে। বিমর্ষ রাজা ডুবে থাকেন এক সুগভীর আত্মমগ্নতায়। কিসের এত চিন্তা? রাজ্যে কোন অশান্তি নেই। বিদ্রোহের সম্ভবনা নেই, নেই আক্রান্ত হওয়ার কোন দু:চিন্তা। রাজ্য তার সুরক্ষিত। তাহলে রাজার মনে সুখ নেই কেন? কেন এক বিষাদঘন অবসন্নতা তাকে সবসময় গ্রাস করে থাকে। দেখে মনে হয় জীবন থেকে তিনি যেন বেঁচে থাকার অর্থ ভুলে যেতে বসেছেন। আনন্দ হারিয়ে গেছে। রাজপাট ভুলে এখন তিনি নিজের কক্ষেই কাটান সর্বক্ষণ। প্রিয় পুত্র দেবব্রতকেও তিনি মুহুর্তের জন্য কাছে ডাকেন না। সমস্ত প্রজাকুল রাজার এই আচরণে স্তম্ভিত। কিন্তু রাজাকে প্রশ্ন করার সাহস কারো হয় না। কে প্রশ্ন করবে রাজাকে? কার আছে সেই দুঃসাহস। সবচেয়ে বেশী বিপন্ন বোধ করেন যুবরাজ দেবব্রত। এই বিশাল রাজপুরীতে পিতাই ছিলেন তার একমাত্র ভরসা। পিতার হাত ধরেই তিনি এই রাজপুরীতে একদিন প্রবেশ করেছিলেন। দেখেছেন পিতা শান্তনুর আনন্দ আপ্লুত হৃদয়ের নির্মল অভিব্যক্তি, অথচ আজ সেই পিতা তাকে একবারের জন্যেও কাছে ডাকেন না। নিজের মধ্যে অস্থিরতাবোধ করেন যুবরাজ দেবব্রত। কে দিতে পারে তাকে পিতার মনের খবর?

অন্ধকারে নক্ষত্র খচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন রাজা শান্তনু। মন তার বেদনাক্লিষ্ট, যন্ত্রণায় জর্জরিত। মনে হয় তার এই জীবন মিথ্যে—কি হবে এই জীবনকে রেখে। যে জীবন আপন ইচ্ছাকে প্রকাশ করতে ভয় পায়, সেই জীবনের মূল্য কি আছে! রাজা—কিসের

রাজা—কোথায় আমার নিজস্ব স্বাধীনতা। অসহায় রাজা নিজেকে ধীক্কার দেন। মনে মনে বলে ওঠেন, "ওহে শান্তনু, এখন বুঝতে পারছ জীবন কত কঠিন, কেউ এখন তোমার মনের গোপন ইচ্ছার মূল্য দেবে না। তুমি এখন পৌঢ়রাজা—এই ভাবনা যদি তোমার মনে আগে আসত, তাহলে সেটা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হত, কিন্তু এখন আর হয় না। এখন তোমার সামনে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গা পুত্র দেবব্রত। এই দেবব্রতকে তুমি রাজসভায় সর্বজনের সামনে দাঁড়িয়ে যুবরাজ বলে ঘোষনা করেছ, তাহলে আজ কি করে তুমি তোমার ইচ্ছাকে পূরণ করবে মহারাজ শান্তনু? দেবব্রত'র মুখের দিকে তাকিয়ে তুমি জনসমক্ষে তোমার মনের কথা প্রকাশ করতে পারবে কি? যদি পার তাহলে বুঝবো তুমি রাজা—একজন সত্যিকার প্রেমিক মানুষ।

ভাবতে গিয়ে একরাশ চিন্তা আবার তাকে নতুন করে আছন্ন করে তোলে। আকাশের দিকে তাকিয়ে নক্ষত্রমালার মধ্যে তার সামনে ভেসে ওঠে এক অনুপম অপরূপার মোহময় রূপশ্রী, যার ওষ্ঠের হাসি যেন রাজাকে ব্যঙ্গ করছে। বলছে, তুমি ভিরু, তুমি কাপুরুষ, তুমি কখনই প্রেমিক হতে পার না। তার অঙ্গের প্রতিটি পরতে পরতে আছে কামনার ইশারা। বিমোহিত রাজা শান্তনু প্রাণপন চেষ্টা করেন ওই মুখশ্রীকে ভুলে যেতে। যত তিনি চেষ্টা করেন, ততো যেন সে আরও গভীর ভাবে তাকে কামনা বিদ্ধ করে। নিজেকে বড় অসহায় বলে মনে হয় রাজার। এই মুহুর্তে তিনি কার কাছে যাবেন, কাকে বুঝিয়ে বলবেন নিজের মনের কথা। এতো এক অসম্ভবকে সম্ভব করার ঈপ্সিত বাসনা মাত্র। যদি এই ইচ্ছেকে প্রকাশ করা সহজ হত, তাহলে রাজা শান্তনু সেইদিনই মেনে নিতে পারতেন দাসরাজার ওই শর্ত। কিন্তু এখন আর সেটা সম্ভব নয়। দেবব্রতকে তিনি ইতিমধ্যে যুবরাজ বলে ঘোষণা করেছেন, এখন তিনি কি ভাবে দাসরাজার শর্তে মত দেবেন। দাসরাজার শর্ত যে সাংঘাতিক শর্ত-এই শর্ত মেনে নেওয়া মহারাজ শান্তনুর পক্ষে সম্ভব নয়। আর তিনি নিজে মানলেও রাজ্যের প্রজারা তা মানবে কেন। প্রজারা রাজরানী হিসাবে গঙ্গাকে মেনে নিতে না পারলেও, যুবরাজ হিসাবে দেবব্রতকে তারা মেনে নিয়েছে। তারা বুঝেছে দেবব্রত হলেন এই সাম্রাজ্যের যোগ্য উত্তরসুরী। কাজেই প্রজাদের বিক্ষুব্ধ করে,

দেবব্রতকে কোনভাবেই তার পক্ষে বঞ্চিত করা সম্ভব নয়। যদি তিনি সেই চেষ্টা করেন তাহলে রাজ্য জুড়ে শুরু হবে বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের আগুনে দগ্ধ হবে শান্তনুর রাজপরিবারের সমস্ত ঐতিহ্য। অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করেই রাজা শান্তনু সেদিন ফিরে এসেছিলেন কোন উত্তর না দিয়ে। কৈবর্ত পল্লীতে দাঁড়িয়ে তিনি দাসরাজাকে উদ্ধত কণ্ঠে বলতে পারেন নি 'হ্যাঁ আমি আপনার সমস্ত শর্তে রাজি।' আবার অপরদিকে মন থেকে মুছে ফেলতে পাচ্ছেন না কৈবর্ত পল্লীর ওই রমণীয় যুবতীর অনুপম রূপ লাবণ্যকে। অসাধারণ এক পুলক চঞ্চল সুরভি তার অঙ্গ থেকে প্রভাসিত হয়ে সমগ্র সমীরণকে যেন এক মদির নেশায় আপ্লুত করে তুলেছিল। পুষ্পগন্ধ হার মানে তার অঙ্গশোভা বিচ্ছুরিত সুরভি গন্ধের কাছে। নির্মল মসৃন নিটল দেহ জুড়ে যেন কামনার শতধারা সুতীব্র বেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, বিচরণে সর্বক্ষণ রাজা শান্তনু যেন ওই রূপময়ীকে নিজের অন্তরে অনুভব করেন। মনে পড়ে সেই কতকাল আগে গঙ্গা তাকে পরিত্যাগ করে গেছেন। তারপর থেকে এক মহাশূণ্যতা নিয়ে তিনি চলেছেন। তার শূণ্য হৃদয়কে ভরে দেবার মতো আর কোন নারীর সন্ধান তিনি পাননি। অথচ জীবনে চলার পথে বিশেষ করে একজন পুরুষের জীবনে নারীতো হল এক অপরিহার্যবস্তু, যাকে বাদ দিয়ে কোন পুরুষ কখনই পূর্ণতা পায় না। আজ সেই পূর্ণতা পাওয়ার দুর্লভ মুহুর্ত উপস্থিত, অথচ তিনি অপারক। ভাবতে গিয়ে নিজেকে অসহায় আর রিক্ত বলে মনে হল মহারাজ শান্তনুর। তিনি তার মনের কথা, মনের ব্যথা, মনের নিজস্ব স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্খার কথা কাকে বলবেন। কে শুনবে তার কথা। প্রতিটি রাত তার কত নিঃসঙ্গ কেটেছে—এই নিঃসঙ্গতার মমার্থ তিনি কার কাছে ব্যক্ত করবেন। পুত্র দেবব্রতকে পেয়ে তিনি সুখী হয়েছেন একথা সত্য, মনের সুগভীর চাহিদারতো নিবৃত্তি ঘটেনি। শয্যায় একাকী শয়নের যন্ত্রণা যে কত মর্মান্তিক তা কাউকে বোঝাতে পারেন না রাজা। বুকের ভিতর তোলপাড় হয়ে যায়। ভূ-কম্পনের মতো কেঁপে ওঠে সমস্ত চেতনার স্তর। মনে পড়ে গঙ্গার কথা। তার রূপেও তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু এমন ভাবে গঙ্গা তাকে বিবশ করে দিতে পারেননি। যদি গঙ্গা তা পারতেন তাহলে মহারাজ শান্তনু তাকে সহজে যেতে দিতেন না।

গঙ্গাকে বিবাহ করার সময় তার শর্ত ছিল, সেই শর্তের তুলনায় দাসকন্যাকে বিবাহ করার শর্ত সম্পূর্ণ আলাদা। এই শর্ত হল একটা সত্য পরম্পরাকে নষ্ট করার শর্ত।

মহাভারতের কাহিনীকার অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে শান্তনুর কাছে গঙ্গার শর্ত আরোপ করেছিলেন। মহাভারতের কাহিনী অনুসারে জানা যায় ইক্ষুবংশীয় রাজা মহাভীষ নিজের সাধনা বলে স্বর্গবাসের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। একবার ব্রহ্মার সভায় কতিপয় দেবগণের সঙ্গে মহাভীষ উপস্থিত ছিলেন। সভা চলাকালীন সহসা সেখানে উপস্থিত হলেন গঙ্গাদেবী। দ্রুত প্রবেশকালে পবনদেবের নি:শ্বাসে তার বক্ষ আবরণ কিঞ্চিত স্খলিত হলে উপস্থিত দেবগণ লজ্জায় মাথা নিচু করে দৃষ্টি নামিয়ে নিলেও মহাভীষ কিন্তু তার দৃষ্টি গঙ্গা বক্ষে স্থির রেখেছিলেন। ঘটনাটি চকিতে ঘটলেও ব্রহ্মার দৃষ্টি এড়ানো সম্ভব হল না। তিনি কুপিত হয়ে মহাভীষকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, তোমার মধ্যে এখনও কামনার লয় হয়নি, তুমি এই মুহুর্তে মর্ত্যলোকে ফিরে যাও। কামনা মুক্ত হয়ে পুনঃবার ভোগক্রান্তিকাল অতিক্রম করে পুন্যালোক স্বর্গে ফিরে এস। সেই শাপভ্রষ্ট শতভীষ মর্ত্যে এলেন মহারাজ প্রতীপের পুত্র শান্তনু হয়ে।

শুধু তিনি একা নয় তার সঙ্গে অভিশপ্তা হলেন স্বয়ং গঙ্গাদেবী। ঘটনাটার যদি এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটতো, তাহলে গঙ্গাদেবীর পক্ষে এত দ্রুত মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করে স্বর্গে ফিরে যাওয়া সম্ভব হতো না, প্রয়োজন হতো না শর্ত আরোপের। শর্ত আরোপের জন্যই মহাভারতের কাহিনীকার পার্শ্ববর্তী উপকাহিনী তৈরী করে এই আখ্যানের সঙ্গে অত্যন্ত নিপুনভাবে বুনে দিয়েছেন, যার ফলে গঙ্গার শর্ত আরোপ কিছুটা হলেও বাস্তব রূপ নিতে পেরেছে। এখন জানা দরকার সেই উপকাহিনীটি কি! সেই উপকাহিনী হল বসুগণের প্রতি বশিষ্ঠ্যের অভিশাপ। একবার সুমেরু পর্বতে বশিষ্ঠ্য আশ্রমে অস্টবসুগণ স্বপত্নী সহ বিহারে গিয়েছিলেন। এই সময় বশিষ্ঠ্যদেব আশ্রমে ছিলেন না। ফলে তারা আশ্রমের সর্বত্র বিহার করতে লাগলেন। এই বিহার কালেই তারা দেখতে পান বশিষ্ঠ্যের প্রিয় হেমধনু নন্দিনীকে। তারা জানতেন এই নন্দিনীর দুগ্ধ পান করলে মনুষ্যগন স্থিরযৌবন ও দীর্ঘজীবন লাভ

করে যাকে। সেই কারণে কনিষ্ঠবসু দ্যু'র পত্নী তার প্রিয় সখী উর্বশীর তনয়ার জন্য ওই নন্দিনীকে হরণ করার প্রস্তাব দেন। স্ত্রীর অনুরোধে দ্যু তার অন্য ভ্রাতাদের নন্দিনী হরণের জন্য প্রলুব্ধ করেন এবং তারা শেষ পর্যন্ত সকলে মিলে নন্দিনীকে হরণ করেন।

আশ্রমে ফিরে বশিষ্ঠ্যদেব নন্দিনীকে দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে পড়েন। প্রথমে অন্বেষণ করেন। পরে তিনি ধ্যানে বসে দিব্যচক্ষু বলে নন্দিনী হরণ প্রত্যক্ষ করেন। সমস্ত ঘটনা অবগত হওয়ার পর বশিষ্ঠ্যদেব বসুগণকে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণের অভিশাপ দেন। বসুগণ বশিষ্ঠ্যের কাছে কাতর অনুনয় করায় অবশেষে বশিষ্ঠ্যদেব বললেন, তোমরা সাতজন মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করেই অভিশাপ মুক্ত হবে। একমাত্র কনিষ্ঠ বসু দ্যুকে মনুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণ করে সংসারের যাবতীয় রোগ, শোক, তাপ, জরা গ্রহণ করে, সর্বশাস্ত্র বিশারদ ও পিতৃভক্তের আদর্শ নিদর্শন রেখে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করে দীর্ঘদিন বাস করতে হবে। এই 'দ্যু' হলেন মহাভারতের অন্যতম নায়ক মহামতি ভীষ্ম।

এদিকে অভিশপ্তা সরিদ্বরা গঙ্গা যখন স্বর্গলোক ত্যাগ করে মর্ত্যে আসছেন সেই সময় পথমধ্যে বসুগণের সঙ্গে তার দেখা হয়। বসুগণ গঙ্গার কাছে তাদের অভিশাপের কথা বললেন এবং তারা মিনতি করলেন মর্ত্যলোকে গিয়ে তিনি যেন তাদের জননী হয়ে মুক্ত করেন। গঙ্গা বললেন—তোমরা কি ভাবে মুক্ত হবে?

—জন্মমাত্র আপনি আমাদের আপনার পবিত্র সলিলে নিক্ষেপ করবেন। কেবল কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্যুকে জলে বিসর্জন দেবেন না। তার পাপ কর্মের ফল যথার্থভাবে ভোগ করার পর তার অভিশাপ মুক্তি ঘটবে। দীর্ঘায়ু মানুষের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। বসুগণের এই আবেদনে দেবীগঙ্গা সাড়া দিয়ে বললেন, ঠিক আছে তাই হবে। আমি মর্ত্যে শতভীষের সঙ্গে মিলনের ফলে তোমরা মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করবে। আমি তোমাদের অভিশাপ মোচন করবো।

এই অভিশাপ মোচনের উদ্দেশ্য নিয়েই গঙ্গাদেবী মর্ত্যে এসে মিলিত হলেন শতাভীষের অপররূপ রাজা শান্তনুর সঙ্গে। কেন মহাভারতের কাহিনীকার শর্ত আরোপ করেছিলেন, আর এই শর্তকে বাস্তবায়িত

করার জন্য যে উপকাহিনীর তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, তার থেকে বোঝা যায় তিনি কত বড় কাল্পনিক কাহিনীকার ছিলেন। প্রতিটি কাহিনীর সঙ্গে প্রতিটি উপকাহিনীকে তিনি এত নিখুঁত ভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন যে একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে ফুটিয়ে তোলা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। যদি এই শর্ত বসুগণের দ্বারা প্রার্থিত না হত, তাহলে একমাত্র ভীষ্মের পক্ষে যেমন দীর্ঘায়ু নিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না, তেমনি গঙ্গারও অভিশাপমুক্তি ঘটতো না। তাকেও রাজরানী হয়ে দীর্ঘকাল মর্ত্যে বাস করতে হত।

পাঠকদের এই অবসরে পুরাণ কথিত গঙ্গার উৎপত্তির কথা বলে নেওয়া দবকার। কথিত আছে, দেবর্ষি নারদ নিজেকে একজন মহা সঙ্গীতজ্ঞ বলে মনে করতেন। এরজন্য তার মনে ছিল যথেষ্ট অহংকার। নারদের এই অহংকারের জন্য রাগ-রাগিনীরা একবার তার প্রতি বিরক্ত হয়ে তাকে ত্যাগ করেন এবং তারা বিকলাঙ্গ নারী হয়ে তার গমন পথের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। নারদ তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তারা নিজেদের পরিচয় দিলেন। নারদ তখন বুঝতে পারলেন তার অহংকারের জন্যই রাগ-রাগিনীদের এমন দশা হয়েছে। তখন তিনি বিনীতভাবে তাদের কাছে প্রতিকার জানতে চাইলে, তারা বললেন, একমাত্র মহাদেব সঙ্গীত করলে তবেই আবার তারা স্বস্থানে ফিরে যাবেন। অগত্যা নারদ এসে ধরলেন মহাদেবকে। মহাদেবতো আগেই যোগবলে সমস্ত ঘটনা জেনে গেছেন। তাই তিনি নারদকে বললেন, দেখহে নারদ, আমি গান গাইতে পারি, যদি ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুকে আমার সামনে উপস্থিত করতে পার। একমাত্র আমার সঙ্গীতের উপযুক্ত শ্রোতা হলেন ওই দুইজন। মহাদেবের এই কথাশুনে নারদ ছুটলেন ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর কাছে। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর ব্রহ্মা ও বিষ্ণু রাজি হলেন। তারা মহাদেবের সামনে হাজির হলে . মহাদেব তার সঙ্গীত শুরু করলেন। ব্রহ্মাদেব সেই সঙ্গীতের যথার্থ মমার্থ বুঝতে পারলেন না, বিষ্ণু কিছুটা অনুধাবন করায় তার চরণযুগল ঘর্মাত হল। ব্রহ্মাদেব বিষ্ণুর সেই চরণ বিগলিত ঘর্ম্ম আপন কমণ্ডলুতে ধারণ করে রাখলেন। বিষ্ণুর সেই চরণযুগল বিগলিত ঘর্ম্মই হলেন গঙ্গা। বহুপরে ভগীরথ তার পূর্বপুরুষদের উদ্ধারের জন্য কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে

সন্তুষ্ট করলে, ব্রহ্মা তার কমণ্ডলু থেকে ওই ধারা নির্গত করেন। প্রচণ্ড বেগে ওই ধারা নির্গত হওয়ায় মহাদেব তার জটায় ওই ধারাকে ধারণ করেন এবং পরে তাকে বিন্দু সরোবরে ত্যাগ করেন। এখানেই গঙ্গা সপ্তধারা হন। তারমধ্যে একধারা ভগীরথের অনুগামিনী হয়। এই ধারাই ভাগীরথী বা গঙ্গা নামে হিমালয়ের গোমুখ তীর্থ' দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভারতবর্ষের মাটিকে স্পর্শ করেছে। পরে বহুগ্রাম, নগর, উপনগর পার হয়ে অবশেষে কপিলমুনির আশ্রমে প্রবেশ করে সাগর রাজার আত্মজগণকে উদ্ধার করে সাগরে বিলীন হন। এই কাহিনী আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। আবার অন্য পুরাণ মতে, গঙ্গা হলেন হিমালয় কন্যা। দেবগণের প্রযত্নে মহাদেবের সঙ্গে তার বিবাহ হলে মাতা মেনকা তার অদর্শনে কাতর হয়ে পড়েন এবং অভিশপ্ত করেন। ইনি সেই মাতৃশাপে জল রূপিনী হয়ে ব্রহ্মা কমণ্ডলুতে বাস করেন অতঃপর কপিলমুনির অভিশাপে সাগরবংশ ধ্বংস হলে, ভগীরথ পূর্বপুরুষদের উদ্ধারের জন্য ব্রহ্মাকে তুষ্ট করেন। ব্রহ্মলোক থেকে গঙ্গা পতিত হলে মহাদেব তাকে স্বীয় জটায় ধারন করেন পরে-বিন্দু সরবরে ত্যাগ করেন। বিন্দু সরবরে পতিত হয়ে গঙ্গা সপ্তধারায় প্রবাহিতা হন। এই সপ্তধারার মধ্যে হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী নামে তিনধারা পূর্বদিকে, সীতা, সিন্ধু ও সুচক্ষু নামে তিনধারা পশ্চিমদিকে গমন করে। অন্য একটি ধারা ভগীরথের পশ্চাদ্‌গামিনী হওয়ায় তার নাম হয় ভাগীরথী। এই সমস্ত ধারার মধ্যে একমাত্র গঙ্গাই স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল-সর্বত্র গামিনী হয়েছেন। কথিত আছে ব্রহ্মলোক দর্শন করে আসার পথে এই স্থলেই বসুগণের সঙ্গে গঙ্গার সাক্ষাৎ হয় এবং তাদের অনুরোধে তিনি জননী হয়ে মর্তে নেমে আসেন।

পুরানের সমস্ত কাহিনীগুলো একজোট করে মহাভারতের ব্যাখ্যা দিয়ে বলা যায়, কাহিনীকার সত্যি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ বসুগণ শাপভ্রষ্ট না হলে গঙ্গার পক্ষে মানবী রূপে দীর্ঘদিন শান্তনুর সঙ্গে রাজগৃহে বাসকরা সম্ভব হত না, প্রয়োজন হতো না বিবাহের সময় কোন শর্ত আরোপের।

গঙ্গাদেবী মানবী মূর্ত্তি ধারণ করে প্রথমেই একটি ভুল করেছিলেন। অবশ্য এটাকে ভুল বলা যায় না, এই ভুলেরও প্রয়োজন ছিল।

মহাভারতের রচয়িতা তাই প্রয়োজনের তাগিদে আবার একটি সুন্দর কাহিনীর অবতরণা করেছেন। রাজা শান্তনুর পিতা প্রতীপ ছিলেন নিঃসন্তান। তিনি একদিন গঙ্গার ধারে বসে একমনে তপস্যায়রত ছিলেন। এক সময় গঙ্গাবক্ষ থেকে এক অপরূপা নারী উঠে এসে দাঁড়ালেন রাজা প্রতীমের সামনে। তারপর সেই নারী রাজা প্রতীপের ডান উরুতে বসে অনুনয়ের সুরে বললেন, হে রাজন, 'আমি দিব্যাঙ্গ না, আমি আপনাকে স্বামী রূপে পেতে চাই।

উত্তরে রাজা প্রতীপ বললেন, হে কন্যা, তুমি আমার দক্ষিণ উরুতে উপবেশন করেছ কাজেই তোমাকে আমি পত্নীরূপে গ্রহণ করতে পারি না। এই দক্ষিণ উরু কেবলমাত্র কন্যা, ও পুত্রবধুদের জন্য উপযুক্ত আসন, সুতরাং তোমাকে আমি পুত্রবধু হিসাবে বরণ করে নিলাম।

গঙ্গা বললেন, মহারাজ আমি আপনার আদেশ শিরধার্য করছি। তবে আপনার পুত্রকে বলে দেবেন সে যেন কোনদিন আমার কোন কাজের বিচার না করে, কোন কাজের কারণ জানতে না চায়। রাজা প্রতীপ বললেন, কন্যা আমি অপুত্রক। পুত্র যদি হয় তাহলে নিশ্চয় তাকে স্মরণ করিয়ে দেব তোমার কথা।

গঙ্গা বললেন—আপনি অচিরেই পুত্রলাভ করবেন। এরপর রাজা প্রতীপ পুত্র কামনায় স্বস্ত্রীক তপস্যা শুরু করলেন। এই তপস্যার ফলেই স্বর্গচ্যুত অভিশপ্ত মহাভীষ শান্তনুরূপে রাজা প্রতীপের পুত্র হয়ে জন্ম নিলেন। এই কাহিনীরও প্রয়োজন ছিল তা না হলে শান্তনুর জন্মের যথার্থ বাস্তবতা থাকেনা। পরে শান্তনুর যৌবনপ্রাপ্ত হলে রাজা প্রতীপ তাকে একদিন বললেন, শোন পুত্র, তোমার জন্মের আগেই আমি এক দিব্যাঙ্গনা রমণীকে পুত্রবধূ হিসাবে স্বীকার করেছিলাম। যদি সেই দিব্য রমনী তোমার নিকটে আসে তাহলে তুমি তাকে প্রশ্ননির্বিচারে বিবাহ করবে এবং কখনও তার কোন কাজে বাধা দেবে না।

পুত্রকে এই কথা বলে রাজা প্রতীপ বনগমন করলেন। এই হল গঙ্গার শর্ত আরোপের বাস্তবতা। এইপর রাজা হয়ে শান্তনু একদিন শিকারে গেলেন। সেখানে তিনি এক কান্তিময়ী নারীকে দেখতে পান। লাস্যময়ী সেই নারী শান্তনুকে চিনতে পারেন।

রাজা শান্তনু তার রূপে বিমোহিত হন। গঙ্গা বললেন—আপনি নিশ্চয় মহারাজ প্রতীপের পুত্র?

হ্যাঁ সুন্দরী।

গঙ্গা বললেন—আপনি নিশ্চয় আপনার পিতার কাছ থেকে সমস্ত কথা শুনেছেন?

শান্তনু অস্বীকার করলেন না। বললেন, হ্যাঁ সুন্দরী আমি তোমার কথা আমার পিতার কাছ থেকে সবই জেনেছি। সেই লাস্যময়ী বললেন, আমি এতদিন তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম। আজ আমি এসেছি তোমার সন্মুখে, তুমি আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করো।

শান্তনু আপত্তি করলেন না, কারণ তিনি পিতার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি বললেন, বেশ তাই হোক।

এবার লাস্যময়ী গঙ্গা বললেন, আমার শর্তের কথা তোমার কি স্মরণে আছে রাজা। আমি তোমার পিতাকে আমার শর্তের কথা বলেছিলাম। তবু তোমাকে স্মবণ করিয়ে দিতে চাই, বিবাহের পরমহুর্ত থেকে তুমি আমার কোন কাজে কোন প্রশ্ন করতে পারবে না। যদি তুমি আমায় কোন প্রশ্ন করো অথবা আমার কোন কাজের কারণ জানতে চাও, তাহলে আমি সেই মুহুর্তে তোমায় ত্যাগ করবো।

শান্তনু এই শর্তে রাজী হওয়ায় মানবরূপিনী গঙ্গা তাকে বিয়ে করেন। এর পরের কাহিনী সকলের জানা। একে একে সাত - সাতটি সন্তানকে ভূমিষ্টের পরেই জলে ভাসিয়ে দেন গঙ্গা। প্রতিবাদ করেন না বাজা শান্তনু। মুক্ত হন মহাভারতের কাহিনীকারের ইচ্ছানুসারে উপকাহিনীর সাত-সাতজন বসু। কিন্তু অষ্টমবসুরতো মুক্তি নেই। তাই বিধির বিধান অনুযায়ী অষ্টম সন্তানকে জলে ভাসাতে গেলে রাজা শান্তনু তাকে বাধা দেন। ফলে গঙ্গা তাকে বললেন "মহারাজ শান্তনু, আপনি শর্ত ভঙ্গ করেছেন কাজেই আমার মানবী জন্ম থেকে মুক্তি ঘটেছে। তবে আপনার কোন চিন্তা নেই। আমি আপনার এই পুত্রকে যথার্থভাবে পালন করবো। আমি ওকে এখন আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, আপনি যথা সময়ে আপনার পুত্রকে ফেরত পাবেন। আপনি একে গঙ্গা দত্ত বলে জানবেন।" এই বলে গঙ্গা তার ভূমিষ্ট পুত্রকে নিয়ে চলে গেলেন।

এরপব মহাভারতের কাহিনীকাব অত্যন্ত নিপুন কায়দায় শান্তনুর সঙ্গে তাব পুত্রের মিলন ঘটিয়েছেন।

সেও বহুবছর বাদে—রাজা শান্তনু তখন কুরুবংশীয়দিগের কুল ক্রমাগত রাজধানী হস্তিনাপুরে বসে সসাগরা বসুন্ধরাকে শাসন করছেন। একদিন তার নতুন করে মনে পডলো মৃগয়ার কথা। আসলে আগের দিনের বাজা মহারাজারা সকলেই ছিলেন মৃগয়া প্রিয়। শান্তনু তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। ফলে তিনিও একদিন মৃগয়া উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। বহুদিন বাদে গঙ্গার তীরে উপনীত হয়ে মনে পড়লো তার পরমা সুন্দরী ভার্যা গঙ্গার কথা। হঠাৎ তিনি গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, গঙ্গার স্রোত ক্রমশ যেন ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তিনি কারণ অনুসন্ধানের জন্য এগিয়ে যেতে লাগলেন। এমন সময় তার চোখে পড়লো চারুদর্শণ এক যুবককে। যুবকটি শরজাল দ্বারা গঙ্গার স্রোত অবরুদ্ধ করে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ কবছে। এই দৃশ্য দেখে রাজা চমকে উঠলেন। কে এই যুবক? যুবকটি রাজাকে দর্শণ করা মাত্রই স্থান ত্যাগ করায রাজা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পডলেন। যখন রাজা শান্তনু কুমারকে অন্বেষণ করার জন্য ব্যাগ্র হয়ে উঠলেন, তখনই তার সামনে এসে দাঁড়ালেন পুত্রসহ গঙ্গাদেবী। বললেন, 'হে রাজন। এই নিন আপনার সেই অষ্টম পুত্র। একে আমি সাধ্যমতো সমস্ত শিক্ষাই দিয়েছি। শুক্রাচার্য্য ও বৃহস্পতির কাছে আপনার পুত্র অধ্যয়ণ করেছে শাস্ত্র, বশিষ্ঠ্যের কাছে বেদ এবং পরশুরামের কাছ থেকে শিখেছে অস্ত্রবিদ্যা। আপনি নিশ্চিন্ত চিত্তে সন্তানকে গ্রহণ করতে পারেন।'

রাজা শান্তনু সন্তান দেবব্রতকে নিয়ে ফিরে এলেন হস্তিনাপুরে। সগর্বে সমস্ত ঘটনা তিনি জানালেন সভাসদ্দের। সভায় গুঞ্জন উঠলেও কেউ কোন কথা বললেন না। তার দেবকান্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে সকলেই বুঝতে পারলেন এই সন্তান শান্তনুর না হয়ে যায় না। তার চলনে বলনে প্রতিটি ভঙ্গীমার মধ্যে শান্তনুর ছায়া পরিলক্ষিত। ধনুর বিদ্যা, ধর্মশাস্ত্র, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি যাবতীয় ব্যাখ্যায় দেবব্রতর সমৃদ্ধ জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে সকলেই ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। রাজা শান্তনুর বহুদিনের মনস্তাপ দূর হলো। তিনিও দেবব্রতকে পেয়ে সুখী। সন্তানকে তিনি ছায়ার মতো অনুসরণ করতে থাকেন।

এখন প্রশ্ন হলো মহাভারতের কথক যেভাবে গঙ্গার অন্তর্হিত হওয়ার কথা বলেছেন, সেই কথা এই যুগে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণভাবে মেনে নেওয়া যায় না। শর্তপালনের জন্য একগাদা উপকাহিনী তৈরি করে যতই তিনি দেবত্ব আরোপ করার চেষ্টা করুন না কেন, এই যুগের জীবনবোধের কাছে এই কাহিনী অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি কোনরকম দেবত্ব আরোপ না করে, এই কাহিনীকে এই যুগের কাঠামোর ফেলে আমরা বিচার করতে বসি, তাহলে বলতে হবে বাস্তব দিক দিয়ে গঙ্গা নামের ঐ মহিলা ছিলেন কোন এক অনার্য অদিবাসী কন্যা। রাজা শান্তনু মৃগয়াকালে গঙ্গাতীরে তাকে দেখেছিলেন বলেই তিনি তাকে নাম দিয়েছিলেন গঙ্গা।

কুরবংশীয় রাজার পক্ষে একজন কুলশীলহীনা, মান-মর্যাদহীনা নারীকে কেবলমাত্র রূপের জন্য রাজপুরীতে রাজরানী হিসাবে স্থান দেওয়া যে সমুচীন নয় এটা মনে হয় রাজঅন্তঃপুরের সকলেই অনুধাবন করেছিলেন। তারা মনে মনে বিক্ষুব্ধ হলেও প্রকাশ্যে রাজা শান্তনুর বিরুদ্ধাচারণ করতে পারেন নি। তারা কেউই চাননি এই কন্যার গর্ভজাত কোন সন্তান শান্তনুর অবর্তমানে হস্তিনাপুরের রাজা হোক। আর সেই কারণেই হয়ত সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া মাত্রই গোপনে সেই সন্তানকে হত্যা করা হতো। রাজা শান্তনুর কাছে প্রত্যেকেই ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। কাজেই এদের কাউকে সন্দেহ করা তারপক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু গঙ্গা বুঝেছিলেন এর পিছনে কোন গভীর ষড়যন্ত্র কাজ করছে। তা নাহলে একটি করে সন্তান প্রসব হওয়া মাত্র তাদের মৃত্যু হচ্ছে কী করে?

গঙ্গার মনে তাই সুখ ছিলনা। তিনি বুঝেছিলেন এই রাজবাড়ীতে থাকলে তিনি কোনদিন কোন সন্তানের মুখ থেকে মা ডাক শুনতে পাবেন না। তাই তিনি অষ্টমবার গর্ভধারণ করা মাত্র রাজা শান্তনুকে জানিয়ে রাতের অন্ধকারে রাজগৃহ ত্যাগ করে পিত্রালয়ে চলে যান। ফলে তার রাজপ্রাসাদ ত্যাগের খবর কারো জানা ছিলনা। তবে তিনি যে গর্ভবতী ছিলেন একথা সকলে জানতেন। তাই অন্বেষণ করেছিলেন চক্রান্তকারীরা। কিন্তু তাদের পক্ষে গঙ্গার সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়নি।

হয়ত ধরে নেওয়া যেতে পারে রাজা শান্তনু নিজেই রটনা করেছিলেন, গঙ্গা মনের দুঃখে গঙ্গায় আত্মবিসর্জন দিয়েছেন। পত্নীর শোকে তিনি ব্যাকুলতা প্রকাশ করলেও তিনি জানতেন তিনি পুত্রবান হবেন এবং যথাসময়ে তিনি সেই পুত্রকে ফেরত পাবেন। অন্তত গঙ্গা তাকে বিদায় কালে এমন অঙ্গীকার করেছিলেন বলেই মনে হয়। মনে হয় বলেছিলেন, হে রাজা তোমার রাজগৃহে আমার এই সন্তান নির্বিঘ্নে ভূমিষ্ট হলেও শতায়ু লাভ করবে না। আমি চাই আমাদের মিলনের স্মারক হিসাবে আমার এই অষ্টমপুত্র জীবিত থাকুক। আমি তাকে সর্বদিক দিয়ে রক্ষা করবো এবং সর্ববিদ্যায় পারদর্শী করে আপনার পুত্রকে আপনার কাছে ফেরত দেব। তবে আমি এই রাজবাড়ীতে কোনদিন প্রবেশ করবো না।

শান্তনু মনে হয় এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন। আসলে তিনিও চাননি অপুত্রক হয়ে বেঁচে থাকতে। তাই তিনি গঙ্গাকে রাজবাড়ী পরিত্যাগের পথ করে দিয়েছিলেন।

তিনি জানতেন গঙ্গা নিশ্চয়ই তার কথা রাখবেন। তিনি তার পুত্রকে ফেরত পাবেন। এই বিশ্বাস তার মধ্যে অটুট ছিল বলেই তিনি গঙ্গার বিয়োগের পর দ্বিতীয়বার হাজার অনুরোধ সত্ত্বেও বিবাহ করেননি। আর গঙ্গাদেবী মনে হয় সেই কথা রাখতেই পুত্র দেবব্রতকে রাজা শান্তনুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তুলে দিয়েছিলেন এমন একটা বয়সে যখন দেবব্রত আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ সতর্ক হয়েছেন।

কাহিনীর গতিবিধি কি হতে পারতো অথবা কিভাবে মহাভারতের কথক তাকে ব্যাখ্যা করেছেন আমরা এইসব যুক্তি তর্কের মধ্যে প্রবেশ করতে চাইনা। শুধু জানি দেবব্রতকে রাজা শান্তনু হস্তিনাপুরে নিয়ে এসেছিলেন। পেয়েছিলেন এক নতুন জীবন। সন্তানকে ঘিরে তার মনের মধ্যে জেগেছিল অসংখ্য স্বপ্ন।

সেই স্বপ্ন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এলো ধীবর কন্যা সত্যবতীকে দেখার পর। তার রূপ রাজা শান্তনুকে বিমোহিত করেছিল। শান্তনু হয়ে পড়লেন মোহগ্রস্থ। সারাক্ষণ তার চিন্তার মধ্যে রয়ে গেলেন সত্যবতী।

বারবার মনে পড়ে সেই মধুমাখা মুখখানি। কামনার অস্থিরতায শান্তনু তখন নিজের মধ্যে প্রতি মুহুর্তে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছেন। সত্যবতীব দেহভঙ্গীমা তাকে যেন মদীর নেশায় উন্মাদ করে তুলেছে, অথচ তিনি সেই কথা কাউকে মুখফুটে বলতে পারছেন না। কাকে বলবেন দেবব্রতকে? সেও তো বিবাহযোগ্য, যৌবন মদেমত্ত। কিভাবে তিনি পুত্রকে বলবেন নিজের বিবাহের কথা। প্রজারাই বা তার প্রস্তাব মেনে নেবে কেন? এই মুহুর্তে প্রজাদের মন জুড়ে বসে আছেন কুমার দেবব্রত। তাকে বাদ দিয়ে সত্যবতীর সন্তানকে সিংহাসনে বসানোর অঙ্গীকাব করলে প্রজাবিদ্রোহ ঘটবে। অতএব দাসরাজার প্রস্তাব গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাড়তে থাকে। সেদিনের মতো মনেব যাবতীয় বাসনাকে অতৃপ্ত রেখে ফিরে এলেন রাজা শান্তনু। তাবপব থেকেই তার মধ্যে দেখা গেল অদ্ভুত পরিবর্তন।

রাজা সারাক্ষণ শয়ণকক্ষে কাটান। রাজকার্যে মন নেই। কথা বলেন না পুত্র দেবব্রত'র সাথে। তাকে তিনি এড়িয়ে যান। যেন মনে হয তিনি দেবব্রতকে এই মুহুর্তে সহ্য করতে পারছেন না। কিছু একটা যেন অন্তবায তৈবী করছেন গঙ্গাপুত্র।

পিতার আচরণও দেবব্রতকে ভাবিয়ে তোলে। পিতার অসহিষ্ণু মনোভাবের কারণ জানতে না পেরে ভিতরে ভিতরে তিনি নিজেও উদ্বিগ্নবোধ করেন। কী হয়েছে তার পিতার? পিতাতো তার এমন ছিলেন না? তিনি সর্বক্ষণ তাকেই সময় দিতেন, তাহলে এখন কেন তিনি এভাবে এড়িয়ে যাচ্ছেন। উত্তর খুঁজে পান না অভিজ্ঞ রাজকর্মচারীরাও। সকলেই রাজার আচরণে বিস্মিত। সবচেয়ে বড় ধাক্কা খান পুত্র যুবক দেবব্রত। পিতা তার সঙ্গে দেখাপর্যন্ত করছেন না। তার কক্ষে প্রবেশের কোন সুযোগ নেই। তবে কি তিনি কোন অন্যায় আচরণ করেছেন? কি হতে পারে পিতার? সারাক্ষণ পিতার জন্য দুর্ভাবনা নিয়ে কাটান দেবব্রত কিন্তু কোন সদুত্তর তিনি খুঁজে পান না।

অপরদিকে অশান্ত রাজা শান্তনু'ও মানসিক ভাবে বিদ্ধস্ত। তিনি বুঝে উঠতে পারেন না এই সময় তার করণীয় কর্তব্য কি। কুমার দেবব্রত যে এখন তার জীবনে বড় অন্তরায়, একথা ভাবতেও শঙ্কিত হন রাজা শান্তনু। কারণ দেবব্রত আচরণ অত্যন্ত নম্র'ও বিনয়ী। উপযুক্ত

শিক্ষায় শিক্ষিত দেবব্রত শিষ্টাচার সম্মত আচরণে অভ্যস্ত। প্রজারা তাকে একান্ত আপন বলে মেনে নিয়েছেন। এই অবস্থায় তাকে রাজ সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করাটা অন্যায় হবে এবং প্রজারা যে সহজে ব্যাপারটা মেনে নেবে এমনও নয়। বরং কৈবর্তরাজের প্রস্তাব মেনে সত্যবতীর সন্তানকে রাজ্যাধিকার দিলে প্রজাকুল বিদ্রোহী হবে আর কুমার দেবব্রতও কি এই অবিচার মেনে নেবে মন থেকে? শুধুমাত্র মা হারা সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে স্নেহবশত সেদিন কৈবর্তরাজকে যথার্থ কোন উত্তর দিতে পারেননি হস্তিনাপুরের অধিপতি রাজা শান্তনু। পুত্রের শান্ত সুন্দর মুখখানি মনে করে তিনি দাসরাজের আবেদনে সাড়া না দিয়ে চলে এসেছিলেন। কিন্তু চলে এলে কি হবে, মনের মধ্যে যে তার জ্বলছে কামনার আগুন। সত্যবতীর অপরূপ মাধুর্যমাখা মুখশ্রী তার অন্তরকে বিদ্ধ করেছে। সত্যবতীর কথা সারাক্ষণ তার মন আচ্ছন্ন করে রাখে। দেহ অবসন্ন হয় ভিতরে ভিতরে অনুভব করেন উত্তপ্ত রক্ত প্রবাহের দুরন্ত চঞ্চলতা। মনের দিক দিয়ে এক কথায় প্রায় ভেঙে পড়েন রাজা শান্তনু। কি করবেন ভেবে উঠতে পারেন না। যে মানুষটি এতবড় এক বিশাল ভূখণ্ডের অধিকারী, সেই তারই কিনা এমন দুরবস্থা! ভাবতে গিয়ে অসহায় রাজা শান্তনু নিজেকে নিজেই ঘৃণা করেন। কোন উত্তর খুঁজে পান না, নিজের মধ্যে কেন এতদিন বাদে এমন চিত্তচাঞ্চল্য। রাজপ্রাসাদে তিনি বহু নারী দেখেছেন, অথচ কাউকেই তার এতদিন গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। অথচ আজ যৌবনকে অনেক পিছনে ফেলে এসে প্রায় প্রৌঢ়ত্বের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে নিজেকে তিনি এমন [illegible] চরিত্র করে তুললেন কেন? কেন তার সংযমের সমস্ত বন্ধনগুলো খুলে গেলো? গঙ্গাতো বহুদিন চলে গেছেন, তিনি তো বহু বছর একা, নিঃসঙ্গ হয়ে জীবন যাপন করছেন। তাহলে আজ কি কারণে তাকে এমন কোন এক আকাঙ্খা উন্মত্ত করে তুললো, যার থেকে তার কোন নিস্তার নেই। তবে কি এই নিঃসঙ্গ তার মধ্যে কামনা এতদিন সুপ্ত অবস্থায় ছিল? পুরুষের মধ্যে কামনার শেষ নেই, বাসনার ক্ষয় নেই। বয়স কামনার কাছে তুচ্ছ, আর সেই কারণেই নিঃসঙ্গ প্রৌঢ় বয়সেও এক অল্পবয়স্কা নারীর যৌবন সুধারস পান করার উন্মত্ততায় তার অতৃপ্ত হৃদয় এমন অস্থির হয়ে উঠেছে।

ভাবতে গিয়ে নিজের কাছে নিজেকেই তার অপরিচিত বলে মনে হয়। মনে হয় যেন জগতের সমস্ত ছবিগুলো যেন তার সামনে থেকে সরে গিয়ে কেবল এক মোহময়ী নারীর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রলুব্ধ চাউনি প্রত্যক্ষ করছেন। অথচ মনের এই আকাঙ্খাকে প্রকাশ করার মতো ক্ষমতা বা মানসিক দৃঢ়তা তার নেই। নেই এমন কেউ যাকে তিনি স্পষ্ট করে বলতে পারেন নিজের মনের কথা। কি বলবেন তিনি? বিবাহের কথা? কাকে বলবেন—পুত্র দেবব্রতকে, অথবা কোন বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীকে? তারা শুনলে তাকে ধীক্কার দেবে। প্রজারা বিস্মিত হবে, বিশ্বাস হারাবে। অদ্ভুত এক দোটানার মধ্যে পড়ে রাজা শান্তনু নিজের মধ্যে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকেন। চোখের সামনে কেবল স্পষ্ট হয়ে উঠে ধীবর-কণ্যা সত্যবতীর মধুমাখা মুখখানি।

এবার আসা যায় রাজনায়িকা সত্যবতীর কথায়। প্রথমে বলি কে এই সত্যবতী, কি তার সঠিক পরিচয়। তিনি যে ধীবর দাসরাজের ঔরসজাত কন্যা নয়, এটা তার রূপই প্রমাণ করে। তাহলে তিনি ধীবররাজ দাসকন্যা বলে পরিচিত কেন? কেন তাকে মহাভারতের কথক 'মৎস্যকন্যা' বলে চিহ্নিত করেছেন। এই ক্ষেত্রে কাহিনীকার উপস্থাপন করেছেন চমৎকার এক কাহিনীর।

বহু বছর আগে চেদি দেশের রাজা চৈদ্য উপরিচর বসু ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক। এই ধর্মনিষ্ঠ রাজা দেবরাজ ইন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি পুরুবংশীয় রাজা হয়েও মূলত পরিচিত ছিলেন বসুরাজ নামে। ইন্দ্রের পরামর্শ মতো তিনি চেদি রাজ্য গ্রহণ করেন। তার ধর্মের প্রতি অটল বিশ্বাস ও ন্যায় পরায়নতার জন্য দেবরাজ তাকে সম্মান করতেন। এই সময় বসুরাজ শুরু করলেন এক মহাতপস্যা। তার তপস্যায় দেবতারা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন। তারা এসে ইন্দ্রকে বলায়, ইন্দ্র দেখলেন এতো মহাবিপদ। তাই তিনি নিজে ছুটে গেলেন বসুরাজের তপোভঙ্গ করতে। ইন্দ্রের অনুরোধে বসুরাজ তপোভঙ্গ করলেন। ইন্দ্র তাকে দিলেন একটি দিব্য স্ফটিক নির্মিত বিমান সেই সঙ্গে বৈজয়ন্তীমালা। ইন্দ্রের দেওয়া এই বিমানে চড়ে বসুরাজ আকাশ পথে পরিভ্রমণ করতেন বলে তাকে বলা হয় উপরিচর বসু। কণ্ঠে

বৈজয়ন্তী মালা আর যুদ্ধে অপরাজেয় এই রাজার স্ত্রী ছিলেন গিরিকা। অত্যন্ত ভক্তিমতী গিরিকার সঙ্গে একবার মিলনের জন্য বড়ই উদগ্রীব হয়েছিলেন রাজা। গিরিকাও তখন ঋতুস্নান শেষ করে মিলন প্রত্যাশায় প্রস্তুত হচ্ছেন। এমন এক চরম মুহুর্তে পিতৃপুরুষের আদেশে পিতৃযজ্ঞের আয়োজন করতে রাজাকে মৃগয়ায় যেতে হলো। ঘটনাটা ছিল অত্যন্ত আকস্মিক। রাজা আদৌও মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না, অথচ পৌরাণিক সংস্কার অনুযায়ী পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে বন্য পশু প্রাণীর মাংসে পিতৃলোককে তর্পন করাই ছিল সেকালের প্রথাগত বিধান। অতএব এই আদেশ অমান্য করার সাধ্য রাজার ছিল না অথচ মন চাইছিল না মৃগয়ায় যেতে, তিনি তখন গিরিকার সাথে মিলন প্রত্যাশায় ব্যাকুল।

এই অবস্থায় বনে গিয়ে মৃগের সন্ধান করার তুলনায় গিরিকার কথাই তার বেশী করে মনে পড়তে লাগলো। রাজা মনের বিরুদ্ধে এক মৃগ শিকার করলেন বটে কিন্তু মন থেকে গিরিকার চিন্তাকে দূর করতে পারলেন না। বারবার তার মনে পড়তে লাগলো গিরিকার সুন্দর মুখখানি। ফলে অতি মাত্রায় গিরিকার কথা চিন্তা করার কারণেই রাজার রেতঃ স্থলিত হল। রাজা সেই তেজবিন্দু পত্রপুটে ধারণ করলেন। তার মনে হলো পুত্রলাভের সম্ভাবনা তার বিফল হল। তার মনের এই প্রত্যাশা যাতে ব্যর্থ না হয় তারজন্য সেই রেতঃ সম্বলিত পত্রপুটটি তার পোষা বাজপাখিকে দিয়ে অতি সত্ত্বর পাঠিয়ে দিলেন রাজবাড়ীতে রানী গিরিকার কাছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য চেদিরাজের, তার সেই তেজবিন্দু স্ত্রী গিরিকার কাছে পৌঁছালনা, পথ মধ্যে রাজার পোষা বাজ অন্য একটি বাজের দ্বারা আক্রান্ত হলে পত্রপুটসহ তেজবিন্দু যমুনার জলে পতিত হল। ঐ সময় যমুনার জলে বাস করছিলেন মৎসী হয়ে অভিশপ্তা অপ্সরা অদ্রিকা। তিনি ঐ রেতঃ ভক্ষণ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যে গর্ভবতী হন। কালক্রমে একসময় ধীবরের জালে ধরা পড়েন ঐ গর্ভবতী মৎসী। তারা ঐ বৃহৎ মৎসী পেয়ে আনন্দিত চিত্তে কাটতে গেলে তার গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে একটি পুরুষ ও একটি কন্যা শিশুসন্তান। ধীবররা এই ঘটনায় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে রাজাকে জানালেন। রাজা উপরিচয় বসু ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনাটিকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ

করলেন। বিস্মিত রাজার হয়ত সেই মুহুর্তে মনে পড়েছিলো সেই দিনের কথা। গিরিকার কাছে তার তেজবিন্দু পৌঁছে দিতে পারেনি তার পোষা বাজ, ওই তেজঃবিন্দু যমুনার জলে পড়েছিল। রাজা মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটি অনুধাবন করে পুত্রশিশুটিকে নিজে গ্রহণ করলেন আর কন্যাসন্তানটিকে তুলে দিলেন ধীবর নেতার হাতে। তাকে বললেন, এই কন্যাটিকে তুমি তোমার নিজের কন্যার মতো পালন করবে। মহাভারতের কথকের কথা অনুযায়ী বলতে হয় ঐ পুত্রসন্তানটি হলেন পরবর্তীকালের মৎস্যরাজ আর ধীবরের গৃহে পালিত কন্যাটির নাম হয় 'মৎস্যকন্যা'। তার গায়ের রং কালো ছিলো বলে কৈবর্ত পল্লির সকলে তাকে "কালি" বলে ডাকত।

মহাভারতের কাহিনীকার এই অলৌকিক কাহিনী উপস্থাপন করে সত্যবতীর জন্মের যে সত্যতা আমাদের কাছে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন, সেই সত্যকে মন থেকে সঠিকভাবে মানা সম্ভব নয়। কারণ সময় বিচারে দেখা যায় রাজা উপরিচর বসু ছিলেন বহু আগের পুরুষ। তখন ভারতবর্ষে সবেমাত্র আর্যায়ণ শুরু হয়েছে। নতুন নতুন দেশ আর্যগোষ্ঠীর হস্তগত হচ্ছে। চেদি দেশ হল সেই সময়কার একটি রাজ্য। এর বহু পরে রাজা শান্তনু, ব্যাসদেব, সত্যবতীর জন্ম। কাজেই ইতিহাস বিচারে মানা যায় না সত্যবতী অর্থাৎ 'মৎস্যকন্যা' ছিলেন রাজা উপরিচর বসুর কন্যা।

তাহলে কী কারণে উপরিচর বসুর মতো একজন রাজাকে সত্যবতীর পিতা হিসাবে দাঁড় করানো হল? এর উত্তরে বলা যায় ব্যাসদেবের মতো বিশাল ক্ষমতাবান পুরুষ যে রমনী গর্ভে জন্মাবেন তার পরিচয় সম্পর্কে মানুষের মনে কোনরকম সন্দেহ দেখা দেবে, এটা মনে হয় মহাভারতের কাহিনীকারের আদৌ ভালোলাগেনি। এই পরম্পরা রক্ষার্থে সত্যবতীর জন্ম সূত্র ধরেই উঠে এসেছে রাজা উপরিচর বসুর প্রসঙ্গ। অথচ ইতিহাস বিচার করলে এই তথ্য মেলে না। তবে মহাভারতের কাহিনী অনুযায়ী আমরা জেনেছি উপরিচর বসুর পাঁচটি পুত্র ছিল। এই পঞ্চপুত্র হলেন যথাক্রমে বৃহদ্রথ বা মহারথ, কুশাম্ব বা মণিবাহন, প্রত্যগ্রহ, মাবেল্য ও যদু। এই পঞ্চপুত্রের মধ্যে মাবেল্য হয়ত ছিলেন মৎস্য দেশের রাজা। কারণ ইতিহাস স্বীকার করে মৎস্য দেশ উপরিচর

বসুর অধীনে ছিল। কাজেই সেই দিক দিয়ে বিচার করলে মাবেল্য এই মৎস্যরাজ্যের অধীশ্বর হতেই পারেন। অন্যদিকে আবার বায়ু পুরাণ মতে উপরিচয় বসুর ছিল সাতটি সন্তান। তার সপ্তম অর্থাৎ কণিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল মৎস্য। এই অঞ্চলটা মূলত ছিল রাজপুত অধীকৃত রাঠোরদের পূর্বপুরুষদের অর্ন্তগত। মৎস্যরাজ ছিলেন রাজা উপরিচর বসুর পুত্র। তার সমস্ত পুত্রদের একত্র করে বলা হতো বাসব। কাজেই বলা যায় সত্যবতী উপরিচর বসুর কন্যা না হলেও তার বংশগত পুত্র কোন এক বাসবরাজের ঔরসজাত কন্যা সন্তান ছিলেন। তিনি যে মৎস্য দেশের কন্যা ছিলেন সেটা তার 'মৎস্যকন্যা' নামের ভিতর দিয়েই স্পষ্ট বোঝা যায়। আসলে সেকালের দিনে দেশের নামেই কন্যার নাম রাখা ছিল একটা রেওয়াজ।

মহাভারতে আমরা যে মৎস্যরূপী নারীকে উপরিচর বসুর রেতঃ ভক্ষণ করতে দেখেচি তিনি হয়ত ছিলেন এই মৎস্য দেশের কোন রূপসী কন্যা। ঐ রমনীর সঙ্গে মৎস্যরাজের অবৈধ মিলনের ফলেই জন্ম হয়েছিল সত্যবতীর। এই চরম সত্যকে ঢাকা দেওয়ার জন্য মহাভারতের কথক সত্যবতীকে উপরিচর বসুর কন্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই সত্যকে ইতিহাস বিচারে আমাদের পক্ষে মানা সম্ভব নয়। আবার এটাও সঠিক কোন একজন অনামিকা হীন বংশীয় মৎস্যদেশীয় রমনীর গর্ভে সত্যবতীর জন্ম হলে সেটাও খুব গৌরবের হবে না। কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে সত্যবতীর গর্ভে জন্মেছিলেন ত্রীকালদর্শী এক তেজস্বী পুরুষ, কাজেই তার জন্ম কখনই কোন হীন নারীর গর্ভে হতে পারে না।' সেই কারণেই উপরিচর বসুর তেজঃবিন্দু মৎস্যরূপী অপ্সরা অদ্রিকার ভক্ষণের গল্পটি ফাঁদা হয়েছে। কিন্তু আধুনিককালের যারা পাঠক, তাদের দৃষ্টিতে এই জন্ম বৃতান্ত কোনমতেই মানা সম্ভব নয়। রেতঃ ভক্ষন করে কোন রমনীর গর্ভসঞ্চার হয় না, প্রয়োজন হয় শারিরীক মিলনের। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে সত্যবতীর জন্ম অদ্রিকা নামে কোন এক বিদূষী নারীর গর্ভেই হয়েছিল, যার সঙ্গে ছিল মৎস্যরাজের যৌন সম্পর্ক। হয়ত তিনি রাজার নর্তকী ছিলেন অথবা কোন দিব্যাঙ্গনা। সেই কারণেই কুলশীল মর্যাদা যথার্থ না থাকায় মৎস্যরাজ কন্যাকে ধীবর দাসরাজের হাতে তুলে

দিয়েছিলেন। সত্যবতী মানুয হয়েছিলেন মূলত ধীবর পল্লিতে। মায়ের বংশমর্যাদার অগৌরবের জন্য মৎস্যরাজ কন্যাকে রাজপুরীতে স্থান না দিলেও তার সঙ্গে রাজবংশের যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। অবৈধ সন্তানকে মৎস্যরাজ আদৌ অবহেলা করেননি। ধীববনেতাকে ধীবর পল্লীটি দান করে তাকে দাসরাজা হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়ে সত্যবতীর মর্যাদাকে তিনি রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। আবার অনেকের ধারনা তিনি যেহেতু কন্যাসন্তান ছিলেন সেই কারণে মৎস্যরাজ তাকে ধীবররাজের কাছে দান করেছিলেন।

নিজের জন্ম রহস্য হয়ত মৎস্যকন্যা জানতেন আবার হয়ত বা সবটুকু তার ভালভাবে জানা ছিলনা। কৈবর্তপল্লীর আলোচনার মধ্যে বড়ো হওয়া সত্যবতী এইটুকু পরিষ্কার বুঝেছিলেন ধীবর দাসরাজ তার প্রকৃত পিতা নয়-তিনি হলেন পালিতপিতা। তার প্রকৃত পিতৃ পরিচয় বা মাতৃ পরিচয় সঠিকভাবে না জানলেও এটা তার ধারনা ছিল মৎস্য রাজবংশের সঙ্গে যেকোন সূত্রে তার যোগ আছে। তার শরীরে প্রবাহিত হচ্ছে রাজরক্ত। লোকসমাজে তিনি দাসকন্যা বটে, আসলে তিনি রাজকন্যা। এই ধীবর দাসরাজের একটা খেয়া নৌকা ছিল। তিনি যাত্রীদের যমুনা নদী পারাপার করে দিতেন। সত্যবতী ছোটবেলা থেকেই নৌকা চালনা শিখেছিলেন। ফলে তার পক্ষে পিতার অবর্তমানে নৌকা চালনা করা অসম্ভব ছিলনা। তবে দাসরাজ কণ্যাকে সহসা নৌকা চালাতে দিতেন না। আসলে তিনিও তো জানেন সত্যবতীর প্রকৃত পরিচয়, এই কাজতো তার করা শোভা পায়না। তাছাড়া সত্যবতীকে তিনি শিশু অবস্থায় মানুয করেছেন, তাকেতো পিতা বলেই সকলে জানেন, অতএব পিতা হয়ে কন্যাকে অকারণে শ্রম করানো তিনি পছন্দ করতেন না। তবু সত্যবতী নৌকা পারাপার করতেন।

সেদিন দাসরাজ ছিলেন অসুস্থ, ফলে খেয়া পারাপারের দায়িত্বে ছিলেন কালী। আগেই বলেছি মৎস্যকন্যার গাত্র বর্ণ ছিল ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ, সেই কারনে তিনি লোকালয়ে 'কালী' নামে ছিলেন পরিচিত। সেই 'কালী' সেদিন যমুনায় খেয়া পারাপার করছিলেন। অপেক্ষায় ছিলেন যাত্রীদের জন্য। খানিক আগে একদল তীর্থযাত্রীদের তিনি যমুনা পরপারে পৌঁছে দিয়ে এসেছেন।

এখনও সূর্যালোক স্পষ্ট। যাত্রীর অপেক্ষায় নৌকায় অপেক্ষা করতে থাকেন 'মৎস্যকন্যা'। আসলে এই অঞ্চলে যমুনার ধারা কিছুটা শীর্ণ। ফলে এই স্থান দিয়ে যমুনা পারাপারে সুবিধা অনেক বেশী বলেই লোকে এই ঘাটে আসেন। এখান থেকে অপর পারে যেতে যেমন সময় লাগে· কম তেমনি নৌকাবাহকের খুব বেশি শ্রম হয় না।

তীর্থযাত্রীরা এই পথ ধরে আসে। সাধারণ যাত্রীদের তুলনায় তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা বেশি। অপেক্ষায় থাকেন 'মৎস্যকন্যা'। দেখতে দেখতে প্রায় বেলা শেষ হয়ে আসে। দিবাকর পশ্চিমাকাশে ক্লান্ত হয়ে ঢলে পড়েছেন। তার রক্তিম আভায় পশ্চিমাকাশ রঞ্জিত। এই রঞ্জিত বর্ণময় ছটা এসে পড়েছে কল্লোলিনী যমুনার জলে। নৌকায় একাকী বসে এক কৃষ্ণবর্ণা নারী। রং কালো হলে কী হবে, তার মধ্যে আছে এক রাজকীয় মোহনী আকর্ষণ। দেখে মনে হয় যেন কোন দক্ষ ভাস্কর নিকশ কালো পাথর খোদাই করে এই জীবন্ত অপরূপা নারীকে সৃষ্টি করেছেন। দুটি ঘন কাজল চোখের সজল তারায় আছে দুরন্ত মাদকতার নেশা। মোহময় সেই দৃষ্টি। একবার তাকালে যে কোন পুরুষ বিদ্ধ হতে বাধ্য। মাথার ঘন কালো বিন্যস্ত চুলগুলো চুড়া আকারে মাথার উপর বাধা। অঙ্গের পরিধান বস্ত্র এতই অপরিমেয় যে যৌবনের উদ্যম উচ্ছলতাকে অপ্রকাশিত রাখার সাধ্য তার নেই। অথচ যার শরীর ঘিরে এত দুর্বার আকর্ষণ তার মধ্যে কিন্তু যৌবন সমৃদ্ধি সম্পর্কে কোন সচেতনতা নেই। পুরুষকে আকর্ষণ করার জন্য নেই তার মধ্যে কোন চতুরতা, ছলনা। আছে শুধু এক অনাবীল স্বভাবসিদ্ধ সারল্য, যার প্রকাশিত মহিমায় যে কোন পুরুষ আপনা আপনি তার বশীভুত হয়। তার সহজ সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ রূপের প্রতি একবার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে জিতেন্দ্রিয় কোন সিদ্ধ সাধকের পক্ষেও নিজেকে স্থির রাখা সম্ভব নয়। মনে হয় এই কি চরাচরের সকল প্রাণের দেহ শোভা থেকে কামনার দেবী সমস্ত রূপ আহরণ করে সৃষ্টি করেছেন সকল লোচন মনোহরণকারী এই নারীকে। ভ্রমরের চঞ্চল কৃষ্ণতা দিয়ে যেন রচিত হয়েছে তার ভ্রূযুগল। বনমৃগীর মতো আয়ত নয়ন, স্বপ্নস্নাতা পরিশুদ্ধার মতো তার মসৃণ দেহ শোভা। যমুনার নীল জলে সবুজ বনানীর সুকোমল

ছায়া এসে পড়েছে। আত্মতন্ময়তা নিয়ে সেই দিকে স্থির বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন নৌকাবাহিকা অপরূপা এই নারী। কি যেন তিনি ভাবছেন। ভাবছেন নাকি যমুনার নীল জলের কম্পিত প্রতিবিম্বে নিজেকে দেখছেন নতুন করে। অপেক্ষা কার জন্য, কোন প্রেমিক পুরুষের জন্য? আসলে দিন শেষ হয়ে আসছে। আর খানিক বাদে দিবাকর একাবারে অন্ধকারের আড়ালে চলে যাবেন, এখনও কিছুটা আলো আছে, হয়ত কোন আরোহী আসতে পারেন। এই সময়টা তীর্থযাত্রীরা আসেন। তাদের পার করে সন্ধ্যা হলে তাকে ঘরে ফিরতে হবে। দুই হাঁটুর মধ্যে চিবুক ডুবিয়ে রেখে আপন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন যমুনায় নীল জলধারার দিকে। তার কৃষ্ণবর্ণ রমনীয় শরীর ঘিরে বিদায়ী সূর্যের শেষ রক্তিম আভা যেন ঝরণাধারার মতো ঝরে যাচ্ছে। নিজের সুষমা মিশ্রিত অনাবৃত যৌবন মাধুরী সম্পর্কে মনে হয় তিনি আদৌ সচেতন নয়। সময় পার হয়ে যায়। অন্ধকার নেমে আসে—একভাবে নৌকাবাহিকা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন যমুনার উচ্ছ্বল জলধারা দিকে। ভাবছিলেন আরোহী বুঝি আর আসবে না, এবার তাকে ফিরে যেতে হবে।

দ্রুত পায়ে হেঁটে আসেন এক জিতেন্দ্রিয় পুরুষ। জটাজুটোধারী বিশাল চেহারার মুনিবর যমুনার তীরে এসে থমকে যান। বড় দেরী হয়ে গেছে। তবে কি পারাপারের খেয়া ঘাটে নেই। উদবীঘ্ন চোখে যমুনার খেয়াঘাটের দিকে তাকান মুনিবর। নৌকাটি রয়েছে, কিন্তু নৌকার যে বাহকটিকে তিনি চেনেন তাতেতো তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। তবে কি সে বাড়ি ফিরে গেছে? তাহলে তিনি যমুনা পার হবেন কি করে? মুনিবর উদবীঘ্নতা নিয়ে এগিয়ে আসেন খেয়া ঘাটের দিকে। দেখতে পান আনমনা এক নিকষ কালো নারীর প্রেম সুন্দর মুর্ত্তি। মুনিবরের মনে হয় যেন সৃষ্টি কর্ত্তা নিঁখুত তুলিরটানে অস্তমিত সূর্যের শেষ রঙটুকু দিয়ে এক জীবন্ত নারীমুর্ত্তি এঁকে তাকে প্রলোভিত করছেন। মুনিবর স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন। পান করতে থাকেন অনাবৃত্ত নারীর রূপসুধা। আশ্চর্য্য! মেয়েটির কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। রোমাঞ্চিত মুনিবর এগিয়ে যান। একাবারে তার কাছে এসে দাঁড়ান। আশ্চর্য্য রূপসী এই নারী! কি অসাধারণ রাজকীয় আকর্ষণ। কুমারী নারীর সুগঠিত-

তনু সম্ভার মুহুর্তের জন্য বিহ্বল করে তোলে মুনির অন্তরকে। সংযমের সমস্ত আবরণ যেন একটু একটু করে খসে যেতে থাকে। তীর্থ যাত্রায় বেরিয়েছেন মহর্ষি। আজই তাকে এই মুহুর্তে যমুনা পার হয়ে যেতে হবে মথুরার পথে। পথ ভ্রমণের সমস্ত ক্লান্তি যেন মুহুর্তে ধুয়ে মুছে যায়। অবিচল দৃষ্টি মেলে তিনিও তাকিয়ে থাকেন সুন্দরী কমল লতিকা কৃষ্ণা কুমারীর দিকে। দৃষ্টি তার দেহে নিবদ্ধ। মুনিবর চঞ্চল হয়ে উঠেন। এমন আত্মবিভ্রমতো এর আগে তার কোনদিন হয়নি। সংযমের কঠিন বন্ধন যেন আলগা হয়ে যায়। সহসা কুমারী মুখ তুলে তাকায়। তার দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে জটাজুটোধারী এক মুনির কামনার দৃষ্টি। মুহুর্তে সমস্ত লজ্জা ভুলে আপন সারল্য নিয়ে মুনিবরকে প্রণাম করে যুবতী। মনে মনে অনুশোচনা হয়, মুনিবরকে উপেক্ষা করার ধৃষ্টতার জন্য। মহামুনি পরাশর অবিচল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এগিয়ে যান তার দিকে। তার দুচোখে প্রশান্ত প্রেম সুন্দর দৃষ্টি। তরুনীটি ক্ষমা প্রর্থানা করে বলেন—আপনি আমায় ক্ষমা করবেন মুনিবর, আমি আপনাকে দেখেতে পাইনি। আপনি কি আমার নৌকার আরোহী হবেন? পরাশর দীপ্ত কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ সুন্দরী, আমি হব তোমার নৌকায় দিন শেষের শেষ যাত্রী। কিন্তু যে লোকটি এই খেয়া নিয়ে প্রতিদিন পারাপার করে সে কোথায়, আজ তো তাকে দেখছি না?

কুমারী উত্তর দিলেন শান্ত কণ্ঠে—তিনি আমার পিতা। আজ তিনি অসুস্থ থাকায় আমি তার অনুমতি নিয়ে খেয়া পারাপার করছি।

মুনিবরের ওষ্ঠে মৃদ্যু হাসির ঝিলিক খেলে গেল। তিনি নৌকায় পা দিতে দিতে বললেন—উপযুক্ত সময়ে আমি তোমাকে কাছে পেলাম 'বাসবী'।

—'বাসবী'। চমকে উঠলেন 'মৎস্যকন্যা'। এই ঋষি কি অর্ন্তরযামী! তিনি কি করে জানলেন তার নাম 'বাসবী'। এনামতো কারো জানার কথা নয়। তিনি বসুরাজের কন্যা, দাসরাজের কাছে পালিতা। মাতার পরিচয় জানা নেই। শুধু জানেন তিনি বসুরাজ পরিবারের এক পরিত্যক্তা কন্যা। কৈবর্তপল্লীকে সকলে তাকে 'মৎস্যকন্যা' বলেই ডাকে। সে দাস রাজার কন্যা এই তার পরিচয়। অথচ আশ্চর্য্য! এই মুনিবর তাকে বাসবী বলে সম্ভাষণ করলেন কেন? তবে কি তিনি তার প্রকৃত

পরিচয় জানেন? মনের মধ্যে অসংখ্য প্রশ্ন আর কৌতূহল খেলা করতে থাকে। নৌকা জলে ভাসাবার সঙ্গে সঙ্গে দুলে উঠলো কুমারী বসারীর অন্তর। দেখতে পেলেন মুনিবর স্থির অবিচল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। সমস্ত শরীর যেন তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। কি তীব্র অগ্নিসম তেজদীপ্ত সেই চাউনি। দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন বাসবী। মনের কৌতূহল মেটাতে ইচ্ছে হয় মুনিবরকে তার প্রকৃত পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে। কিন্তু সাহসে কুলায় না। মুনি যেন কামনায় ধ্যান মগ্ন। তার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা যেন তার কুমারী সত্তাকে উন্মোচিত করতে চাইছে। 'মৎস্যকন্যা' বুঝেছিলেন এই মুনি কোন সাধারণ মুনি নয়, উনি কোন যোগসিদ্ধ পুরুষ। যোগসিদ্ধ পুরুষ তার মধ্যে এমনকি দেখতে পেয়েছেন যে দৃষ্টির বাণে তাকে ক্ষতবিক্ষত করছেন। মুনিবর যে তার প্রতি কামনায় আকৃষ্ট হয়েছেন এটা সহজে বুঝতে পারলেন। আসলে নারী মাত্র পুরুষের দৃষ্টির অর্থ স্পষ্ট বুঝতে পারে। এখানেও সেই বোঝার মধ্যে কোন দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব ছিল না, তবু চঞ্চল মন বারবার তাকে প্রলুব্ধ করছিল একটি প্রশ্ন করার জন্য। [illegible] কন্ঠে মুনিবরের দিকে দৃষ্টি মেলে সলজ্জ ভঙ্গিমায় প্রশ্ন করলেন—আপনি আমায় মার্জনা করবেন মুনিবর, আমি 'মৎস্যগন্ধা'। এখানে আমাকে সকলে এই নামে চেনে। কেউ আমাকে আবার 'কালী' বলে ডাকে। ধ্যানস্থ মুনি শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন--তুমি ধীবররাজের পালিত কন্যা 'বাসবী'। তোমার নিজের সঠিক পরিচয় জানা না থাকার জন্যে হয়ত তোমার মনে কোন দুঃখ আছে। তবে 'বাসবী' আজ এই সন্ধ্যা মুহূর্তে তুমি আমার জন্য একান্তই নির্দিষ্ট।

চমকে উঠলেন কুমারী মৎস্যকন্যা।

একি কথা শুনছেন তিনি। তিনি মুনিবরের জন্য এই সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট। এই কথার অর্থ তিনি বোঝেন। বুঝতে পারেন মুনিবর তাকে কি বলতে চান।

তাই আবার বললেন—দেব আমি 'মৎস্যগন্ধা'।

মুনিবর হেসে বললেন, শোন বাসবী আমি হলাম মুনিশ্রেষ্ঠ পরাশর। এতদিন আমি যে ইন্দ্রীয়কে যোগবলে কঠোর শাসনে অবরুদ্ধ করে

রেখেছিলাম, আজ এই সন্ধ্যায় রক্তরাগে আমি তাকে তোমার মধ্যে মুক্ত করে দিতে চাই।

কুমারী বাসবী কোন উত্তর দিতে পারলেন না। কি বলবেন তিনি, তিনি জানেন পরাশর মুনি হলেন একজন তেজস্বী মানুষ। তাকে প্রত্যাখ্যান করা শুধু অপরাধ নয়, মহাপাপও বটে। এই পাপ থেকে উদ্ধার পাওয়া তার পক্ষে কঠিন হবে। তিনি হবেন পরাশরের অভিশাপে মহাপাতকী। মনের মধ্যে অসংখ্য সংকোচ, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব মুহুর্তের জন্য অবশ করে দেয় বাসবীকে।

সূর্যবংশেষর বিখ্যাত পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ্যের নাতি হলেন মহামুনি পরাশর। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বশিষ্ঠ্যের বিবাদ ছিল দীর্ঘদিনের। এই বিবাদ শুরু হয় সূর্যবংশের পুরোহিত পদ নিয়ে। এই সময় সূর্যবংশের রাজা কল্মাষপাদেব সঙ্গে বশিষ্ঠ্যের পুত্রের বিবাদ বাধে। এই বিবাদের ফলে বিশ্বামিত্রের সহযোগিতা নিয়ে বশিষ্ঠ্যপুত্রকে বধ করেন কল্মাষপাদ। পরে তিনি অনুশোচনায় বশিষ্ঠ্যের কাছে ক্ষমা প্রার্থী হন। বশিষ্ঠ্যদেব তাকে ক্ষমা করেন কিন্তু পুত্র শোকের যন্ত্রনা তিনি ভুলতে পারেন নি। একসময় তিনি পুত্র শোকে মর্মাহত হয়ে আত্মহননের চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু সেই চেষ্টা তার সফল হয়নি। পরে তিনি দেশ দেশান্তরে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করতে লাগলেন। দীর্ঘদিন ভ্রমণের পর শোক কিছুটা লাঘব হলে তিনি আবার নিজ আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করলেন। অনেক পথ অতিক্রম করে তিনি যখন প্রায় আশ্রমের কাছে এসে পড়েছেন তখন হঠাৎ তিনি বুঝতে পারলেন এক রমনী তার পিছনে পিছনে আসছে। বশিষ্ঠ্য অবাক হয়ে তাকালেন। রমণী বিধবা, নিরাভরনা কিন্তু তার মুখে করুন লাবণ্যের রূপরেখা স্পষ্ট। বশিষ্ঠ্য কথা বললেন না আবার চলতে লাগলেন। একসময় সহসা তার কর্ণ গোচর হল বেদমন্ত্রের সুরোলিত ধ্বনি। এবার মহর্ষি বশিষ্ঠ্য অবাক হয়ে তাকালেন পিছু ফিরে। ভাল করে রমণীকে নিরীক্ষণ করে প্রশ্ন করলেন—কে তুমি মা? কেন তুমি আমার পিছনে আসছ, আর ওই বেদমন্ত্র কে উচ্চারন করলো?

এবার সেই করুনা রূপশ্রী বিধবা রমণী বললেন, হে পিতা, আমি

আপনার পুত্রবধু অদৃশ্যন্তী আর যে বেদমন্ত্র আপনি শুনেছেন, তা ছিল আমার গর্ভস্থ পুত্রের। আপনার পুত্রের ঔরসজাত সন্তান, সে আমার গর্ভে বর্তমান আছে। এখন তার বয়স বারো বছর—সে গর্ভস্থ অবস্থাতেই বেদ উচ্চারণ করেছে। আশ্চর্য্য এমন ঘটনা ঘটে নাকি—গর্ভস্থ অবস্থায় বারো বছর থাকা কি সম্ভব? তার উপর আবার বেদমন্ত্র পাঠ। আসলে মহান ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে মহানভাবে ফুটিয়ে তোলার এটা হল একটা কৌশল মাত্র। আসলে হয়ত বশিষ্ঠ্য যখন আশ্রমে ফিরে ছিলেন তখন তার ছিল বারো বছর বয়স। পিতৃগৃহের আশ্রমের মধ্যেই তিনি বড় হয়েছিলেন। তাকে চেনা বশিষ্ঠের পক্ষে তাই সম্ভব ছিল না। তাই তিনি তার নাতিকে চিনতে পারেন নি। আশ্রমে থেকেই তিনি বেদ শিক্ষা সমাপন করেছিলেন, এখন তার বয়স বারো বছর পূর্ণ হয়েছে, হয়ত এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন পুরানের কাহিনীকার।

অদৃশ্যন্তীর মুখে এমন এক অভাবনীয় সংবাদ পেয়ে বশিষ্ঠ্যদেব অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তাঁর পুত্র বেঁচে নেই বটে, কিন্তু তার নাতিতো আছে। বশিষ্ঠ্যের সন্তান পরম্পরাতো অক্ষত রইল। অনেক ভাবনা চিন্তা করে বশিষ্ঠ্যদেব নাতির নাম রাখলেন পরাশর। পিতামহ বশিষ্ঠ্যকে পরাশর প্রথম আলাপের পর থেকেই বাবা বলে ডাকতেন। স্নেহময় বশিষ্ঠ্য তাকে বাধা দিতেন না। কি করবেন তার তো বাবা নেই। কোন শিশুর না ইচ্ছে করে কাউকে 'বাবা' বলে ডাকতে। কিন্তু মা অদৃশ্যন্তীর কাছে এই ডাক আদৌ শ্রুতিমধুর ছিল না। বরং তিনি নিজের মধ্যে পুত্রের এই ডাকের জন্য লজ্জা বোধ করতেন। একদিন তাই না পেরে অদৃশ্যন্তী পুত্রকে ডেকে বললেন, বাছা উনি তোমার পিতামহ। পিতামহকে 'দাদু' বলে ডাকতে হয় 'বাবা' বলে নয়।

এবার বালক পরাশরের প্রশ্ন—তাহলে আমার বাবা কে মা?

অদৃশ্যন্তী বললেন, তোমার বাবা বেঁচে নেই। বনের মধ্যে এক রাক্ষস তাকে বধ করেছে। তাকে ভক্ষণ করেছে।

মায়ের মুখ থেকে এই কথা শুনে ক্রোধে ফেটে পড়লেন পরাশর। তাহলে তার পিতার মৃত্যুর কারণ হল এক রাক্ষস। কাজেই তিনি রাক্ষসকুল ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা নিয়ে শুরু করলেন রাক্ষস মেধ যোজ্ঞ। এই যোজ্ঞে শতশত নিরিহ্ রাক্ষসের প্রাণ যেতে লাগলো। শেষে নিরুপায়

হয়ে মুনি ঋষিরা যজ্ঞ স্থলে এসে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন শুরু হলো তাদের সঙ্গে পরাশরের তর্ক-বিতর্ক। বহু সাধ্য সাধনার পর পরাশর অবশেষে শান্ত হলেন। বশিষ্ঠ বললেন, শোন বৎস, ক্রোধকে সম্বরন কর। ক্রোধ এবং কাম একই উৎস থেকে নির্গত হয়। উভয়ই রজোগুণের আবৃত। অতএব ক্রোধকে পরিহার কর

পরাশর ক্রোধ সম্বরণ করলেন। রক্তের গভীরে যে চাপাউত্তপ্ত এতক্ষণ তার ধমনীকে স্ফীত করে তুলেছিল, তা প্রশমিত হল। অতএব পরাশর যে সাধারণ একজন মুনি নয় এটা বোঝা যায়। অথচ আশ্চর্য যে মানুষটি প্রচণ্ড ক্রোধকে একদিন প্রশমিত করেছিলেন, আজ সেই তিনি কামনায় দগ্ধ হচ্ছেন কেন? কেন তিনি কামনাকে জয় করতে পারছেন না? কেন তার রক্তের উষ্ণ প্রবাহ তাকে এত তৃষিত চঞ্চল করে তুলেছে? কৃষ্ণকাজল ওই রমনীর দুচোখে তিনি কিসের ইশারা দেখেছেন? কেন ওই রমনীর প্রতি তার অন্তর গভীর প্রেমানুরাগে ধাবিত হয়ে চলেছে? বাধাভাঙ্গা বন্যার মতো কামনাকে তিনি উৎগিবণ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। আজ পর্যন্ত যে পুরুষ নারীর কাছে আত্মদানের কোন আগ্রহ অনুভব করেন নি এবং এতদিন যিনি নারীকে অনাবশ্যক কামনার নিরশ পুত্তলিকা বলে মনে করে এসেছেন, আজ এই কৃষ্ণ রমনীর শারীরিক ভঙ্গিমাব দুর্বার আকর্ষণ তাকে সংযমের উর্দ্ধলোক থেকে নেমে আসার হাতিছানি দিচ্ছে—নিজেকে যেন আর স্থির রাখতে পারেন না পরাশর। সংযমের সমস্ত বন্ধনকে খুলে ফেলে পরাশর আবার বললেন—আজ এই সন্ধ্যা লগ্নে তুমি আমার জন্য নির্দিষ্ট সুন্দরী।

অন্যদিকে কুমারী নাইয়া ইতিমধ্যে মনে মনে অনুভব করেছেন এই মুনি সাধারণ মাপের নয়। তার জীবনের সমস্ত কাহিনী তার জানা যদি তিনি তার জীবন বৃত্তান্ত না জানতেন তাহলে অত্যন্ত তাকে তিনি "বাসবী" বলে সম্ভাষণ করতেন না। এই নামেতো তাকে কেউ ডাকে না। এই নাম তার গোপন নাম—এই নাম কারো জানার কথা নয় কুমারী অন্তর ভাবতে গিয়ে আত্মহারা হয়ে যায়। হৃদয় গভীরে তার কল্পধারার মতো অনুভব করেন এক দুর্বার আকর্ষণ। মুনিবরের প্রতি তার শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। এই মহামুনি তাকে তো কৈবর্ত নারী বলে

তাচ্ছিল্য করতে পারতেন, পারতেন তাকে উপেক্ষা করতে—তাতো তিনি করেন নি। বরং তার দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে, যেমন মমতা আবার তেমনি এক অনাবৃত কামনার তৃষ্ণা। রমনীর যৌবন সমৃদ্ধ মন পুরুষের কামনাকে বুঝতে পারে, তেমনি বাসবী বুঝেছেন মহামুনি পরাশর তার দেহ লাবণ্যে বিদ্ধ হয়েছেন। অন্য কেউ হলে কি ভাবে এমন রূপবতীর কাছে আত্মনিবেদন করতো, তা জানিনা, তবে পরাশর কোন ভনিতা বা ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। অকারণ ব্যয় করেননি নারীর রূপবর্ণনার জন্য একটি অতিরিক্ত অকথিত শব্দ। শুধু বলেছেন—তুমি 'মৎস্যকন্যা' নও কন্যা, তুমি হলে বসুরাজের কন্যা আর সেই কারণেই আমি তোমাকে 'বাসবী' বলে সম্ভাষণ করেছি। আমি জানি, তোমার জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে মনের মধ্যে দুঃখু আছে। আমি বলবো এই দুঃখু তুমি মনে রেখ না। তোমার মধ্যে রাজরক্ত আছে, আর সেই কারণেই তুমি হলে আমার তেজগ্রহণের উপযুক্ত আধার। আমি চাই তুমি আমাকে পুত্রদান কর। আমি আমার পরম্পরার সুত্রটা তোমার মধ্যেই স্থাপন করতে চাই। আশাকরি তুমি আমার আকাঙ্খাকে প্রত্যাখ্যান করবে না।

চমকে উঠলেন 'মৎস্যকন্যা'। শরীরে মননে যেন নতুন করে এক তরঙ্গ খেলে গেল। তিনি আদৌ অবাক হলেন না পরাশরের প্রস্তাবে। আসলে এখানে কামনা নিছক মাত্র দৈহিক উন্মাদনা ছিল না, ছিল না কেবল শারিরীক মিলনের মধ্যে কোন উশৃঙ্খল উন্মাদনার লিপ্সা। এখানে মিলন কামনা কেবলমাত্র-পুত্রার্থে। সেকালের দিনে কামনাকে ধর্মে পরিণত করার এটাই ছিল এক ধরণের রীতি। পিতৃঋণ পরিশোধ করার প্রত্যাশায় পুত্র কামনা। সেই কারণে কামনা এখানে শৃঙ্খলিত। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বদলে পুত্রের প্রয়োজনে ধর্ম আনুগত্যে শারীরিক মিলন মাত্র। এই মিলনে কোন পাপ নেই, কোন বাধা নেই। এটা কোন অনাচার অজাচার বা অত্যাচার নয়। বাসবী তবুও যেন কিছু ভাবছিলেন।

তাকে নীরব থাকতে দেখে পরাশর প্রশ্ন করলেন, কি ভাবছ? তুমি কি আমার প্রস্তাবে সম্মত নও বাসবী?

মুখ তুলে তাকালেন বাসবী। দুচোখের তারায় ম্লান দৃষ্টি। বললেন—না মহামুনি আপনার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করার মতো সাহস নেই।

আমি শুধু ভাবছি আমার কারণে আমারই মতো আর একটা জীবন নষ্ট হয়ে যাবে নাতো?

মহামুনি পরাশর তাকে অভয় দিয়ে বললেন, কল্যানী তোমার জীবন আদৌ ব্যর্থ নয়। মনে রেখ আমি হলাম ত্রিকালদর্শী পুরুষ। আমি যখন সাগ্রহে তোমার সঙ্গে মিলনের প্রত্যাশা করছি কেবলমাত্র একটি পুত্রের জন্য, তখন তার পিছনে নিশ্চয় কোন কারণ আছে। আর আমাদের এই মিলনের ফলে যে পুত্র জন্মাবে তার জীবন কখনই ব্যর্থ হবে না।

—কিন্তু দেব আমার শরীরে যে মৎস্যগন্ধ। এমন একটি অপবিত্র দেহ আমি আপনাকে সমর্পন করবো কি করে।

পরাশর হেসে বললেন—আমি যোগী শ্রেষ্ঠ। আমি তোমার শরীর স্পর্শ করা মাত্র আমার যোগক্ষমতা বলে তোমার শরীরে এক অপূর্ব সৌরভ ছড়িয়ে যাবে, তুমি হবে আজ থেকে 'যোজন গন্ধা', তোমার অঙ্গ সৌরভ দুর-দুরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে।

তবু সংশয় দোলা দেয়। অসংখ্য সংকোচ তাকে সংকুচিত করে। তার মনে হয় এই মহামুনির সঙ্গে মিলনে সত্যি যদি তিনি পুত্র লাভ করেন, তাহলে সমাজ তাকে গ্রহণ করবে কেন? যেমন তার মাতাকে সমাজ গ্রহণ করেনি, বসুরাজের কন্যা হওয়া সত্ত্বেও বসুরাজ তাকেও গ্রহণ করেন নি। নিজের জন্মের কারণে যেখানে নিজে কষ্ট পাচ্ছেন, সেখানে আবার নতুন করে এই মিলনের ফলে কষ্ট পেয়ে লাভ কি—জীবন যে তার তখন আরও বেশী দুর্বিসহ হয়ে উঠবে। পিতা যদি তাকে ঘরে স্থান না দেন? যদি কৈবর্ত সমাজ তাকে গ্রহণ না করে? হাজার হোক তিনি একজন যুবতী নারী। তার জীবন আছে, যৌবন আছে, আশা আছে, আকাঙ্খা আছে, স্বপ্ন আছে—এসব কিছু তো তখন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। কুমারীত্ব নষ্ট হলে, আর তো কিছু অবশিষ্ট থাকে না নারীর। যদিও জানতেন সমাজে এই ধরেনর মিলন নিসিদ্ধ নয়। তবু যেন ভরসা পাচ্ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা পাঠকদের বলে রাখি, তখনকার সমাজে এই রীতি যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। যদি সত্যবতীকে পরাশর তার আপত্তি সত্বেও আপন কামনা চরিতার্থে মিলিত হতেন তাহলেও কোন দোষের ছিল না। এমনকি পরাশর যদি তার

কুমারীত্ব হরণ করে, তার গর্ভজাত সন্তানের পিতৃত্বকে অস্বীকার করতেন তাহলেও সত্যবতী কোন অবস্থায় দুষিতা হতেন না। তবু এত জেনেও কেবলমাত্র কুমারীত্ব নষ্ট হওয়ার একটা ভয় তাকে যেন আচ্ছন্ন করেছিল। সংকোচ আর দ্বিধাগ্রস্থ মন নিয়ে মাথা নিচু করেছিল নৌকাবাহিকা। পরাশর অন্তরযামী। তিনি ঠিক বুঝেছিলেন, সত্যবতীর সংকোচটা কোথায়? তাই তিনি সত্যবতীকে অভয় দিয়ে বললেন—হে কুমারী তুমি নির্ভয়ে আমার বক্ষলগ্না হও। আমার অভিষ্ট কামনা সম্পাদন কর। তুমি আমার কার্যোদ্ধারের পর তোমার অভিষ্ট কুমারীত্ব আবার ফিরে পাবে।

পরাশরের এই কথা শুনে মন থেকে দ্বিধা সরে গেল। শুধু বললেন অস্ফুট স্বরে—আপনার আর্শীবাদে আমার এই দেহ পবিত্র হয়ে উঠুক। শুধু আমার মিনতি আমাদের এই মিলন যেন কেউ দেখতে না পায়। এই মিলন যেন শুধু মাত্র আমাদের দুজনের মধ্যে একান্ত গোপনীয় থাকে।

পরাশর যোগী। তপস্বী। মহামুনী। তিনি বিভুতিমান মহাপুরুষসত্বম। তাই তিনি যোগবলে সৃষ্টি করলেন এক কুয়াশা ঘন আবরণ। সেই আন্ধকারের ঘন আবরণীর মধ্যে সু-সম্পন্ন হল এক মহামিলন। আর এই মহামিলনের ফলে আলৌকিকভাবে সত্যবতী গর্ভবতী হলেন এবং তার সদ্যোগর্ভ মোচনও হল এক অভূতপূর্ব বিভূতি প্রক্রিয়ায়—জন্ম নিলেন মহাকবি ব্যাসদেব।

ব্যাস জন্মালেন কিন্তু শিশু হয়ে জন্মালেন না। তার জন্ম যেন অন্তরীক্ষে আগেই হয়েছিল, অপেক্ষায় ছিলেন কোন একপবিত্র আধারের জন্য। ফলে ব্যাসকে দেখা গেল জন্মমুহুর্তে বালক অবস্থায়। আপন সন্তানকে দেখে বিস্মিত হলেন কুমারী মাতা! পরাশর সন্তানকে প্রণাম করতে বললেন। ব্যাসদেব প্রণাম করলেন তার কুমারী মাতাকে। তাকে ভূমিপৃষ্ঠে বিচরণের অধিকার দিয়ে তিনি যেন ধন্য করেছেন। পরাশর যে কামনার জন্য সত্যবতীর কাছে মিলন প্রার্থনা করেছিলেন এমন ভাবার কোন অবকাশ নেই। কারণ পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র পরাশর পুত্রকে নিয়ে চলে গেলেন। যদি তিনি সত্যি সত্যি সত্যবতীর রূপমুগ্ধতার বিহ্বল হতেন তাহলে নিশ্চয় এত সহজে তিনি পুত্রের

জন্ম মুহূর্তের সঙ্গে সঙ্গে তাকে পরিত্যাগ করতেন না। পুত্রের সঙ্গে কামনাবিদ্ধ হয়ে সত্যবতীকেও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কিন্তু পরাশর তা করেন নি। তিনি সত্যবতীকে তার কুমারীত্ব প্রদান করে পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেছেন। বিন্দুমাত্র পুত্রের কোন দায়িত্ব সত্যবতীকে পালন করতে হয়নি। এমনকি সত্যবতী সন্তানের জন্ম দিলেন, অথচ তাকে দশমাস দশদিনের যে গর্ভযন্ত্রণা তাও ভোগ করতে হয়নি। তার ভূমিষ্ঠ সন্তান তাকে কোন রকম যন্ত্রণা না দিয়ে, কোনরকম বিব্রত না করে কেবল সংসার ত্যাগ করে পিতার সঙ্গে চলে গেলেন। যেন সে সংসার ত্যাগ করার জন্যই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। সত্যবতীর তাই সন্তানের জন্য কোনভাবনা ছিল না। ভয়, ভাবনাহীন, যন্ত্রনাহীন একজন মা, তার সন্তানের কাছে কি প্রত্যাশা করতে পারে। মা হয়ে যে সন্তানকে তার দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করতে হল না, কোন গর্ভযন্ত্রণা নিতে হল না, নিতে হল না নুন্যতম কোন দায়ভার, সেই সন্তানের কাছে তার কি প্রত্যাশা থাকতে পারে? আর সেই সন্তানই বা এইরকম একজন মাকে কি দিতে পারে—যেখানে পরস্পরের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই।

ব্যাসদেব তবু কৃতজ্ঞ ছিলেন। কারণ তিনি সর্বকালের মহাঋষি, সর্ব শাস্ত্রজ্ঞ এবং সর্বোপরি ত্রিকালদর্শী এক প্রেমিক কবি। দুরন্ত প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বলেই হয়ত তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল মহাভারতের মতো এক মহাকাব্য রচনার। তার জন্মের যে প্রয়োজন ছিল, এটা পরাশর বুঝেছিলেন। তা নাহলে মনুষ্য লোকে এমন এক মহাত্মার অবতরণ হবে কি ভাবে। আসলে দেবতাকেও মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণের জন্য প্রয়োজন হয় মনুষ্য যোনীর—অতএব মনুষ্যযোনীর প্রয়োজনেই সত্যবতীর অস্তিত্ব, এই উপলক্ষটুকু ছাড়া সত্যবতীর তো আর কোন ভূমিকা নেই। তবু ব্যাসদেব জন্ম মুহুর্তে মাকে পরিত্যাগ করে পিতার সঙ্গে বনগমনের আগে তাকে নিশ্চিন্তভাবে ভরসা দিয়ে বলে গেলেন—"আপনি আমার মা, আমার জননী, আমার জীবনদাত্রী। আমি তপস্যার জন্য বনগমন করছি। তবে যদি কখনও আমাকে আপনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় তাহলে আপনি আমাকে স্মরণ করবেন, আমি যেখানে যে অবস্থায় থাকি না কেন মাতৃআজ্ঞা পালনের জন্য ঠিক সময়কে আপনার সমীপে উপস্থিত হব।" আহা! কি অসাধারণ

প্রতিশ্রুতি। এই প্রতিশ্রুতি মনে হয় এখনকার দিনে কোন ভদ্রসমাজের শিক্ষিত সন্তান তার বাবা-মাকে দিতে পারে না। মা হিসাবে সত্যবতীর জীবনে এর চাইতে বড় পাওয়া আর কি থাকতে পারে। আসলে মহাভারতের কাহিনীকার ব্যাসদেব জানতেন, ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে। বিশাল কর্মকান্ডে তার ব্যক্তিগত ভূমিকা তো কম নয়। ঘটনা পরম্পরায় তিনি যুক্ত হয়ে আছেন প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে। আর সেই কারণের জন্যই হয়ত তিনি আগেভাগে এমন একটা প্রতিশ্রুতিতে মা সত্যবতীকে সচেতন করে দিয়ে গেলেন, যাতে সত্যবতী মা হিসাবে যে কোন ঘটনার চরম মুহুর্তে তাকে ডাকার সুযোগ পান। আসলে যে মহাকাব্য তিনি রচনা করবেন, তাকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্যই তো তার ঘটনাস্থলে বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন।

সত্যবতী মা হিসাবে তাব প্রণাম নির্দ্বিধায় গ্রহন করেছিলেন এবং তার কথাকে ভবিষ্যতের ভরসা ও সাহস বলে মেনে নিয়েছিলেন।

এবার আসা থাক ব্যাসদেবের জন্ম কথায়। পাঠকদের হয়ত ভাবতে একটু অবাক লাগছে ব্যাসদেব জন্মালেন অথচ মা হিসাবে সত্যবতীকে তার জন্য বিন্দুমাত্র কোন ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে হলো না। সদ্যোগর্ভ থেকে সদ্যোপ্রশব—সমগ্র পরিমণ্ডলের মধ্যে ঘটেছে এক অলৌকিক বাতাবরণের চিত্রাঙ্কন।' মহামুনি পরাশর বিভূতি প্রয়োগ করে যোগবলে সমগ্র পরিবেশকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে দিয়েছিলেন। হয়ত যুক্তির খাতিরে বলা যেতে পারে তখন সন্ধ্যা কাল, ফলে চারপাশ অন্ধকার থাকাই স্বাভাবিক ছিল—এটাই স্বাভাবিক ঘটনা, হয়ত মহাভারতের কাহিনীকার একেই বিভূতি বলে বর্ণনা দিয়ে কিছুটা বাড়াবাড়ি করেছেন। কিন্তু ব্যাসদেবের জন্ম—জন্মেই সে এক সদ্যজাত কুমার। আসলে মহাভারতের কাহিনীকার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ এক মহর্ষি জন্মাছেন, অতএব সেখানেতো অলৌকিক কিছু তো থাকাই স্বাভাবিক। যদি তার জন্মের মধ্যে রহস্যময় কিছু না থাকে, তাহলে তিনি তো আর দশজনের মতোই সাধারণ হয়ে যেতেন। মনে রাখতে হবে ব্যাসদেব ছিলেন আর দশজন সাধারণ মুনি ঋষির তুলনায় অনেক পৃথক। তিনি যে একজন অনন্য সাধারণ পুরুষ সেটা বোঝাবার জন্যই এমন অলৌকিক দৃষ্টান্তের অবতরনা করা হয়েছে।

ব্যাসদেব পিতার সঙ্গে বনে গেলেন। পরাশর সত্যবতীর কাছে পুত্র চেয়েছিলেন—ধর্ম রক্ষার্থে পুত্র, সেই পুত্র তিনি পেয়েছেন অতএব তারতো আর সত্যবতীকে প্রয়োজন নেই। তিনি তো কামনার বশে মোহজালে আবদ্ধ হয়ে সত্যবতীর সঙ্গে কোন মিথ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেন নি। কাজেই কোন রকম প্রেম, প্রীতি, মায়া মমতার স্থান পরাশরের মনের মধ্যে ছিল না। দেহ মিলনের মাধ্যমে পরাশর তার অভিষ্ট রত্নটি পেয়েছেন; তিনি তাতেই সতুষ্ট। সেই কারণে পরাশর আর পিছু ফিরে তাকান নি। উচ্চারণ করেন নি একটি শব্দ। তবু সদ্যোজননীর মনে সদ্যোত্যক্ত সন্তানের প্রতি কোন মায়ার বন্ধন কি ছিল না? হয়ত ছিল কিন্তু পরাশরতো মিলনের আগেই সত্যবতীকে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছিলেন তার প্রশবিত সন্তান সংসারের জন্য নয়, তার সন্তান হলো আজন্ম সন্ন্যাসী, এক মহাসাধক, গৃহবন্ধনে তাকে অবরুদ্ধ করা যাবে না। মা-হিসাবে সত্যবতী এইটুকু গর্ব অবশ্যই করতে পারেন যে তিনি হলেন ব্যাসদেবের ধারণমাতা। আপন গর্ভে তিনি এমন এক তেজস্বী পুত্রকে ধারণ করেছিলেন। আর মা হিসাবে সত্যবতী বড় পাওনা হল মহাসাধক ব্যাসের প্রতিশ্রুতি দান। সন্তান তাকে কথা দিয়েছেন, যখনই কোন প্রয়োজন অনুভব করবেন তখনই আমাকে মনে মনে স্মরণ করবেন, মাতৃআজ্ঞা পালনে আমি যেখানেই থাকি না কেন অতি অবশ্যই আমি আমার আপনার নিকট উপস্থিত হব—আমি জন্মের জন্য আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

এই ঘটানার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কুমারী মাতা মৎস্যগন্ধার মধ্যে দেখতে পেলাম এক অভাবনীয় পরিবর্তন। এই পরিবর্তন ঘটলো তার শরীরে, তার মনজগতে। যৌবন যেন আরও সম্ভারিত হল। তিনি যেন আরো অনেক বেশী আকর্ষনীয়া হয়ে উঠলেন। যে তাকে দেখে সেই মুগ্ধ হয়, তার সান্নিধ্যে এসে যে কোন মানুষ যেন তৃপ্তি পায়। সবচেয়ে বড় কথা হল সত্যবতী পরাশরের মাধ্যমে জেনে গেছেন তার নিজের প্রকৃত পরিচয়। তিনি বাসবী—বসুরাজের কন্যা। কৈবর্ত পল্লীতে দাসরাজের আশ্রয়ে তিনি পালিত হলেও, তার ধমনীতে রাজরক্ত প্রবাহিত। তাছাড়া পরাশর মুনির স্পর্শে সত্যবতীর মধ্যে গড়ে উঠেছিল

আত্মমর্যাদা বোধ। তিনি হয়ে উঠেছিলেন অত্যন্ত আত্মসচেতন। তার শরীর ঘিরে যে সৌরভের কথা পরাশর বলেছিলেন তাহলো তার রূপ লাবণ্যের মাধুরী যার মধ্যে সংমিশ্রিত হয়েছিল যৌবনেব সংযত উন্মাদনা, যা তার ব্যক্তিত্বকে করে তুলেছিল আরও বেশী আকর্ষনীয়া। মহাভারতের কথক হয়ত এই পরিবর্তনকেই মনে হয় 'গন্ধবতী' বা 'যোজনগন্ধা' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। আসলে তার রূপের সুনাম ধীবর পল্লী ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল বহুদুর পর্যন্ত। পরাশরের সংস্পর্শে এসে মৎস্যগন্ধা যেন নবজন্ম পেয়েছিলেন। নিজেকে রাজকন্যা বলে তিনি নতুন করে আবিষ্কার করেছিলেন। আর এই কারণে পালক পিতার জাতীধর্ম সংস্কারকে নিজের মন থেকে মুছে ফেলে পরাশর সান্নিধ্যে এসে তিনি লাভ করেছিলেন ব্রাহ্মণ্য সংস্কার। সত্যবতী আগেও জানতেন, তবে সে জানা এত পরিষ্কার ছিল না, যা তাকে স্পষ্টভাবে "বাসবী" বলে সম্ভাষণ করে জানিয়ে গেলেন মহামুনি পরাশর। তিনি রাজকন্যা—বসুরাজ পরিবারের সন্তান, অতএব তিনি একমাত্র রাজকুলের উপযুক্তা। তার অঙ্গ স্পর্শ করে তাকে শুচিতা দিয়েছেন ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ পরাশর—অতএব কৈর্বত পল্লীর কোন যুবা পুরুষ তার সমগোত্রীয় নয়। তার প্রেমিক হতে পারেন একমাত্র কোন রাজা—মহারাজা।

হস্তিনাপুরের রাজপ্রসাদ জুড়ে তখন নেমেছে অমানিশা। কারো মনে সুখ নেই, স্বস্তি নেই। স্বয়ং রাজা শান্তনু যেখানে বিপন্ন, সেখানে রাজপরিবারে কোন সুখ থাকে? রাজার রাজ্য শাসনে মন নেই। প্রজাদের পালনে তিনি হয়ে পড়েছেন উদাশিন, কেন এমন ছন্দপতন হল? সবচেয়ে অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন যুবরাজ দেবব্রত। তিনি এতদিন হস্তিনাপুরে এসেছেন, এর মধ্যে তার পিতাকে তিনি এত বিপন্ন হতে এর আগে কখনও দেখেননি। যে পিতা তাকে না দেখলে অস্থির হয়ে যেতেন সেই তিনি এখন একবারের জন্যেও তাকে কাছে ডাকেন না। রাজকুমারের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। তবে কি তিনি কোন অপরাধ করেছেন? তার মন পিতার ডাক শোনার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে, অথচ পিতা তাকে একবারের জন্যেও কাছে ডাকেন না। দিন যায়, পিতা

যেন ক্রমশ নিজেকে সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছেন। ক্রমশ তিনি যেন নিরাসক্ত হয়ে পড়ছেন রাজকার্যে। তবে কি পিতার মধ্যে বৈরাগ্যের উদয় হয়েছে? তার চিত্তে কি ত্যাগ বাসনা জেগে উঠছে? ভাবতে গিয়ে সবকিছু যেন এলোমেলো হয়ে যায়। বুঝে উঠতে পারেন না এই সময় কি তার কর্তব্য। আসলে সেদিন যমুনা সংলগ্ন বনাঞ্চলে মৃগয়ায় যা ঘটেছিল, সেকথাতো তিনি কাউকে বলতে পারেন নি, কাজেই কারো পক্ষে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব হল না। কি বলবেন তিনি—বলার তো রাজা শান্তনুর কিছু নেই। দাসরাজ যে কঠিন শর্ত তার প্রতি আরোপ করেছেন সেই শর্ত মেনে নেওয়া তার পক্ষে কষ্টসাধ্য। অথচ মন মানতে চায় না। ছুটে যেতে চায় সেই রমনীর দুর্বাব আকর্ষণে কৈবর্ত পল্লীতে। দাসরাজকে যদি তার মনের অবস্থাটা বোঝাতে পারতেন। নিজের রাজ্যে তিনি তার মনের কথা কাকে বলবেন? কেউ তাকে সমর্থন করবে না। সবাই এখন যুবরাজ দেবব্রতকে ভালোবাসে। তাছাড়া পুত্রও তার উপযুক্ত, বিবাহ যোগ্য। এই অবস্থায় পিতা হয়ে কোথায় তিনি পুত্রের বিবাহের ব্যবস্থা করবেন তা না করে তিনি নিজে বিবাহের কথা ভাবছেন। ভাবতে গিয়ে নিজের প্রতি নিজের ঘৃণা হয়। তবু তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না ওই রূপবতী নারীর রোমনীয় ললিত লাবণ্যকে। তার মনের গভীরে যে শূন্যতা এতদিন তিনি সংগোপনে চাপা দিয়ে রেখেছিলেন, সেই গোপনীয়তার দরজা সহসা যেন খুলে গিয়েছে সত্যবতীর দর্শণে। আশ্চর্য্য এই নারী—কি অসাধারণ তার আকর্ষণ তীব্রতা। প্রথম দর্শনেই বিদ্ধ হয়েছেন মহারাজ শান্তনু। শরবিদ্ধ ক্রোঞ্চির মতো তিনি শরযন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে থাকেন। বারবার বলতে চেয়েছেন, তুমি আমাকে গ্রহণ কর নারী, তুমি যে আমার মনের গোপন স্বপ্ন। এতদিন প্রতিটি নিশীত রাতে আমি যেন কল্পনায় তোমাকেই আমার পাশে দেখেছি। জীবনের অনেকটা সময় আমি নি:স্ব হয়ে একা হয়ে বেঁচে আছি। আমার শূন্যতা বোঝার মতো, জানার মতো, কেউ নেই। আমার প্রথমা পত্নী গঙ্গা আমাকে পরিত্যাগ করে গেছে। আমি তাকে আমার এই বিশাল রাজপুরীর মধ্যে বেঁধে রাখতে পারিনি। হয়ত সে এই রাজপুরীর যোগ্য নারী ছিল না। সে ছিল চঞ্চলা—সংস্কারের প্রতি তার কোন আকর্ষণ ছিল না। আমি

তাকে মন প্রাণ নিয়ে ভালোবাসা সত্বেও তাকে বেঁধে রাখতে পারেনি। তার সঙ্গে মিলনের মধ্যে ছিল এক শর্ত। এই শর্তভঙ্গের জন্য সে আমায় ত্যাগ করেছে। দেবব্রত আমার সন্তান। সেদিন শর্তমানলে হয়ত আমাকে অপুত্রক থাকতে হত। লোপ পেত বংশ পরম্পরার অভাবে কুরুবংশ।

গঙ্গা চলে যাওয়ার পর থেকে রাজা শান্তনু বড় নিসঙ্গ হয়ে গেছেন। রাজকাজ নিয়ে ব্যস্ততার মধ্যে কাটিয়েছেন। এখন দেবব্রতকে পেয়ে মনের কিছুটা অভাব তার মিটেছে বটে, কিন্তু পরিপূর্ণ তিনি হতে পারেন নি। 'রাজকার্য, পুত্রপালন, প্রজাকল্যাণ' এর বাইরেও তো রাজার ব্যক্তিগত কোন অভিলাষ থাকে। তিনি পুরুষ তার কামনা আছে, বাসনা আছে, আছে মনের গভীরে কত না বলা কথা, যে কথা শুধু ঘন নিবিড়তায় একমাত্র আপন বিশ্বাসী কোন প্রিয় নারীকে বলা যায়। সত্যবতীকে দেখার পর থেকে তাই তার নিঃসঙ্গ হৃদয় অস্থির হয়ে উঠেছে। প্রেম ব্যকুলতার উন্মাদনায় তিনি অধীর হয়ে পড়েছেন। অথচ সমস্ত ঘটনাটাই ঘটেছে বড় আকস্মিকতার মধ্যে। এমন একটা ঘটনা যে জীবনে কখনও কোন মুহূর্তে ঘটবে তার জন্য তিনি যেন প্রস্তুত ছিলেন না। আসলে একেই বলে বুঝি ভবিতব্য। মানুষ যা ভাবতে পারে না, তাই সময় সময় বড় আকস্মিকতার মধ্যে অকস্মাৎ ঘটে যায়। এরজন্য কেউ দায়ী থাকে না। ভবিতব্য না হলে তিনি যমুনা তীরবর্তী বনভূমিতে মৃগয়ায় গেলেন কেন? বনভূমির মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে মৃগয়া যোগ্য কোন পশুপাখীর সন্ধান তিনি পেলেন না। যেন তারা রাজ আগমনের সংবাদ পেয়ে প্রাণভয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। রাজা একাকী বনভূমির ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একসময় বসন্তের দক্ষিণা বাতাসে টের পেলেন মিষ্টি গন্ধের এক মন মদির করা সৌরভ। এই সৌরভ গন্ধ রাজার মনে যেন যৌবনের নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। এই গন্ধ কোথা থেকে আসছে; তার উৎস অনুসন্ধানের জন্য রাজা শান্তনু দ্রুত পায়ে এগিয়ে যেতে থাকেন। একসময় বনভূমি পার হয়ে এসে পৌঁছলেন যমুনার তীরে। দেখতে পেলেন খেয়াঘাটে একটি ছোট নৌকা বাঁধা আছে। আর সেই নৌকাতে বসে আছে সবিভঙ্গে এক অপরূপ লাবণ্যময়ী রূপবতী নারী। এমন রূপ এর আগে রাজা শান্তনু

কখনও প্রত্যক্ষ করেছেন বলে মনে হল না। তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল কামনার মসৃণ উষ্ণতা। নিঃসঙ্গ রাজা শান্তনু বিমোহিত হয়ে পড়েন। মনে হয় বহুযুগের ওপার থেকে আসা কোন এক স্বপ্নচারিণী অস্পষ্টতার ছায়াত্যাগ করে আজ এতদিন বাদে তার কাছে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। এই স্বপ্ন বিলাসিনীকেই তিনি যেন তার প্রতিটি নিঃসঙ্গ রাতে কামনা করেছেন আপন শয্যায়। কল্পনার অন্তরস্থলে যেন এই মুখচ্ছবি তিনি বহুবার প্রতিভাত হতে দেখেছেন। ফলে বিহ্বল রাজা আর স্থির থাকতে পারলেন না। নিঃশব্দে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন সেই কামনাময়ী নারীর সামনে। প্রশ্ন করলেন—তুমি কে লাবণ্যময়ী? একাকী এই জনশূন্য খেয়া ঘাটে বসে কার জন্য অপেক্ষা করছ? সত্যবতী তাকালেন। তার দুচোখে অপার বিস্ময়। এ'তিনি কাকে দেখছেন। ইনি নিশ্চয় কোন রাজা হবেন? অত্যন্ত বুদ্ধিমতী সত্যবতী তবু নিজের অন্তর বিহ্বলতাকে বিন্দুমাত্র প্রকাশ করলেন না, কেবল শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন—আমি মৎস্যকন্যা, দাসরাজার কন্যা।

—তুমি এখানে একাকী বসে আছ কেন? তুমি কি কারো জন্য অপেক্ষা করছ?

—হ্যাঁরাজা আমি এই খেয়া ঘাটে নৌকো নিয়ে অপেক্ষা করছি যাত্রীর জন্য। খেয়া পার করাই হল আমার কাজ। আপনি কি আমার নৌকার যাত্রী হবেন?

রাজা শান্তনু অপলক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন তারদিকে। চোখের পলখ পড়ে না। তারপর একসময় বললেন, না সুন্দরী, আমি কেবল বিস্মিত হয়েছি।

—কিসের বিস্ময় রাজা?

—তোমার এই রূপ, তোমার এই যৌবন আমাকে বিমোহিত করেছে।

সত্যবতী হেসে বললেন, এ' আপনি অতিরঞ্জিত করছেন, আমি এক সামান্যা কৈবর্ত নারী। নৌকা নিয়ে খেয়া পারাপার করি। দাস রাজার কন্যা।

মুখে একথা বললেও সত্যবতী বুঝেছিলেন যে মহারাজ পুরুষটি তার মানুষে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি অবশ্যই তার রূপে মুগ্ধ হয়েছেন। কামবিদ্ধ রাজার অভিব্যক্তি বুঝে নিতে তাই তার কোন অসুবিধে হল না।

মহারাজ শান্তনু এবার শান্ত কণ্ঠে নিজের পরিচয় দিলেন। তারপর অত্যন্ত বিনম্র ভাবে বললেন, আমি তোমাকে আমার কাছে চিরদিনের জন্য একান্ত করে পেতে চাই নন্দিনী, আশা করি তুমি আমাকে প্রত্যাখান করবে না।

সত্যবতী্য চতুরতা কন্যা। তার মধ্যেও আছে রাজরক্ত। মহামুনি পরাশারের অঙ্গ স্পর্শে তার চেতনা অনেক বেশী সমৃদ্ধ হয়েছে। তাই তিনি আর দশটা মেয়ের মতো সহজে হস্তিনাপুরের রাজার পরিচয় পেয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে অনঢ় ভঙ্গিতে বললেন, মহারাজ আমি নারী, যৌবন নারীর সহজ প্রাপ্ত হলেও, তাকে যত্রতত্র ভোগাধিকার আমার নেই। আমাকে যদি সত্যি আপনার কাছে একান্তভাবে পেতে চান তাহলে আপনি আমার পিতার সঙ্গে কথা বলুন। পিতার মতামত ভিন্ন আমি কোন অঙ্গীকার করতে পারি না। তিনি আমার পালনকর্তা, অন্নদাতা, আশ্রয়দাতা, তাকে অস্বীকার করে কোন কাজ করার অধিকার আমার নেই।

শান্তনু আপত্তি করলেন না। তিনি তখন সত্যবতীর রূপ মাদকতায় বিদ্ধস্ত। তার অন্তর তখন কামনায় অস্থির হয়ে আছে। তার নিসঙ্গ জীবনকে তিনি ভরে নিতে চান। পান করতে চান ওই যৌবন সুধারস। দীর্ঘদিনের অতৃপ্তির তৃষ্ণা আজ তাকে যেন চরম লক্ষ্যে এসে দাঁড় করিয়েছে। তাই তিনি সত্যবতীকে সঙ্গে গিয়ে উপস্থিত হলেন ধীবর পল্লীতে।

দাসরাজার সামনে দাঁড়িয়ে শান্তনু সদাম্ভিকতায় বললেন, হে দাসরাজ অনুগ্রহ করে আপনি আপনার কন্যাকে আমার হাতে সমপর্ণ করুন। আমি হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনু। আমি আপনার কন্যাকে বিবাহের জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব।

ধীবর রাজা বুদ্ধিহীন ছিলেন না। তিনিও একজন প্রজ্ঞ মানুষ, বাস্তব

বুদ্ধি সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব। নিজের স্বজাতীর কাছে তিনি যথেষ্ট আস্থা ভাজন ও সন্মানীয় বটে। তিনি তো জানতেন সত্যবতী তার নিজের কন্যা নয়। তিনি তাকে পালন করেছেন মাত্র। তিনি হলেন মৎস্যরাজের কন্যা। রাজকন্যা হয়ে তার ভবিষ্যত নির্ধারণ করা এত সহজ কাজ নয়। মৎস্যরাজ তাকে তার মেয়ে সম্পর্কে সর্তক করে দিয়েছেন। বারবার বলেছেন, আমার কন্যাকে তোমার হাতে তুলে দিলেও, তার ভবিষ্যত সম্পর্কে তুমি এমন কোন সিদ্ধান্ত নেবে না যাতে আমার রাজকুলে মর্যদা হানী হয়। কাজেই বাস্তব সচেতন দাসরাজ বুঝতে পারলেন মহারাজ শান্তনু সত্যবতীর রূপে বিদ্ধ হয়েছেন। অতএব এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে মেয়ের ভবিয্যত সমাদর সম্পর্কে স্বীকৃতি রাজার কাছ্‌ থেকে আদায় করে নিতে হবে। রাজবংশের মেয়ে বলেই দাসরাজের ছিল এত সতর্কতা। তিনি চেয়েছিলেন তার এই পালিতকন্যা যেন যথার্থ রাজকন্যার মর্যদা পায়। হস্তিনাপুরের রাজগৃহে গিয়ে যেন তিনি অন্যতমা রাজভোগ্যা রমনী হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। হয়ত দাসরাজা হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনুর বিষয়ে আগেই জানতেন। জানতেন তিনি তার প্রথমা স্ত্রী গঙ্গাকে হস্তিনাপুরে যথার্থ মর্যাদা দিয়ে রাখতে পারেন নি। গঙ্গার মতো যাতে কৈর্বত পল্লীর কন্যা হিসাবে সত্যবতী ভবিষ্যত একই ধারায় প্রবাহিত না হয় তারই জন্য দাসরাজ বললেন শান্ত কঠিন স্বরে—কন্যা যখন হয়েছে, তাকেতো পাত্রস্থ করতেই হবে মহারাজ। পাত্র হিসাবে আপনি যে আমার কন্যার উপযুক্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বিবাহের পূর্বে আমার একটি শর্ত আছে।

—আবার শর্ত! প্রথম বিবাহের সময় গঙ্গা শর্ত আরোপ করেছিলেন, এবার দাসরাজ কি এমন কঠিন শর্ত আরোপ করতে চান? তাই বিস্মিত শান্তনু বললেন—শুনি আপনার শর্ত। কি শর্ত আপনি আরোপ করতে চান?

দাসরাজ মনে হয় মহারাজ শান্তনুর সমস্ত কথাই জানতেন। জানতেন গঙ্গাপুত্র দেবব্রতকে মহারাজ শান্তনু ইতিমধ্যে হস্তিনাপুরের যুবরাজ বলে ঘোষণা করেছেন। শান্তনুর মৃত্যুর পর কুরুবংশের রাজা হবেন কুমার দেবব্রত। যদি তাই হয় তাহলে মৎস্যরাজের কন্যার রাজপ্রাঙ্গণে মর্যাদা কোথায় থাকে। দাসরাজের প্রয়োজন মৎস্যরাজের কন্যার যথার্থ

বাজমর্যাদা পাওয়ার অধিকার। আর এই অধিকার পেতে হলে সত্যবতীর সন্তান যদি রাজা হতে পারে তাহলেই সেটা সম্ভব হবে। এই কারণেই রাজা শান্তনুকে দিয়ে এমন একটা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেওয়াই ছিল দাসবাজের মূল উদ্দেশ্য। রাজা যেখানে রূপ মাদকতায় বিহ্বল, সেখানে এই অঙ্গীকার করানোর এটাই হল মস্ত সুযোগ। দাসরাজ সুযোগের সদব্যবহারের জন্য তৎপর হলেন। তাই চোয়াল শক্ত করে দৃঢকণ্ঠে দাসরাজ বললেন, মহারাজ আপনি যদি সত্যি আমার কন্যাকে আপনার সহধর্মিনী হিসাবে গ্রহণ করতে চান তবে সর্বাগ্রে আপনাকে আমার শর্তে সন্মত হতে হবে, আমি আপনার অঙ্গীকার ছাড়া আমার কন্যাকে আপনার হাতে তুলে দিতে পারি না।

রাজা শান্তনু রূপমুগ্ধতায বিহ্বল হলেও বুদ্ধি হাবালেন না। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন দাসরাজ তাব দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কোন •এক কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিতে চাইছেন। একদিন গঙ্গাও তাকে বিবাহের আগে তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এমন এক ভয়ংকর অঙ্গীকার করিয়ে নিয়েছিল, যে কারণে মহারাজ শান্তনুর, সাত সাতটি সন্তানকে গঙ্গাবক্ষে বিসর্জন দিতে হয়েছে। ওই ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা না ভাঙলে হয়ত অষ্টম পুত্র দেবব্রতকেও তার পক্ষে পাওয়া সম্ভব হতো না। তাই দাসরাজের মুখে নতুন করে প্রতিজ্ঞার কথা শুনে থমকে গেলেন মহারাজ শান্তনু। বুঝতে পারলেন একজন রাজা হিসাবে তার পক্ষে এতটা হৃদয় দুর্বলতা প্রকাশ করা উচিত হয়নি। উচিত হয়নি তার পক্ষে এই ধীবর পল্লীতে ওই কন্যার কারণে উপস্থিত হওয়া। দাসরাজের চোখের কোলে মহারাজ শান্তনু লক্ষ্য করলেন এক কুটিল চাউনি। এই চাউনির অর্থ তার জানা। অর্থাৎ অসম্ভব কোন চাহিদা। তার মনে হল দাসরাজ তার মনভাব বুঝতে পেরে তাকে দিয়ে এমন কোন প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিতে চাইছেন যা তার পক্ষে বাস্তবে রাখা হয়ত সম্ভব হবে না। যা অসম্ভব তাকে তিনি সম্ভব করবেন কিভাবে? মহারাজ শান্তনু মুহূর্তেব জন্য মন থেকে কামনার ভাব সরিয়ে নিয়ে একজন দূরদর্শী রাজার মতো পরম আত্মনির্ভরতায় বললেন, দাসরাজ আপনি হয়ত ভুল করছেন। কোন অভিলাষ না জেনে কারো পক্ষে কোন অঙ্গীকার করা সম্ভব নয়। আগে আপনি আপনার অভিলাষ

আমাকে ব্যক্ত করুন। আপনার অভিলাষ না জেনে আমিতো আপনাকে তা পুরণ করার কোন অঙ্গীকার করতে পারি না। তবে আপনার অঙ্গীকার যদি আমার পক্ষে পুরণ করা সম্ভব হয়, যদি আমার সাধ্যের মধ্যে থাকে, তাহলে নিশ্চয় তা পুরণ করবো। তবে আশা করবো এমন কোন দুর্লভ বস্তু বা অসম্ভব বস্তু আপনি প্রত্যাশা করবেন না, যা আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হবে না।

দাসরাজ মনে মনে হাসলেন। ধূর্তরাজা তুমি কি আমার চাইতেও ধূর্ত? আসলে তিনি তো স্পষ্ট বুঝে গেছেন মহারাজ শান্তনু সত্যবতীর রূপ মুগ্ধতায় মগ্ন হয়ে আছেন। মুখে তিনি যতই দৃঢ়তা দেখাবার চেষ্টা করুন না কেন অন্তরে তিনি সত্যবতীর রূপ বাণে বিদ্ধ হয়েছেন। তাই দাসরাজ কোনরকম ভনিতা না করেই বললেন, আমার শর্ত অত্যন্ত তুচ্ছ ও সাধারণ। আমার মনের হয় যে কোন পিতাই কন্যা সম্প্রদানের আগে এমন প্রত্যাশা আশা করে থাকেন। আমার মনে হয় আমার প্রস্তাবে আপনার অসম্মতি হওয়ার কোন কারণ নেই।

—বেশ বলুন তাহলে?

শান্তনু তাকালেন দাসরাজের দিকে। দাসরাজ সহজভাবে বললেন, আমার কন্যার সঙ্গে বিবাহের পর তার গর্ভে যে পুত্র জন্মাবে, তাকেই আপনাকে যুবরাজ বলে ঘোষণা করতে হবে। সেই হবে আপনার সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। আপনার জীবদ্দশাতেই সেই পুত্রকে যুবরাজ ঘোষণা করতে হবে জনসমক্ষে, যাতে অন্য কোন সমস্থানীয় ব্যক্তি ওই সিংহাসনের দাবী করতে না পারে। দাসরাজের কথায় চমকে উঠলেন রাজা শান্তনু! বলেন কি দাসরাজ। এই কৈবর্ত কন্যার পুত্রকে যুবরাজ ঘোষণা করতে হবে। তার অর্থ দেবব্রতকে বঞ্চিত করা।

মনে হয় দাসরাজের কথা শুনে তিনি হস্তিনাপুরের সমস্ত খবরই রাখতেন। তিনি জানতেন গঙ্গাপুত্র দেবব্রত'র কথা। যদি না জানতেন তাহলে সমস্থানীয় কথাটি তিনি প্রয়োগ করতেন না, প্রয়োজন হত না এই ধরনের কোন অঙ্গীকার করানোর।

দাসরাজের প্রস্তাবে চমক ছিল। থমকে গেলেন মহারাজ শান্তনু। মুহুর্তে তার দৃষ্টি সম্মুখে ভেসে উঠলো এক তেজদীপ্ত যুবকের মুখশ্রী। এই মুহুর্তে সে ছাড়া রাজা শান্তনু'র নিজস্ব বলে কোন সম্বল নেই।

তার রাজ্যের প্রতিটি মানুষ গঙ্গাকে রাজরানী বলে মেনে নিতে না পারলেও, দেবব্রতকে তারা রাজপুত্র বলে মেনে নিয়েছেন। তার আচরণ, শিষ্ঠাচার, শাস্ত্রজ্ঞান. ধর্মজ্ঞান, রাজনীতি জ্ঞান, সর্বোপরি ধর্নুবিদ্যা ও অসিচালনার চাতুর্য মুগ্ধ করেছে সমগ্র রাজ্যবাসীকে। তারা সকলেই দেবব্রতকে যুবরাজ বলে মেনে নিয়েছে। আজ যদি রাজা শান্তনু তাব মত পরিবর্তন করে এই কৈবর্তকন্যার সন্তানকে যুবরাজ বলে ঘোষণা করেন, তাহলে হস্তিনাপুরের প্রজাকুল সহজে তা মেনে নেবে না। তারা বিদ্রোহ ,করবে। অসম্ভব! একজন পিতা হয়ে এমন একটি নির্দয় কাজ তিনি তার অনুগত পুত্রের প্রতি করতে পারেন না। এটা অধর্ম—অন্যায়-পাপ। তাই দাসরাজের প্রস্তাব শুনে মুহুর্তের জন্য স্তম্ভিত হলেন মহারাজ শান্তনু। বললেন, তা কি করে সম্ভব দাসরাজ। আপনি হয়ত জানেন না আবার প্রথমা স্ত্রী গঙ্গার পুত্র দেবব্রতকে আমি ইতিমধ্যে যুবরাজ হিসাবে ঘোষণা করেছি। অতএব একবার কেউ যুবরাজ পদে অভিসিক্ত হলে দ্বিতীয়বার কাউকে সেই পদে অভিসিক্ত করা যায় না। এটা রাজধর্মের পক্ষে কখনই সমুচীন নয়। তাছাড়া দেবব্রত হল জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমাদের বংশধারা অনুযায়ী কনিষ্ঠকে রাজ্যাধিকার দেওয়া অন্যায়। এমন অন্যায় কাজ আমার পক্ষে করা কখনই সম্ভব নয। আপনি বরং তার চেয়ে অন্য কোন শর্তের কথা চিন্তা করুন। মহারাজ শান্তনুর কথায় দাসরাজ মৃদ্যু হেসে বললেন, দেখুন রাজা, কন্যার বিবাহে পিতাকে সদাসর্বদা সর্তক থাকতে হয় ভবিষ্যতের কথা ভেবে। যদি আমার কন্যার গর্ভজাত সন্তান রাজ্যাধিকার না পায় তাহলে আপনার বিশাল বাজপুরীতে তার কিসের মর্যাদা রইল। তারপর একটু হেসে গম্ভীর কণ্ঠে দাসরাজ বললেন, যদি আপনি আমার প্রস্তাবে সন্মত থাকেন, তাহলেই আমি আমার কন্যার কল্যানে আপনার হাতে তাকে সমপর্ণ করতে পারি।

অসম্ভব! এমন প্রস্তাব মানা যায় না। অতএব অবনত মস্তককে দাসরাজের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে সেদিনের মতো মহারাজ শান্তনু হস্তিনাপুরে ফিরে এসেছিলেন বটে, কিন্তু মন থেকে একবারের জন্য মুছে ফেলতে পারলেন না দাসকন্যার লাবণ্যময় মুখশ্রীকে, সেই থেকে রাজার মনের মধ্যে শুরু হল অন্তর দ্বন্দ্ব। তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন।

রাজকার্য, প্রজাপালন, মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা, পুত্র দেবব্রত'র সঙ্গে নিভৃতে কথাবার্ত্তা সব তিনি ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিলেন। ক্রমান্বয়ে নিজেকে বিছিন্ন করে তুললেন সকলের থেকে। তার মন জুড়ে তখন একমাত্র সত্যবতীর ভাবনাই স্পষ্ট। যে করেই হোক ওই নারীকে তার চাই—তাকে তার পেতে হবে। কিন্তু কি ভাবে পাবেন? দাসরাজের কঠিনশর্ত তিনি পালন করবেন কি করে? তার সামনের পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছেন পুত্র দেবব্রত। তিনিতো তাকে আগেই যুবরাজ ঘোষণা করেছেন। এই মুহুর্তে তাকে বঞ্চিত করে ওই কৈর্বতনারীর পুত্রকে যুবরাজের অঙ্গীকার করলে সমস্ত প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। তারা কিছুতেই রাজার এই প্রস্তাবকে মেনে নেবে না। আর দেবব্রত—মা হারা সন্তান, তাকে তিনি ব্যথিত করবেন কিভাবে। বর্তমানে সেই তো এখন এইরাজ্যের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। তার কারণেই বর্তমানে হস্তিনাপুরবাসী আত্মরক্ষায় নিশ্চিন্ত। কাজেই দেবব্রতকে বঞ্চিত করা তারপক্ষে ইচ্ছা থাকলেও বাস্তবে সম্ভব নয়। মনের মধ্যে ভাবতে গিয়ে অবসাদ নেমে আসে। কিহবে এই পার্থিব সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে। মনে হয় রাজপাট ছেড়ে দিয়ে বনে চলে যাবেন, সন্ন্যাস নেবেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করলে যদি কামনাকে জয় করা যায়। যদি মন থেকে ভোলা যায় ওই নারীকে। সেই কারণে ধ্যান সাধানায় নিজেকে নিমগ্ন রাখেন। পিতার এই অবস্থা দেখে ক্রমশ বিপন্ন হয়ে ওঠেন যুবরাজ দেবব্রত।

এদিকে দাসরাজ একটু অবাক হলেন। তিনি ভাবতে পারেন নি মহারাজ শান্তনু এইভাবে সরাসরি তার প্রস্তাবকে উপেক্ষা করবেন। কারণ তিনি তার দৃষ্টিতে যে কামনার বহ্নি লক্ষ্য করেছিলেন, তাতো মিথ্যে ছিল না। তবে মহারাজ শান্তনু যতই আত্মদাম্ভিকতায় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে থাকুন না কেন, এর প্রতিক্রিয়ার যন্ত্রণা রাজাকে অবশ্যই অস্থির করে তুলবে। সত্যবতীর রূপে মহারাজ যখন একবার বিদ্ধ হয়েছেন তখন তার থেকে ওই পৌঢ় রাজার কোন নিস্তার নেই। নিঃসঙ্গ পুরুষের জীবনে নারীর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী তা সে যে কোন বয়সের পুরুষই হোক না কেন। সেই নিঃসঙ্গ পুরুষ অন্তর যদি একবার কোন রূপবতী নারীর দ্বারা আকৃষ্ট হয় তবে সেই হৃদয় চঞ্চলতাকে সংযত রাখা অত্যন্ত কঠিনকাজ। অতএব দাসরাজ একরকম

প্রায় নিশ্চিন্ত ছিলেন, মহারাজ শান্তনু তার প্রস্তাবে শেষ পর্যন্ত সম্মতি দেবেন এবং গ্রহণ করবেন সত্যবতীকে। আসলে সত্যবতীকে যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে পালিতপিতা হিসাবে দাসরাজ বদ্ধ পরিকর। সত্যবতীতো সাধারণ একজন কৈর্বত নারী নয়—সে হল মৎস্যরাজের কন্যা বাসবী, অতএব তার মর্যাদার প্রাপ্য স্বীকৃতি যাতে সে পায় সেই দিকটাতো ভালোভাবে দেখতে হবে। যদি সে দাসরাজের নিজের কন্যা হত, তাহলে হয়ত দাসরাজ এই শর্ত নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করতেন না। বরং আনন্দে তুলে দিতেন কন্যাকে হস্তিনাপুরের অধীশ্বর শান্তনুর হাতে। কিন্তু তিনি তো সত্যবতীর পালিত পিতা, অতএব মর্যাদা রক্ষা না করে তিনি তো কন্যাকে সম্প্রদান করার গুরু দায়িত্ব নিতে পারেন না। মৎসরাজ তাকে কন্যার ভবিষ্যত নির্ধারণ সম্পর্কে বহুবার সর্তক করে দিয়েছেন। অতএব আপন দায়বদ্ধতা থেকে তিনিতো সরে আসতে পারেন না। তবে মহারাজ শান্তনু তার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে চলে গেলেও দাসরাজের মনে কিন্তু আত্মবিশ্বাস ছিল। তিনি বুঝেছিলেন মহারাজ শান্তনু মানসিক ভাবে সত্যবতীকে দর্শনের পর দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তার দুচোখে তিনি যে কামনার আগুন জ্বলতে দেখেছেন তা থেকে তিনি একাবারে নিসন্দেহ ছিলেন, মহারাজকে এই কৈবর্ত পল্লীতে ফিরে আসতে হবে। তার সমস্ত শর্ত মেনে নিয়ে কন্যাকে তার কাছ থেকে সম্প্রদানের জন্য প্রার্থনা করতে হবে। আর সত্যবতী—তিনিও যেন প্রথম দর্শনে ভালোবেসে ফেলেছেন রাজা শান্তনুকে। বারবার তার মনে হয়েছে, আমি রাজকন্যা বাসবী। আমার ধমনীতে রাজরক্ত প্রবাহিত, অতএব হস্তিনাপুরের ওই মহারাজই হলেন আমার যোগ্য স্বামী। আমার আপন মর্যাদা প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। কিন্তু দাসরাজের প্রস্তাব উপেক্ষা করে তিনিতো চলে গেলেন—আবার তিনি আসবেন তো? মনে মনে সেই মুহূর্তে কে যেন বলে ওঠে, "বাসবী, তুমি স্থির হও। তুমি হবে একদিন ওই কুরুবংশের রাজামাতা এটাই তোমার ভবিতব্য। নিয়তিকে কেউ খণ্ডন করতে পারে না। তুমি তোমার নিজের কথা ভেবে দেখ, তুমি কি পেরেছ তোমার ভাগ্য বিধানকে খণ্ডন করতে? বসুরাজের কন্যা হয়ে তোমার স্থান হয়েছে কৈবর্ত পল্লীতে। তোমাকে এই অবস্থার উত্তরণ ঘটিয়ে আবার নতুন করে

তোমাকে তোমার নিজস্ব আত্মমর্যাদায় ফিরতে হবে—এটাই হবে তোমার যথার্থ চাহিদা। তোমার মনের এই চাহিদাকে সার্থক রূপ দেবার জন্যই তোমার পালক পিতা যথার্থ শর্ত আরোপ করেছেন। রাজা শান্তনুর উপায় নেই—তাকে এই শর্ত পুরণ করে তোমাকে তার সহধর্মিনী করতে হবে—এটাই যে তোমার ভাগ্য লিখন। তুমি হবে এক মহাকাব্যের কেন্দ্র নারী চরিত্র।

দিন যত যায়, মহারাজ শান্তনু যেন ততো বেশী নি:সঙ্গতা অনুভব করেন। আগে তবুও রাজসভায় এসে কিছুক্ষণের জন্য হলেও বসতেন, সকলের কথা শুনতেন, কিন্তু কয়েকদিন হলো সেটাও বন্ধ করে দিয়েছেন। যুবরাজ দেবব্রত অত্যন্ত বিপন্নবোধ করেন। তিনি রাজবৈদ্যের সঙ্গে কথা বলে জেনেছেন, মহারাজের শরীরে কোন কঠিন ব্যধির চিহ্ন নেই। কোন বিশেষ দুঃচিন্তার কারণে, অনিদ্রার ফলে শারীরিক যে দুর্ব্বলতা দেখা দিয়েছে তা আদৌ গুরুতর কিছু নয়। তাহলে? কিসের দুঃচিন্তা পিতার। রাজ্যতো ভালই চলছে। প্রজারা সুখে আছে। খাদ্যাভাব নেই, নেই কোন বিদেশী আক্রমণের সম্ভাবনা, তাহলে কি কারণে পিতা এত দুঃচিন্তা করছেন? এর উত্তর তো তার জানা নেই। কেউ তাকে দিতে পারেনি। শেষে একদিন নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করে যুবরাজ সাহস ভরে নিজেই প্রবেশ করলেন মহারাজ শান্তনুর কক্ষে। নির্জন কক্ষে উঁকি দিয়ে দেখতে পেলেন পিতা উন্মুক্ত বাতায়নের সামনে দাঁড়িয়ে নক্ষত্র খচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। ধীর পদক্ষেপে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালেন পিতার পাশে। তারপর মৃদ্যু স্বরে ডাকলেন—পিতা।

আত্মতন্ময়তা ভেঙ্গে চমকে তাকালেন মহারাজ শান্তনু। দেখতে পেলেন পুত্র দেবব্রতকে। তাকে এইসময় বীনা অনুমতিতে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে বিস্মিত মহারাজ প্রশ্ন করলেন—কি ব্যাপার, তুমি হঠাৎ আমার কক্ষে প্রবেশ করেছ?

দেবব্রত কিন্তু পিতার কথায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললেন—কেন আপনার কক্ষে কি আমার প্রবেশাধীকার নেই?

মহারাজ শান্তনু পুত্রের কথায় বিব্রত হয়ে পড়লেন। বুঝতে পারলেন

না এই মুহূর্তে তিনি তাকে ঠিক কি বলবেন। আত্মাভিমানী দেবব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে শান্তনু যেন মুহূর্তের মধ্যে অসহায় হয়ে গেলেন। যে পুত্রকে তিনি এতদিন ধরে নিজের স্বপ্ন দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, বাসনা দিয়ে, কামনা দিয়ে বড় করে তুলেছেন, আজ তাকে দুঃখু দিতে বড় বেশী বুকে বাজে। দোষ তো তার নয়। সে তো নিরাপরাধ। মনের মধ্যে এক ধীবর কন্যার প্রহেলিকা তার জীবনের সমস্ত সুখ কেড়ে নিয়েছে। তিনি কিছুতেই পাচ্ছেন না ওই রূপময়ীয় মায়াবী আকর্যণের জাল থেকে বেরিয়ে আসতে। এই অক্ষমতার জন্য দায়ীতো তিনি নিজে। তাই তিনি পুত্রের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে বললেন, তুমি আমায় কিছু বলতে এসেছ কুমার?

—হ্যাঁ পিতা, যদি আপনি কিছু মনে না করেন তাহলে আমাকে আপনি বলবেন কি, কোন দোষে আজ আমি আপনার স্নেহ থেকে পরিত্যক্ত?

—কে বলেছে তুমি পরিত্যক্ত?

—আপনার আচরণ। আমি জানি না আপনি কোন চিন্তায় এত নিমগ্ন হয়ে আছেন। রাজ্যের প্রজারা সকলেই আপনার কারনে উদবীঘ্ন। আমি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি রাজ্যে এখন কোন অশান্তি নেই, অমঙ্গল বার্তা নেই, প্রত্যেকেই স্ব-স্বক্ষেত্রে সুখে আছে। অথচ আপনি একজন রাজ্যে পালক হয়ে কোন এক গোপন দুঃচিন্তার কারণে নিজেকে সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন। আপনার এই-আচরণে আমি কষ্ট পাচ্ছি। যদি সম্ভব হয় আপনি আমায় দয়া করে বলুন, কি কাজ করলে আপনি দুঃচিন্তা মুক্ত হবেন। আপনি আবার আপনার স্বাভাবিক জীবন ফিবে পাবেন। পুত্রের কথায় চমকে উঠলেন মহারাজ শান্তনু। দ্রুত কোন উত্তর দিতে পারলেন না। কি উত্তর তিনি দেবেন। বলতে গেলে যে কথা তাকে বলতে হবে, সে কথা একজন পিতা হয়ে পুত্রকে বলা যায় না। বলতে পারা যায় কি—শোন পুত্র দেবব্রত এই মুহূর্তে তুমি আমার জীবনের কাছে এক মস্তবড় অন্তরায়। শুধু একমাত্র তোমার কারণেই আমি দাসরাজের শর্তে রাজি হতে পারিনি। আমার আশাভঙ্গ হয়েছে। অথচ ওই নারী আমাকে সর্বক্ষণের চিন্তায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমি তার কারণে অত্যন্ত ব্যকুল। বলতে গিয়েও থমকে যান। নিজেকে সংযত

করে আকাশের দিকে উদাশ দৃষ্টি মেলে ধরেন। তার মনে হয় গঙ্গাপুত্র মনের দিক দিয়ে খুবই সরল। মাকে হারিয়ে সে কষ্টে আছে, তার উপর আজ যদি আমি পিতা হয়ে তাকে বলি দাসরাজের প্রস্তাবের কথা, তাহলে সেটা হবে এক চরম নিষ্ঠুরতা। হয়ত সে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। যদি সে নিজে বিদ্রোহী না হয় তো তার কারণে প্রজা বিদ্রোহ দেখা দেবে। এই হস্তিনাপুরের সমস্ত শান্তি রক্ষার দায়িত্ব এখন তার উপর। অস্ত্রবিদ্যার যাদুমন্ত্রে সে দীক্ষিত—এই মুহূর্তে তাকে বাদ দিয়ে হস্তিনাপুরের অস্তিত্বের কথা ভাবা যায় না। প্রজারা জানে সে হবে আমার উত্তরাধিকারী—তাকে বঞ্চনা করা অন্যায়, পাপ। তাছাড়া বংশপরম্পরা ধরাকে মহারাজ শান্তনু লঙ্ঘন করবেন কি করে?

পিতাকে নিরুত্তর থাকতে দেখে দেবব্রত শান্ত কণ্ঠে বললেন—পিতা আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের যথার্থ কোন উত্তর এখনও দেন নি। আমি জানতে চাই আপনার মন বেদনার প্রকৃত কারণ? কারণ না জেনে আজ আমি আপনার কক্ষ ত্যাগ করবো না।

পুত্রের কথায় অত্যন্ত বিপাকে পড়ে গেলেন মহারাজ শান্তনু। ভাবতে লাগলেন কি ভাবে তিনি পুত্রকে যথার্থ কথাটি ব্যক্ত করবেন। শেষ পর্যন্ত অনেক ভাবনা চিন্তা করে অনাবিল পুত্র বাৎসল্য দিয়ে শুরু করলেন পুত্রের প্রশংসা করতে। বললেন—আমি জানি তুমি আমার জন্য অত্যন্ত চিন্তান্বিত আছ। কিন্তু বৎস, আমি যে তোমার কারণে অত্যন্ত উদবীঘ্ন।

—আমার কারণে উদবীঘ্ন?

—হ্যাঁ পুত্র, মনে রেখ তুমি হলে আমার এই বিখ্যাত বংশের একমাত্র পুত্র। তোমার মধ্যে আছে তেজ, আছে দিপ্তী, আছে অস্ত্র প্রদর্শনের দক্ষতা আর সেই সঙ্গে উদ্যোম পুরুষোকার। তাই মাঝে মাঝে আমার ভয় হয় তোমার এই যুদ্ধপ্রিয়তা, তোমার অস্ত্র বিদ্যার অধীক দক্ষতা, তোমাকে কোন বিপদের সামনে দাঁড় করাবে না তো? এই চিন্তাতেই আমার মন ভরাক্রান্ত।

—এই চিন্তা অমুলক পিতা?

—কেন অমুলক পুত্র। আসলে তুমি নাবালক; তুমি পুত্র স্নেহের যথার্থ তাৎপর্য বুঝবে না। তোমার প্রতি আমার স্নেহ দুর্বলতার কারণেই

হয়ত আমি অকারণে মনে মনে তোমার অনিষ্ট চিন্তার কথা ভাবি। মনে হয় কোন দৈব ঘটনায় যদি কোন বিপদ ঘটে, যদি তোমাতে আমাতে বিচ্ছিন্ন ঘটে, তাহলে এই সুবিশাল কুরুবংশের কি হবে—

দেবব্রত হেসে আবার বললেন—এ' আপনার অবান্তর চিন্তা পিতা।

—না পুত্র, মনে রেখ মনুষ্যগণের কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। জীবন বড় চঞ্চল, এই চঞ্চল জীবনে কখন কার দৈব ঘটনার চাপে পড়ে কি ঘটে, একথা আমরা কেউই তা হলপ করে বলতে পারি না। তাই ভাবি যদি তোমার সত্যি কোন বিপদ ঘটে যায়, তাহলে এই পরম্পরাগত বিশাল বংশটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর কণ্ঠস্বরে খাদ বদল করে রাজা শান্তনু বললেন—যদিও আমি জানি যুদ্ধে, ধনুক বিদ্যায় তুমি অপরাজেয়, তবু তুমি আমার একমাত্র সন্তান বলেই আমি এত ভয় পাই। বংশনাশের কথা মনে হলেই আমার অন্তর কেঁপে ওঠে, তবে আমি পুত্র কামনায় এই বয়সে নতুন করে আর দারপরিগ্রহ করতে চাই না। তবে কি জান, শাস্ত্র মতে পিতার কাছে একটি মাত্র পুত্রও যা নি:সন্তান হওয়াও তাই।

পিতার কথা শুনে দেবব্রত থমকে যান। ভাবতে থাকেন নতুন করে। সত্যি তো তিনি পিতার একমাত্র পুত্র—এই অবস্থায় কিভাবে তিনি পিতাকে সাহার্য করতে পারেন। তাঁর বেদনাকে তিনি দুর করবেন কিভাবে। তাই বললেন—আপনার এই যন্ত্রনাকে আমি কিভাবে উপশম করতে পারি পিতা—আপনি বলুন? শান্তনু বললেন—তোমার পক্ষে আমার এই যন্ত্রনা উপশম করা সম্ভব নয় পুত্র। যোজ্ঞের কথাই বল, আর বেদের কথাই বলো—এই সমস্ত কিছুই পুত্র প্রাপ্তির সৌভাগ্য থেকে কম। মানুষের কাছে পুত্র বাসনা ধর্ম সম্মত আর সেই কারণে বিবাহ'ই হল একমাত্র উৎকৃষ্ট পথ। তবে আমি এই বয়সে আর বিবাহে আগ্রহী নই। পিতা শান্তনু আকার ইঙ্গিতে যে কথা বললেন তা বুদ্ধিমান যুবরাজের পক্ষে বোঝা মোটেই অসুবিধা কর হল না। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, পিতা তিনি ছাড়াও অন্য পুত্রের আকাঙ্খা করছেন। এই আকাঙ্খা তার মধ্যে তীব্র হয়ে উঠেছে।

এখানে একটা কথা আছে—মহারাজ শান্তনু যে যুক্তি দেখালেন সেই যুক্তি আধুনিক মন নিয়ে মেনে নেওয়া যায় না। যদি বংশনাশের

কথাই তিনি প্রকৃত ভাবে ভেবে থাকতেন, তাহলে তো তিনি দেবব্রতকে বিবাহের কথা বলতেন। অথচ তিনি কুমার দেবব্রতকে একবারের জন্য বিবাহের অনুরোধ করলেন না। পিতা হিসাবে সেটাইতো তার করা উচিত ছিল। কিন্তু মহারাজের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন—তিনি তখন সত্যবতীকে বিবাহ করার জন্য উদগ্রীব—সত্যবতীর রূপ তাকে কামনায় বিবশ করে দিয়েছে কিন্তু একথাতো তিনি পুত্রকে স্পষ্টভাবে বলতে পারেন না। তাই যতটা পারলেন আকার ইঙ্গিতে নিজের বিবাহ কামনাকে ব্যক্ত করলেন। বুদ্ধিমান দেবব্রত'র পক্ষে পিতার মনভাব বোঝা অসম্ভব হল না। তিনিও চিন্তান্বিত হয়ে কক্ষ ত্যাগ করে আলোচনা করলেন কুরু রাজসভার বয়স্ক আমত্যদের সঙ্গে। কিন্তু কেউ কোন সদ্ উত্তর দিতে পারলেন না। শেষে কুমার নিরুপায় হয়ে অত্যন্ত গোপনে দেখা করলেন পরম হিতৈষী বৃদ্ধ সারথীর সঙ্গে। মহারাজ যে দিন শেষ শিকারে বেরিয়েছিলেন সেইদিন এই সারথি ছিল তার একান্ত সঙ্গী। একমাত্র সেছাড়া আর কেউ কোন কথাটি উত্তর দিতে পারবে না। যুবরাজ সারথির সঙ্গে নিভৃতে তার বাসায় গিয়ে দেখা করলেন। জানতে চাইলেন শেষ যেদিন মহারাজ শিকারে বেরিয়েছিলেন সেইদিন কিছু অপ্রাসঙ্গিক কোন ঘটনা ঘটেছিল কিনা। কি কারনে তার পিতার এই মানসিক উদ্‌বীঘ্নতা। পরিষ্কার প্রশ্ন—আপনি কি আমায় কিছু বলতে পারেন, কি কারনে আমার পিতা উদ্‌বীঘ্ন?

বৃদ্ধ সারথী বললেন—আমি তো এতদিন তোমার এই প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করেছিলাম কুমার। যদিও মহারাজের নির্দেশ আছে আমি যেন সমস্ত কথা গোপন রাখি, তবু আজ যে অবস্থায় আমরা এসে পৌঁছেছি, তাতে মনে হয় আমার আর কোন কথা গোপন রাখা উচিত হবে না। এতে মহারাজের আরও বেশী ক্ষতি হবে।

দেবব্রত উত্তেজিত হয়ে বললেন—আপনি নির্ভয়ে আমাকে সমস্ত কথা ব্যক্ত করুন। আমি কথা দিচ্ছি এই খবর আমি ভিন্ন দ্বিতীয় কারো কর্ণগোচর হবে না।

এবার সারথী সেদিনের কথা খুলে বললেন। বললেন, সত্যবতীর কথা। রাজা যে কৈবর্ত পল্লীতে গিয়েছিলেন সেই কথা, এমন কি বিবাহের শর্তের কথা।

বৃদ্ধ সারথীর মুখ থেকে সমস্ত ঘটনা অবগত হয়ে দেবব্রত বুঝতে পারলেন, পিতা কেন তাকে বারাবার একাধীক পুত্রের কথা বলেছেন। কেন তিনি কৈবর্ত দাসরাজের শর্তে রাজি হলেন না—সে কি কেবল তার কারণে? তবে কি তিনি হলেন পিতার দ্বিতীয়বার বিবাহের পথে একমাত্র অন্তরায়। অসম্ভব কিছুতেই তিনি পিতার সুখকর জীবনে অন্তরায় হতে পারেন না। পিতাকে অসুখী রাখা সন্তানের পক্ষে পাপ। সৎপুত্রের উচিত কাজ হল পিতাকে খুশী করা। তাই তিনি মনে মনে ঠিক করলেন নিজেই যাবেন কৈবর্ত দাসরাজের কাছে। কি শর্ত তিনি আরোপ করতে চান তাকে জানতে হবে। তার কারনে পিতা যে শর্ত রাজি হননি, তিনি নিজে অঙ্গীকারবন্ধ হয়ে কৈবর্তরাজকে খুশী করবেন। ওই নারীকে হস্তিনাপুবের রাজপ্রসাদে নিয়ে আনতে হবে—তিনি হবেন রাজমাতা। জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে বংশ পরম্পরা যে ধারাবাহিকতা আছে, তাকে তিনি নিজে স্বহস্তে লক্ষণ করবেন। সিংহাসনের কোন প্রয়োজন তার নেই। তার প্রয়োজন পিতাকে সুখী করা। কুরুবংশকে রক্ষা করা। অতএব সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন কুমার দেবব্রত।

পরের দিন ঊষালগ্নে রথ নিয়ে নিজেই বেরিয়ে পড়লেন কৈবর্ত পল্লীর উদ্দেশ্য। যমুনার তীর ধরে বনভূমি পার হয়ে একসময় তিনি এসে পৌঁছলেন কৈবর্ত পল্লীতে। রথ থেকে নেমে এলেন তেজদীপ্ত এক আদিত্য পুরুষ। রণ শয্যায় সজ্জিত তার বেশবাস। তিনি শান্ত পদক্ষেপে প্রবেশ করলেন কৈবর্ত পল্লীতে। তিনি প্রবেশ করা মাত্র কৈবর্ত পল্লী জুড়ে শোনা গেল কোলাহল, দেখা গেল চঞ্চলতা। শিহরণ লাগলো বাতাসে। বনভূমি কাঁপিয়ে ডেকে উঠলো পাখীর দল। কলকাকলীতে ভরে গেল সমস্ত বনানী। কুমার দেবব্রত এসে দাঁড়ালেন দাসরাজের সম্মুখে।

দাসরাজ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—আপনি কে কুমার? দেবব্রত উত্তর দিলেন—আমি গঙ্গাপুত্র দেবব্রত, মহারাজ শান্তনুর একমাত্র পুত্র। আমি আপনার কাছে আমার পিতার জন্য আপনার কন্যাকে ভিক্ষা করতে এসেছি। দাসরাজ স্তম্ভিত। পিতার বিবাহ কারণে পুত্রের অনুনয়। এ' এক আশ্চর্য্য ঘটনা। দাসরাজ জানতেন মহারাজ শান্তনু তার কন্যার

রূপে কাতর। হয়ত তিনি পুনবায় ফিরে আসবেন। কিন্তু পিতার বদলে স্বয়ং পুত্র এসে পিতার জন্য কন্যা ভিক্ষা করবে এতবড় বাস্তব চিন্তা তার মাথায় ছিল না। আসলে দাসরাজ কুমার দেবব্রতকে এই প্রথম দেখলেন। তার যৌবন দীপ্ত সুঠাম দেহ, রৌদ্রদীপ্ত দুটি চোখ দাসরাজকে বিহ্বল করেছিল। তাছাড়া কুমার নিজেও বিবাহ যোগ্য—এই বয়সে নিজেকে উপেক্ষা করে পিতার বিবাহেব জন্য কন্যা ভিক্ষা করতে আসা, একটু ব্যতিক্রম বই কি। তবু ঘটনা যা ঘটে—তা সত্য। পৃথিবীতে অসত্য বলে কিছু নেই। বিশেষ করে দাসরাজ জানেন তার আরোপিত শর্তেব উদ্দেশ্য কি। কুমার কি শর্তের কথা জানেন? বুদ্ধিমান দাসরাজ সমস্ত ঘটনা অনুধাবন করে অত্যন্ত মর্যাদাব সঙ্গে দেবব্রতকে আসন গ্রহণ করতে বললেন। দেবব্রত আসন গ্রহণ করলেন। দাসরাজ উপস্থিত সমস্ত কৈবর্ত পল্লী বাসীদের সামনে বললেন, কুমার, আপনি মহারাজ শান্তনুর একমাত্র পুত্র, এই বিশ্বচরাচরে আপনি হলেন এই মুহূর্তে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবীদ ও অস্ত্রবীদ। কুরুবংশের অবলম্বন. আপনার মতো পুত্র সচারাচর দৃষ্টিগোচব হয না। তাই বলতে বাধা নেই মহারাজ শান্তনুর মতো একজন বিরাট পুরুষেব সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ পেয়ে কেউ যদি সেটা গ্রহণ না করে, তাহলে শুধু আমি কেন স্বর্গের দেবতা ইন্দ্র'ও মনে মনে অনুতপ্ত হবেন।

দাসরাজের ধারণা ছিল কুমার দেবব্রত হয়ত শর্তের কথা জানেন না। তাই তিনি বললেন, আমি একজন হতভাগ্য পিতা, এমন একটা সুযোগ পেয়ে কেন তা হাতছাড়া করলাম, মনে হয় আপনার সেকথা সঠিক ভাবে জানা নেই।

দেবব্রত তাকালেন দাসরাজের দিকে। দুচোখে তার জ্বলন্ত দৃষ্টি। বললেন বলিষ্ঠ কণ্ঠে—আমি আপনার শর্তের কথা অবগত আছি দাসরাজ।

এবার বিস্ময়ের পালা দাসরাজের। বললেন—আপনি সমস্ত জানেন?

—হ্যাঁ। জানি বলেই আমি নিজে এসেছি। আমি যেখানে আমার পিতার অন্তরায়, সেখানে আপনার শর্ত পূরণের দায়ভাগ আমারই নেওয়া উচিত বলে মনে হয়।

এবার দাসরাজ সবিনয়ে বললেন, শুনুন কুমার, আমার এই শর্ত আরোপের পিছনে একটা কারণ আছে। অকারণে আমি এই শর্ত আরোপ করিনি। আমার এই কন্যা যদিও সকলের কাছে সে দাসকন্যা, কিন্তু আসলে সে আমার কন্যা নয়। আমি তার পালক পিতা, কন্যার আসল পিতা হলেন বসুরাজ। রাজকুলের মান রাজকুলেই রক্ষিত হয়। সত্যবতীর রূপে মোহিত হয়ে মহর্ষি অসিত আমার কাছে এসেছিলেন। আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি। আপনি বলুন কুমার রাজকন্যা বলে কথা, আমি তার পালক পিতা হয়ে একজন শুষ্করুক্ষ মুনির হাতে তাকে তো তুলে দিতে পারি না। এই প্রথম দাসরাজ সত্যবতীর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করলেন।

কুমার দেবব্রত বললেন, আমি আপনার কন্যাকে দেখিনি, তবে আমার পিতা যখন তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছেন তখন আমার কাছে কুলমানের বিচার করা উচিত নয়। আমি শুধু জানতে চাই আপনি কি কারনে আমার পিতাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন?

দাসরাজ অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তাই বললেন, প্রত্যাখ্যান তো তাকে করিনি, সে দুঃসাহস আমার নেই। অমি শুধু বলেছিলাম, এই পরিনয়ের ফলে আমার কন্যার গর্ভে যে সন্তান জন্মাবে তার যেন কোন শত্রু না থাকে। আপনি আজ মহাবীর, আপনার সমতুল্য যোদ্ধা এই মুহুর্তে মর্তে বিরল। অসুর ও গার্ন্ধরাও আপনার বিরুদ্ধাচরনে সাহস পায় না, এই আপনি যদি আমার কন্যার গর্ভজাত সন্তানের শত্রু হয়ে দাঁড়ান তাহলে তারতো বিপদ হবে অনিবার্য।

—আপনি কিসের বিপদ আশঙ্কা করছেন দাসরাজ? দাসরাজ বিনীত ভাবে বললেন—আমি আপনার পিতাকে বলেছিলাম আমার কন্যার গর্ভজাত সন্তান হবে হস্তিনাপুরের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। কিন্তু যুবরাজ আপনি থাকতে তাতো সম্ভব নয়। মহারাজ শান্তনুর সঙ্গে বিবাহের এই একটি মাত্র দোষই আমি দেখতে পাচ্ছি।

অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় কুমার দেবব্রত চতুর দাসরাজের বক্তব্য শুনলেন। তারপর সমাগত জনসমক্ষে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত কঠিন ভাষায় বললেন—"হে দাসরাজ, আপনি আপনার মনের বাসনার কথা নিঃসঙ্কোচে বলার জন্য আপনাকে সাধুবাদ জানাই। আমি নিজেকে

একজন ধর্মজ্ঞ ও সত্যবাদী বলে মনে করি। ধর্মকে সাক্ষী রেখেই আমি আমার প্রতিজ্ঞার কথা ঘোষণা করছি।'' এইবলে কুমার দেবব্রত ধীবর পল্লীতে উপস্থিত নর-নারীর উদ্দেশ্যে বললেন—''শুনে রাখুন আপনারা, এমন প্রতিজ্ঞা এর আগে কেউ কোনদিন করেনি—আমি দেবব্রত, ক্ষত্রিয় বংশজাত সন্তান। নি:সঙ্কোচে বলছি, মহামান্যা সত্যবতীর গর্ভে যে সন্তান জন্মাবে সেই সন্তান হবেন কুরুবংশের অধীশ্বর। ওই সিংহাসনে আমি কোনদিন আরোহন করবো না। আমার কর্তব্য হবে ন্যায় ও নিষ্ঠার সঙ্গে ভবিষ্যৎ কুরুবংশকে রক্ষা করা''। দাসরাজ বিস্মিত হয়ে বললেন—আপনি আর একবার চিন্তা করে দেখুন কুমার, আপনি কি প্রতিজ্ঞা করতে চলেছেন।

গঙ্গাপুত্র শান্ত কণ্ঠে বললেন—আমি সমস্ত জেনেই আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি দাসরাজ। গঙ্গাপুত্র দ্বিতীয়বার ভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অভ্যস্ত নয়। শুনে রাখুন দাসরাজ পিতা হিসাবে কন্যার প্রতি যেমন আপনার কিছু কর্তব্য আছে, তেমনি সুযোগ্য পুত্র হিসাবে আমারও পিতার প্রতি কিছু দায়বদ্ধতা আছে। পিতাকে সুখী করাই হল পুত্রের ধর্ম। আমি সেই ধর্ম বলেই অঙ্গীকার বদ্ধ হয়েছি।

এখানে কিন্তু দাসরাজের বুদ্ধির খেলা শেষ হল না। সত্যবতীর সন্তানকে নিষ্কণ্টক করার জন্য তিনি বললেন, এখনও আমার শর্তের শেষ হয় নি কুমার।

—আর কি শর্ত আছে বলুন?

দাসরাজ অত্যন্ত চটুল বুদ্ধি পরায়ন। তিনি মৎস্যরাজের আদেশ বা অনুরোধেই হোক অথবা নিজের বুদ্ধি বলেই হোক বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারটা ভালোই বুঝতেন। তাই বললেন, আমি জানি কুমার আপনি একজন নির্লোভ পুরুষ। রাজসিংহাসনের প্রতি আপনার কোন আসক্তি নেই, সত্যবতীর পুত্রই রাজা হবে। কিন্তু কুমার আপনি না হয় রাজসিংহাসনের ভোগ দাবী ত্যাগ করলেন, কিন্তু আপনার পুত্র যে আপনার কথা অনুযায়ী সমস্ত অধিকার ত্যাগ করবে এ'কথাকি আপনি জোর দিয়ে বলতে পারেন? এমনওতো হতে পারে তাদের কেউ একজন যদি পরবর্তীকালে এই সিংহাসনের দাবীদার হতে চায়। রাজ বিষয় অত্যন্ত জটিল, এইক্ষেত্রে কাউকে চট করে বিশ্বাস করা যায়

না। আপনার সন্তান যে আপনাব মতো নির্লোভ হবে এমনতো নাও হতে পাবে?

কৈবর্তরাজের কথার অর্থ বুঝতে পারলেন কুমার দেবব্রত। তিনি আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িযে সমবেত শ্রোতা মণ্ডলীব উদ্দেশ্যে বললেন, "শুনুন মহামান্য অতিথিগণ, আমি আমার পিতার জন্য আগেই প্রতিজ্ঞা করেছি রাজসিংহাসনের দাবীদার কোনদিন হব না। আমি রাজ্যাধিকার যেমন স্বইচ্ছায় পরিত্যাগ করেছি, তেমনি এখন আমি যে কথা বলছি আপনারা তা শ্রবন করুন। আমি গঙ্গাপুত্র প্রতিজ্ঞা করছি কুরুরাজ্যের শান্তি ও মঙ্গল কামনায় আমি কোনদিন বিবাহ করব না। আমি আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করবো। চিরকাল অপুত্রক অবস্থায় থাকলেও আমার ব্রহ্মচর্য সাধনাই আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে।"

আসলে সেকালের মানুষ যেমন মুখের কথাকে পরম অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেন, তেমনি ধর্মানুসারে মনে করতেন অপুত্রক ব্যক্তির কখনই স্বর্গলাভ হয় না। কিন্তু শাস্ত্রমতে ব্রহ্মচর্য পালন হল এক কঠোর সাধনা। ব্রহ্মচারীর সংযম সাধনাই তাকে স্বর্গ পথে নিয়ে যায়।

কুমার দেবব্রতর মুখে এমন প্রতিজ্ঞার কথা শুনে বিহ্বল হয়ে পড়লেন দাসরাজ, তিনি ঠিক এতটা আশা করেন নি। তিনি ভাবতে পারেনি তার মনের ইচ্ছেগুলো এইভাবে ফলবতি হবে। তাই তিনি জনসমক্ষে কুমার দেবব্রতকে আলিঙ্গন করে উচ্ছসিত ভাষায় বললেন— আপনি ধন্য কুমার। আপনার মতো পুত্র যে মহারাজের পাশে থাকেন তার হাতে আমি পরম নিশ্চিন্তে আমার কন্যাকে তুলে দিতে প্রস্তুত আছি। আমি আপনার সঙ্গেই আপনার পিতার নির্বাচিত বধুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সত্যবতী যেন প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তিনি সুসজ্জিতা হয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। বয়স অনুসারে সত্যবতী হয়ত কুমার দেবব্রত'র সমবয়সী অথবা কয়েকবছরের বড় হবেন। কুমার কিন্তু একবারের জন্য সত্যবতীর মুখের দিকে তাকালেন না। তিনি বিনম্র কণ্ঠে বললেন অধোমুখে দৃষ্টিপাত করে—আসুন জননী, আমি আপনাকে আপনার স্বমর্যাদায় রাজগৃহে পিতার নিকট নিয়ে যাই।

প্রথম দর্শনেই দেখা গেল কুমার সত্যবতীকে "মা" বলে সম্ভাষণ করলেন। প্রকাশ করলেন পরম শ্রদ্ধাপূর্ণ শিষ্ঠাচার।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি, মহাভারতের কাহিনীকার কিঁভাবে একটি উপকাহিনীকে সার্থক করলেন দেখুন। বশিষ্ঠ্যের অভিশাপে অষ্টবসুর ব্রহ্মচারী জীবন ছিল প্রাপ্য—সেই প্রাপ্য জীবন তিনি নিজেই স্বহস্তে গ্রহণ করলেন।

এখন প্রশ্ন কুমার দেবব্রত'কে দেখার পর এবং তার তেজদীপ্ত কথাবার্তা শোনার পর সত্যবতীর মনের মধ্যে কি কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি? আমরা সে কথা জানি না, জানার উপায় নেই কারণ মহাভারতের রচয়িতা সত্যবতীর মনের কোন অভিব্যক্তির কথা প্রকাশ করেন নি। হাজার হোক তিনি ব্যাসদেবের মা—মায়ের মানসিক ভাবনার কথা সন্তানের পক্ষে বর্ণনা করা কঠিন কাজ; তাই বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে প্রশ্নটি এড়িয়ে গেছেন মহাভারতের কাহিনীকার।

তবু মনে হয় সত্যবতী হয়ত কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলেন। তবে তিনি যে কোনভাবেই অনুতপ্ত ছিলেন, সেটা তার আচরণ ভঙ্গিমায় বোঝা যায় না। বরং রাজরানী হওয়ার যোগ্যতা যে তার আছে এটা যেন তিনি আগেভাগেই জানতেন। রাজবংশে জন্ম হয়ে ধীবর পল্লীতে পালিত হওয়ার কারণে তার মধ্যে দুঃখু ছিল, যন্ত্রনা ছিল—সেই দুঃখু আর যন্ত্রণা সেদিনের ঘটনায় সত্যবতীকে মনে মনে যেন স্বস্তি দান করেছিল। সত্যবতীর মনে যদি কোনরকম বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হত, তাহলে অবশ্যই তিনি কুমার দেবব্রতকে এই ধরনের প্রতিজ্ঞা করা থেকে বিরত থাকতে বলতেন। প্রতিবাদ করতেন পালিত পিতার এই প্রকার নীচ স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে। অথচ আমরা সত্যবতীকে একমুহূর্তের জন্য সেই সময় কাছে আসতে দেখিনি। তাহলে কি তিনি কিছুই জানতেন না? নিশ্চয় জানতেন—কারণ তিনি তখন ঘরেই ছিলেন। তাদের কথাবার্ত্তা সবই তিনি আড়াল থেকে শুনেছিলেন। যদি ধীবর পল্লীর সমস্ত মানুষজন জেনে থাকেন—তো সত্যবতী সেকথা জানতেন না তা কি হয়—এই সত্যকে মানা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাছাড়া নারীমাত্র কৌতুহল প্রবন। তার ভাগ্য ধারা কিভাবে বদল হয় তা জানার কৌতুহল নিশ্চয় তার মধ্যে ছিল। তিনি আড়াল থেকে তাদের মধ্যে

যে বাক্যালাপ হয়েছিল সবই শুনেছিলেন। কিন্তু কোন বক্তব্য পেশ করেন নি। এমনকি তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। শুধু সেই চরম মুহূর্তে নয়, যেদিন মহারাজ শান্তনু স্বয়ং এসেছিলেন তার অনুগামী হয়ে কৈবর্ত পল্লীতে সেদিনও আমরা দেখেছি সত্যবতীকে প্রতিক্রিয়াহীন নীরবতার মধ্যে। মহারাজ শান্তনু তাকে বিবাহ করতে চান—এটা নারী হিসাবে তার কাছে ছিল গর্বের বিষয়। অথচ তার হাবভাব ছিল এমন নিরাসক্ত যেন এই মহারাজের সঙ্গে তার বিবাহ না হলেও তার মনে কোন বেদনা সৃষ্ট হবে না। দাসরাজ যখন মহারাজের উপর শর্ত আরোপ করলেন, তখন সত্যবতীর কণ্ঠে কোন শব্দ উচ্চারিত হয়নি। তিনি যদি সত্যি মহারাজ শান্তনুকে প্রথম দর্শনে ভালোবাসতেন তাহলে তিনি স্বেচ্ছায় চলে যেতেন হস্তিনাপুরে। কারণ সেই যুগে নারীর সেই স্ব-অধিকার ছিল। অথচ সত্যবতী এসব কোন পথে না গিয়ে বাধ্য মেয়ের মতো মহারাজকে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন কৈবর্ত পল্লীতে, শুনিয়েছিলেন পিতার শর্ত, যে শর্তের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল তার ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠা। তবে কি দাসরাজকে অগ্রাহ্য করার অধিকার তার ছিল না। এমন কথা মনে হয় না, আসলে সত্যবতীতো জানতেন তিনি বসুরাজের কন্যা। দাসরাজের কাছে তাই তার কোন দায়বদ্ধতা ছিল না। কিন্তু পালিতপিতা হিসাবে দাসরাজ যে তার ভবিষ্যত গড়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায় দৃঢ় সংকল্প এটা তিনি বুঝেছিলেন। বিশেষ করে মহারাজ শান্তনুকে দাসরাজ যখন শর্তের কথা বললেন, তখনই সত্যবতী বুঝে গিয়েছিলেন, যা কিছু শর্তালোচনা হচ্ছে তা সবই তার ভবিষ্যতের অনুকুলে—কাজেই সেই কারনে তিনি এক্ষেত্রে কোন রকম স্ব-অধিকার প্রকাশের চেষ্টা করেন নি। তাছাড়া সত্যবতী নারী কিন্তু সাধারণ নারী তিনি ছিলেন না। তিনি ছিলেন সাধারণের অতিরিক্ত এক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নারী। তিনি শান্তনুর হৃদয় আকুতি অনুভব করেছিলেন। বুঝেছিলেন তার রূপে মহারাজ শান্তনু বিদ্ধ হয়েছেন। এই রূপ বিদ্ধতার কারণে তাকে তার কাছে আসতেই হবে। এই যে মনের মধ্যে সুগভীর আত্মপ্রত্যয় এটাই সত্যবতীকে সমস্ত ঘটনার মধ্যে স্বাভাবিক রেখেছিল। তিনি জানতেন মানুষের ভাগ্য তৃতীয় কোন এক মহাশক্তিমানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, মানুষ হাজার চেষ্টা করলেও আপন

ভাগ্যধারাকে পরিবর্তন করতে পারে না। ভাগ্য তার আপন নিয়তির পথ ধরেই চলে। তা না হলে তিনি নিজে একজন রাজকন্যা হওয়া সত্ত্বেও বসুরাজ তাকে নিজকন্যা বলে স্বীকৃতি দিলেন না কেন? তার জন্মের জন্য তিনিতো দায়ী ছিলেন না। তাকে পালিত হতে হয়েছে কৈবর্ত পল্লীতে দাসরাজের গৃহে। সেই দাসকন্যা আজ আবার ভাগ্যের আশীর্বাদে স্ব-মর্যাদা পেতে চলেছেন—অতএব তার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বরং ঘটনা প্রবাহে নিশ্চুপ থাকায় তার পালকপিতার পক্ষে সম্ভব হয়েছে তাকে স্ব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা। আত্মসচেতন সত্যবতী তাই মনে মনে যেমন পালক পিতাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন, তেমনি স্বাভাবিক আচরণ প্রকাশ করেছেন কুমার দেবব্রত'র প্রতি।

কুমার দেবব্রত তাকে—"মা" বলে সম্ভাষণ করায় সত্যবতী শিহরিত হলেও বিস্মিত হননি। তিনি কুমার দেবব্রত'র কথা মতো রথে গিয়ে বসেছেন। যাত্রা করেছেন ধীবর পল্লী থেকে হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে। এই যাত্রাকালে তার মনের মধ্যে বেদনার কোন স্পট চিহ্ন আমরা দেখতে পাই না। বরং তিনি যেন স্বমোহিমায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরে যথেষ্ট আত্মতৃপ্তি বোধ করেছেন। পালক পিতার জন্য অশ্রু বিসর্জন করলেও তার মধ্যে কোন বাড়াবাড়ি ছিল না।

রাজপুরীতে এসে সত্যবতীকে নিয়ে কুমার দেবব্রত সরাসরি প্রবেশ করলেন মহারাজ শান্তনুর কক্ষে। সত্যবতীকে দেখে মহারাজ শান্তনু বিস্মিত হলেন। এমন অসম্ভব সম্ভব হল কি করে? তবে কি সবই ভবিতব্য।

কুমার দেবব্রতকে মহারাজ প্রশ্ন করায়, কুমার সবিস্তারে সমস্ত বিবরণ দিলেন। আশ্চর্য্য! দেবব্রত'র ভাষণে মহারাজ শান্তনুর মধ্যে কোন বিরূপ মানসিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল না। তিনি একবারও বললেন না, কুমার তোমার এই কঠিন প্রতিজ্ঞা করা সমুচীত হইনি। আমিতো তোমাকে আগেই যুবরাজ নির্বাচন করেছি। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, বংশের প্রথম সন্তান—তুমি ভিন্ন কুরুবংশের সিংহাসনে বসার অধিকার অন্যকারো নেই। যদি তা সম্ভব হতো তাহলেতো আমি নিজেই সেদিন দাসরাজের শর্তে রাজি হতাম। কিন্তু আমরা কি দেখতে পেলাম—

মহারাজ শান্তনু সত্যবতীকে কাছে পেয়ে আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে পুত্রকে ভুরি ভুরি প্রশংসা করলেন। বাক্য সমাহারে শান্তনু বোঝাতে চাইলেন কুমার দেবব্রতকে, তার মতো পিতৃভক্ত সন্তান পৃথিবীতে বিরল। পিতার জন্য তার এই স্বার্থত্যাগ ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে। পরে আরো স্পষ্টভাবে বলেছেন, তুমি পিতার দুঃখ মোচনে যে পরম ও দুরহ আত্মত্যাগ করেছ তার জন্য তোমার অক্ষয় পরামায়ু বৃদ্ধি পাবে, মৃত্যু তোমাকে তোমার ইচ্ছা ভিন্ন স্পর্শ করতে পারবে না। মৃত্যু তোমার ইচ্ছাধীন। আজ থেকে তুমি ইচ্ছামৃত্যু প্রাপ্ত হলে—"নতে মৃত্যুঃ প্রভাবিতা যাবজ্জীবি তুমি চ্ছবি।"

অবাক হয়ে ভাবতে হয় মহারাজ শান্তনুর মনে পুত্রের জন্য এ-ভিন্ন আর কোন আশীর্বাদের কথা মনে এলো না দেখে। তিনি তাকে কেবল ইচ্ছামৃত্যুর বর দিলেন। এই বরতো তিনি বহু আগেই তাকে দিতে পারতেন। তিনি যখন দেবব্রত একটিমাত্র সন্তান বলে মনে মনে কোন অমঙ্গল আশঙ্কায় শঙ্কিত ছিলেন, তখনই তো তার এই বরদান করা উচিত ছিল। এতে তার কুরুকুল ধ্বংস হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকতো না, প্রয়োজন হত না সত্যবতীকে বিবাহ করার, বরং তিনি কুমার দেবব্রত'র বিবাহের ব্যবস্থা করতে পারতেন। কাজেই বোঝা যায় তিনি কুমার দেবব্রত'র কাছে যে আশঙ্কার কথা বলেছিলেন, সেটি ছিল সম্পূর্ণ ছলনা মাত্র। আসলে সত্যবতীকে বিবাহ করাই ছিল তার মনের সঠিক বাসনা। পিতা হয়ে নিজের বিবাহের কথা পুত্রের কাছে প্রকাশ করতে দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন বলেই তিনি সেদিন এই কপোটতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। আবার যদি ঘুরিয়ে বলা যায়, মহারাজ শান্তনু হয়ত নিজেই মানসিকভাবে চাইছিলেন না, গঙ্গাপুত্র দেবব্রত সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হোক। গঙ্গাকে একদিন অনার্য কুলশীলহীন কন্যা বলে যে রাজপুরীতে স্থান দেওয়া হয়নি, যে কারণে তার সাত-সাতটি সদ্যজাত পুত্রকে রাজপুরীর মধ্যে প্রশব কক্ষেই সুকৌশলে হত্যা করা হয়, সেই গঙ্গার অষ্টম পুত্র হয়ে দেবব্রত সিংহাসনে বসুন এটা যেন শান্তনুর সংস্কারে হয়ত বেধেছিল। অথচ তিনি তখন নিরুপায়। কারণ গঙ্গা তাকে পরিত্যাগ করার পর তিনি বিবাহ করেন নি এবং অন্য কোন রমনীতে মন দেননি। তিনি সরাক্ষণ রাজকার্য ও প্রজাকল্যাণ

নিয়ে ব্যস্তছিলেন। তাহলে কি বলতে হবে মহারাজ শান্তনু গঙ্গাকে সত্যি ভালোবেসেছিলেন? হয়ত ভালোবাসতে পারেন তবে সংস্কার মুক্ত যে ছিলেন না এটা বোঝা যায়। আসলে আর্যায়নের প্রথম পর্বে বংশ মর্যদা অত্যন্ত প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল। সেই কারনে অনার্য্য কন্যা গঙ্গাকে তিনি গ্রহণ করলেও মানসিকভাবে সংস্কার মুক্ত ছিলেন না। যদি তিনি সংস্কার মুক্ত মনের মানুষ হতেন তাহলে কুমার দেবব্রতকে নিয়ে তার ভাগ্যকে নিয়ে তিনি এতবড় একটা ছেলেখেলা করার সাহস পেতেন না। ধরে নিলাম, হয়ত তার ইচ্ছাছিল, কিন্তু রাজপরিবার বা সচীবদের মধ্যে কারো কারো হয়ত্ত আপত্তি থাকতে পাবে—তাবলে তিনি রাজা হয়ে সেই আপত্তি মেনে নেবেন, রিশেষ করে যে পুত্র, জ্ঞানে, যুদ্ধবিদ্যায় অপ্রতিদ্বন্দ্বি। আসলে তিনি নিজে যেমন ছিল সংস্কারচ্ছন্ন মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ তেমনি কামুক। এই দুইয়ের সংমিশ্রনেই তার মধ্যে সত্যবতীকে স্ত্রী হিসাবে পাওয়ার এতবেশী প্রত্যাশা ছিল। শান্তনুর মধ্যে যদি পুত্রের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা থাকত, তাহলে তিনি নিজে বিবাহ না করে, বিবাহযোগ্য পুত্রের বিবাহের জন্য পাত্রীর সন্ধান করতেন। এতে কুরুবংশ আরও বেশী দীর্ঘায়িত হতে পারত। কিন্তু ওই পথে শান্তনু হাঁটেন নি। তার মনের সঠিক ইচ্ছা কি ছিল সে কথাও পরিস্কার ভাবে খুলে বলেন নি মহাভারতের কাহিনীকার। তবে এটা পরিস্কার যে বসুরাজ পরিবারের জাতিকা সত্যবতীকে বিয়ে করে, তাকে স্ত্রী হিসাবে পেয়ে মহারাজ শান্তনু অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন। তবে তিনি আশা করতে পারেননি গঙ্গাপুত্র দেবব্রত নিজেকে বঞ্চিত করে এইভাবে তার কামনাকে চরিতার্থ করবেন।

দেবব্রত এতবড় ত্যাগ সত্যি অকল্পনীয়। প্রথমে সিংহাসনের দাবী প্রত্যাহার, তারপর আজীবন ব্রহ্মাচর্য পালন—কি সাংঘাতিক প্রতিজ্ঞা। যুবক বয়সে দেহের সমস্ত কামনা বাসনার অবলুপ্তি ঘটিয়ে বৈরাগ্যের সাধন পথ বেছে নেওয়া সহজ কথা নয়। পিতা হয়ে শান্তনু তাই পুত্রের কাছে মনে মনে কৃতজ্ঞ ছিলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে অবশ্য মহারাজ শান্তনুর কোন উপায় ছিল না। কারণ কুমার দেবব্রত যদি দাসরাজের শর্তে সম্মতি না হতেন, যদি তিনি ওই ভয়ানক প্রতিজ্ঞা না করতেম, তাহলে সত্যবতীকে পাওয়া মহারাজের পক্ষে কখনই সম্ভব

হতো না। মনের অদম্য ইচ্ছা মনের গভীরেই গোপন থেকে যেত। প্রজারা বাধ্য হত গঙ্গাপুত্র দেবব্রতকে সিংহাসনে বসাতে। দেবব্রত যে সমস্ত প্রজাদের কাছে ছিলেন অতীব প্রিয় এইসত্য মহারাজ শান্তনুর জানা ছিল। প্রজারা তাকে পেয়ে নিশ্চিন্ত, নিশ্চিন্ত কুরুকুল। যুদ্ধবিদ্যায় তার সমকক্ষ যোদ্ধা তখন কেউ ছিল না। কাজেই রাজ্যের নিরাপত্তার কারণে প্রজারা যে শেষপর্যন্ত কুমার দেবব্রতকে সিংহাসনে বসাতেন তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। কারণ তাকে যুবরাজ ঘোষণা কালে কেউ কোন প্রতিবাদ করেনি। বরং সারারাজ্য ঘিরে উৎসব পালিত হয়েছিল।

মহাভারতের কাহিনীকার অবশ্য কুমার দেবব্রত'র এই ভবিতব্য সম্পর্কে আগেই একটি গপ্পো ফেঁদে রেখেছিলেন। মহামুনি বশিষ্ঠ্যের অভিশাপে অষ্টাবসুর সর্বকনিষ্ঠ বসু 'দ্যু' আজীবন মনুষ্য লোকে আবাল্য ব্রহ্মচারী হয়ে বাস করবেন এটাই ছিল সিদ্ধান্ত, তার ভবিতব্য। সেই 'দ্যু' গঙ্গাপুত্র হয়ে পৃথিবীতে জন্মে কিভাবে বিবাহ করবেন? তাহলেতো বশিষ্ঠ্যের অভিশাপ বিফল হবে—তাতো হতে পারে না। অতএব ব্রাহ্মণের অভিশাপকে ফলবতী করার জন্য কুমার দেবব্রতকে যৌবন সুখ সম্ভোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল, ত্যাগ করতে হয়েছিল রাজসিংহাসনের নায্য অধিকার। এরজন্য আর যাই হোক আমরা রাজা শান্তনুকে দায়ী করতে পারি না। কারণ সবই ছিল কাহিনীকার অর্থাৎ বিধাতার বিধান।

হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে সত্যবতীর নিজস্ব ভূমিকা কি ছিল তা অবশ্য বোঝা যায় না। কারণ একথা সত্যি যে মহারাজ শান্তনুকে প্রথম দর্শন করে তিনি মন প্রাণ দেহ তাকে দান করেন নি। যদি করতেন তাহলে মহারাজ শান্তনুর প্রস্তাবে প্রথমেই তিনি রাজি হতেন। যদি তিনি অল্পবয়সে কুমারী অবস্থায় পরাশরের মতো এক জটাজুটোধারী মুনিকে নিঃসঙ্কোচে দেহদান করতে কুণ্ঠিত না হয়ে থাকেন, তাহলে যৌবনের প্রথম প্রকাশে তিনি শান্তনুর মতো একজন বীর শ্রেষ্ঠ রাজার প্রস্তাব গ্রহণ করতে কেন কুণ্ঠিত হয়েছিলেন? আসলে শান্তনুর প্রতি সত্যবতীর কোন প্রেম ছিল না। যদি প্রেম থাকতো তাহলে নিসন্দেহে মহারাজ শান্তনুর প্রস্তাব তিনি স্বইচ্ছায় গ্রহণ করতেন,

এরজন্য তাকে অনুমতির কারণে দাসরাজের সম্মুখে দাঁড়াতে হত না। একথা ঠিক সত্যবতী তার প্রকৃত বংশ পরিচয় জেনেছিলেন মহামুনি পরাশরের কাছ থেকে। মনের সমস্ত সংশয় দুরিভুত করে তিনি জেনেছিলেন বসুরাজ উপরিচর বসু হলেন তার প্রকৃত পিতা, মাতা হলেন অদ্রিকা নামে এক পতিতা অপ্সরা। হয়ত বসুরাজ তার মাতার কারণে তাকে ত্যাগ করে দাস রাজের হাতে তুলে দেন। অথবা এ'ও হতে পারে যেহেতু তিনি ছিলেন কন্যাসন্তান সেই কারণেই বসুরাজ তাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। আসলে এই সময়ে সমাজে কন্যা সন্তান ছিল ভোগ্য বস্তুর মতো অবহেলিত মাত্র। সে কারণেই হোক বসুরাজ কন্যাকে ত্যাগ করলেও কন্যাসন্তানের যথার্থ মর্যাদা সম্পর্কে দাসরাজাকে তিনি সচেতন করে দিয়েছিলেন। দাসরাজও সেই ভাবে কন্যা পালন করেছিলেন। এরপর পরাশরের সান্নিধ্যে এসে সত্যবতীর মধ্যে ব্রাহ্মনত্বের অহংকার জাগত্র হয়, গড়ে ওঠে আত্মমর্যাদাবোধ। তাই তিনি মহারাজ শান্তনুকে দেখে অথবা তিনি হস্তিনাপুরের রাজা শুনেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি। বরং নির্লিপ্তভাবে তিনি মহারাজ শান্তনুকে নিয়ে এসেছিলেন তার পালিত পিতা দাসরাজের কাছে। সত্যবতীর তুলনায় শান্তনু বরং বেশী কামার্ত হয়ে পড়েছিলেন। মহারাজ দীর্ঘদিন হলো সঙ্গীহীন। তার নিঃসঙ্গ অন্তরে বলা যায় সহসা অতর্কিতে প্রেমালোকে জ্বেলে দিয়েছিলেন বসুরাজকন্যা বাসবী। যিনি তখন আর মৎস্যগন্ধা ছিলেন না, হয়ে উঠেছিলেন যোজনগন্ধা। মহামুনি পরাশর তাকে শুধু দেহদান করে ব্যাসদেবের মতো পুত্রই দেন নি, দিয়েছিলেন নতুন চেতনা, অহংকার, নারীত্বের এক অভিনব মর্যাদা। সেই কারণে রাজরানী সত্যবতীর পাশে মহারাজ শান্তনুকে বড় বেশী আবেগ প্রবণ পৌঢ়, সহজ সরল, কামনা ঈপ্সিত এক ব্যাক্তিত্বহীন পুরুষ বলেই মনে হয়েছে। ফুটে উঠতে পারেনি মহারাজ শান্তনুর মধ্যে ব্যক্তিত্ব সমৃদ্ধ রাজকীয় কোন অভিব্যক্তি। বরং সত্যবতীর পাশে মহারাজ শান্তনুর ব্যক্তিত্ব প্রতিমুহুর্তে বাধা পেয়েছে। তিনি কোন ভাবেই পারেননি সত্যবতীকে অতিক্রমকে। আসলে সত্যবতীর দুরন্ত যৌবনের সামনে পরাভুত হয়েছেন মহারাজ শান্তনু। বয়সের দুস্তর ব্যবধান তাদের মধ্যে ·রী করেছিল ব্যক্তিত্বের দুরত্ব। এই ব্যবধানের মধ্যে দাঁড়িয়ে তারা

দুজনে যে পরস্পর পরস্পরকে সামনে ভাবে ভালোবাসবেন এটা আশা করাই ছিল অন্যায়। বরং সত্যবতীর ব্যক্তিত্বের পাশে, তার রূপ সমৃদ্ধ যৌবনের দুরন্ত আকর্ষণের সামনে পৌঢ় রাজা শান্তনুকে বড় অসহায় আর করুণ বলে মনে হয়েছে। তারজন্য আমাদের মায়া হয়. এর বেশী আর অন্যকোন.অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় না।

সত্যবতী যদি প্রথম দর্শনেই মহারাজ শান্তনুর প্রেমে পড়তেন, তাহলে তিনি তার প্রেম আহ্বানে আপ্লুত হয়ে ভেসে যেতেন। পিতা দাসরাজের সামনে তিনি মহারাজকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাতেন না। বরং নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তিনি পিতার কাছে যেতেন সৌজন্য মুলক মৌখিক অনুমতির জন্য। আশীর্বাদের জন্য। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সত্যবতী তা করেন নি। বরং মহারাজ শান্তনুর সমস্ত পরিচয় পাওয়ার পর নিজেকে সংযত রেখে আপনভাগ্য নির্ধারণের পথকে সুনির্দিষ্ট করাব জন্য তিনি শান্তনুকে পালকপিতার কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখানে তার মধ্যে কোন প্রেম ধরা পড়ে না বরং স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাস্তব সচেতন ভাবে নিজের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য সুনিশ্চিত ভাবে পথ চলাব বিন্যস্ত ভাবনা। দাসরাজা যখন শান্তনুর উদ্দেশ্যে কঠিন শর্ত আবোপ করলেন তখনও সত্যবতী ছিলেন নীরব, প্রতিক্রিয়াহীন। তিনি তার পালক পিতার শর্তের বিরুদ্ধে কোন বাক্যব্যয় করেন নি। এমনকি কুমার দেবব্রত যখন পিতার কারণে একের পর এক প্রতিজ্ঞা করতে লাগলেন তখনও সত্যবতী আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথা শোনা সত্বেও একবারের জন্য তাদের সামনে এসে দাঁড়ান নি। এমনকি পালক পিতাকে বলেননি, এ আপনার অন্যায় প্রত্যাশা পিতা। আপনি এই যুবকের প্রতি আমার কারণে অবিচার করছেন। বরং তার নীরবতা প্রমাণ করে তিনি ভাগ্য সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে যথেষ্ঠ আগ্রহী ছিলেন তার সেই কারণে তিনি পিতার শর্তের প্রতি মৌনতা অবলম্বন করে সমর্থন জানিয়েছেন।

আসলে উচ্চাকাঙ্খা নারী সত্যবতীকে দৃঢ় করেছিল। তিনি জানতেন তার নিজের পরিচয়। তিনি হলেন প্রকৃত পক্ষে বসু রাজকন্যা। তার ধমনীতে রাজরক্ত প্রবাহিত। তিনি নেহাতি দৈব কারণে পালিত হয়েছেন এই কৈবর্ত পল্লীতে। তিনি এই পল্লীতে মৎস্যগন্ধা বা কালী নামে পরিচিত হলেও তার আসল পরিচয় হলো তিনি বসুরাজকন্যা—বাসবী।

এই রাজ অহংকারের প্রভাবেই তিনি বুঝেছিলেন হস্তিনাপুরের এই পৌঢ় মহারাজের সহধর্মিনী হওয়ার যোগ্যতা তার আছে। তিনি নিরাপদ ছিলেন এই কারণেই যে কুমার দেবব্রত তার সন্তানদের বিরুদ্ধাচারণ করবেন না বলে কথা দিয়েছেন। এমনকি তার কোন পরম্পরার পক্ষেও এই সিংহাসনের দাবীদার হওয়ার কোন সম্ভবনা নেই। তার সন্তানদের পক্ষে হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসন নিষ্কণ্টক। তাই ভীষ্ম যখন প্রায় সমবয়সী হওয়া সত্বেও সত্যবতীকে জননী বলে কৈবর্ত পল্লীতে দাঁড়িয়ে সকলের সম্মুখে সম্ভাষণ করলেন, তখন তিনি মনে মনে অনেকটাই নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন। সেই চরম মুহূর্তে তার অন্তর আত্মঅহংকারে প্রজ্বোলিত হয়ে উঠেছিল। তার মনে হয়েছিল ভীষ্মের এই সম্ভাষণ তার উপযুক্ত পাওনা।

বিবাহের কয়েক বছরের মধ্যে সত্যবতী দুই সন্তানের জননী হলেন। চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। দুই পুত্র মহারাজ শান্তনুর ছত্রছায়ায় বড় হতে লাগলো। তাদের দুই ভাইকে অস্ত্রশিক্ষা দিলেন স্বয়ং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিসাবে ভীষ্ম। ভীষ্মের কাছ থেকে তারা আয়ত্ব করলেন অস্ত্রবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা। সেই সঙ্গে কৃপ তাদের দিলেন ধর্মজ্ঞান, অস্ত্রজ্ঞানবিদ্যা। কৃপ এবং ভীষ্মের তদারকিতে ক্রমশ দুই পুত্রকে যোগ্য হয়ে উঠতে দেখে মনে মনে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন সত্যবতী।

প্রথম দিকে সত্যবতী ভীষ্মকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন তার পুত্ররা ভীষ্মের পরামর্শ ছাড়াই স্বপথে চালিত হতে পারবে। কোন প্রয়োজন নেই তাদের ভীষ্মের সাহার্য গ্রহণ করার। হয়ত সেই কারণে তিনি পুত্রদের কোন সুষ্ঠ উপদেশ দেননি। একবারের জন্য উপদেশ দিয়ে বলার চেষ্টা করেন নি, বৎস তোমরা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভীষ্মের পরামর্শ গ্রহণ করে চলবে। আসলে সত্যবতী চেয়েছিলেন হস্তিনাপুরের জনমানসে ভীষ্মের যে প্রভাব আছে তাকে খণ্ডন করে তার সন্তানেরা প্রতিষ্ঠা পাক। এরজন্য তিনি ভীষ্মকে একপাশে সরিয়ে রেখে একান্তভাবে চেয়েছিলেন তার সন্তানেরা মহারাজ শান্তনুর হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু মহারাজ শান্তনু জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। বরং তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন ততোদিন তিনি নিজে প্রতিটি বিষয়ে ভীষ্মের

পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। আসলে মহারাজ তো জানতেন তিনি তার এই জ্যেষ্ঠ পুত্রটির প্রতি অবিচার করেছেন প্রজারা রাজার আচরণে মনে মনে ক্ষুব্ধ, এই অবস্থায় ভীষ্মকে উপেক্ষা করলে সারাদেশে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়বে। বরং ভীষ্মের প্রতি হস্তিনাপুরের মানুষজন অত্যন্ত আশাবাদী, তাবা জানেন ভীষ্ম থাকতে হস্তিনাপুরের কোন ক্ষতি হবে না। রাজ্যের সমস্ত মানুষের মন বুঝে মহারাজ শান্তনু তাই সর্বক্ষণ ভীষ্মকে ছায়ার মতো আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন। যখনই যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তখনই তিনি ভীষ্মের শরণাপন্ন হয়েছেন। মহারাজের এই হেন ভীষ্ম প্রীতি মন থেকে মেনে নিতে পারেননি সত্যবতী। মহারাজ শান্তনুকে হয়ত তিনি ভীষ্ম থেকে দুরত্ব বজায় বেখে চলার অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু রাজরানীর সেই অনুবোধ মহারাজ শান্তনু অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এড়িয়ে গেছেন। আসলে ভীষ্মের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার কারণে রাজা শান্তনু তাকে উপেক্ষা করতে পাবেন নি।

ভীষ্ম মনে হয় সত্যবতীর এই মানসিক ইচ্ছাকে কিছুটা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। সেইজন্য চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের আচরণ সম্পর্কে কোন দিন কোন প্রশ্ন তোলেন নি। মায়ের অপোত্ত স্নেহে জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্রাঙ্গদ অত্যন্ত জেদী ও একরোখা হয়ে উঠেছিলেন। অল্পবয়সেই তারা উভয়ে হয়ে পড়েছিলেন মদ্যপ ও ব্যভিচারি। ভীষ্ম শুধু দেখে গেছেন কোন আপত্তি তুলে প্রতিকার করার চেষ্টা করেন নি, কারণ তিনি জানতেন সত্যবতী মনে মনে তাকে সন্দেহ করেন। হায়রে অদৃষ্ট যার জন্য চুরি করা সেই বলে চোর। এই অবস্থার মধ্যে হঠাৎ মারা গেলেন মহারাজ শান্তনু। মাথা থেকে বিশাল একটা ছাদ যেন সরে গেল। মহাসমারহে ভীষ্ম পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে তড়িঘড়ি চিত্রাঙ্গদকে সিংহাসনে অভিসিক্ত করলেন। রাজপদে অভিসিক্ত চিত্রাঙ্গদকে রাজমাতা সত্যবতী কিন্তু একবারের জন্য কোন সদ্‌উপদেশ দিলেন না। বললেন না পুত্রকে ডেকে, পুত্র রাজকার্য পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তুমি রাজকার্য পরিচালনার সময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভীষ্মের পরামর্শ নিয়ে চলবে। বরং তিনি ভীষ্মকে উপেক্ষা করার মন্ত্রনাই দিয়েছিলেন, তা না হলে ভীষ্মকে অতিক্রম করে যাওয়ার এত সাহস

চিত্রাঙ্গদ পেলেন কি ভাবে? কে তাকে এই দুর্জয় সাহস যুগিয়েছিল? সত্যবতী জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হওয়ার পর ভীষ্মকে কোন ঠাসা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন তার পুত্র স্বমোহিমায় এবং স্বপ্রতাপে হস্তিনাপুরের সম্রাট হিসাবে চিহ্নিত হোক। তার মধ্যে যেন ভীষ্মের কোন ছায়া মা পড়ে। আর এই মানসিকতার জন্য তিনি চিত্রাঙ্গদে'-র প্রতিটি আচরণকে নীরবে সমর্থন করে গেছেন। আত্মঅহংকারী চিত্রাঙ্গদ মায়ের প্রশয় পেয়ে নিজেকে ভেবেছিলেন একজন পরম প্রতাপশালী অমিতবিক্রম যোদ্ধা। প্রয়োজনে তিনি ভীষ্মকেও শরযুদ্ধে পরাজিত করতে পারেন। চিত্রাঙ্গদে'-র এই আচরণের জন্য রাজ্যের আমত্যগণ মনে মনে অসতুষ্ট ছিলেন। তারা ভীষ্মকে চিত্রাঙ্গদের আত্ম অহংকারের কথা বলেছিলেন কিন্তু ভীষ্মের করার কিছু ছিল না। ভীষ্ম জানতেন মহারাজের এই পুত্রের রাশ ধরে রেখেছেন মাতা সত্যবতী। তিনি পুত্রস্নেহে বিবশ হয়ে আছেন। তাকে শতচেষ্টা করেও চিত্রাঙ্গদের বিরুদ্ধে কিছু বলে বোঝানো সম্ভব নয়। প্রথম দিকে মহামতি ভীষ্ম কুরুকুলের রক্ষক এবং অভিভাবক হিসাবে সত্যবতীর সঙ্গে চিত্রাঙ্গদের বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্ট করেছিলেন, কিন্তু রাজমাতা তার আলোচনাকে গ্রাহ্য করেননি। ফলে শেষদিকে ভীষ্ম গুটিয়ে নিয়েছিলেন নিজেকে। আসলে মহাভারতের কথক মুলকাহিনীতে এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত কিছু আলোচনা করেন নি। কিছু কথা থাকে যা বলা যায় না, লেখা চলে না। হাজার হোক সত্যবতী হলেন মহাভারত কাব্যের রচয়িতার মা—মায়ের বিষয়ে কোন সন্তানের ভুলত্রুটি জানা থাকা সত্বেও কঠিন সমালোচনা সম্ভব নয়। তাই হয়ত ব্যাসদেব এই প্রসঙ্গে নিশ্চুপ ছিলেন। তবু ঘটনা পরম্পরার মধ্যে দিয়ে চিত্রাঙ্গদের আচরণ এমন একটা পর্যায়ে উঠেছিল যা দেখে মনে মনে ভীত হয়ে পড়েছিলেন কুরুকুলরক্ষক ও অভিভাবক মহামতি ভীষ্ম। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন নিয়তি চিত্রাঙ্গদকে ভয়াবহ কোন ঘটনার দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। ভাবতে গিয়ে তিনি শিউরে উঠেছিলেন অথচ করনীয় কিছু ছিল না। হস্তিনাপুরের রাজনীতিতে ভীষ্ম সেদিন হয়ে পড়েছিলেন অবাঞ্ছিত। রাজমাতা সত্যবতী তো এটাই চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন তার পুত্রেরা ভীষ্মের সাহার্য ছাড়াই মাথা তুলে দাঁড়াক। কিন্তু সত্যবতীর এই মিথ্যে

প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ভীষ্মকে উপেক্ষা করার ফল সে সুখকর নয় সেটা বোঝা গেল কিছুদিনের মধ্যেই, অহংকারী চিত্রাঙ্গদ প্রতিবেশী বন্ধু রাজাদের সঙ্গে ক্রমশ সুসম্পর্ক নষ্ট করতে লাগলেন। ভুজ বলে বাড়াতে লাগলেন রাজ্যের সীমানা। রাজ্য সীমানা বেড়েছিল ঠিকই সেই সঙ্গে শত্রু বৃদ্ধি করে নিজের পরমায়ুকে সংক্ষীপ্ত করে ফেলেছিলেন। মানুষকে মানুষ বলে মনে না করা হল একধরনের অপরাধ। শুধু তাই নয়, তিনি দিনের পর দিন রাজ্যের বয়স্ক সচীব, এমন কি মহামান্য ভীষ্মকে পর্যন্ত প্রকাশ্যে অপমান করতে শুরু করলেন। এর ফলে প্রজারা আদৌ তার প্রতি সুখী ছিল না।

সত্যবতী থাকেন অন্তঃপুরে। তিনি রাজমাতা—তারপক্ষে রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা জানা সম্ভব ছিল না। তিনি শুধু উপলব্ধি করেছিলেন পুত্রের অহমিকা গরিমাকে। মনে মনে ভীষ্ম উপেক্ষিত হওয়ায় খুশী হয়েছিলেন। আসলে তিনিতো চেয়েছিলেন পুত্র গৌরব। যাতে তাকে কোনদিন কেউ না বলে পুত্র চিত্রাঙ্গদ ভীষ্মের সাহার্য নিয়ে শ্রেষ্ঠ হয়েছেন।

ঈশ্বর পৌরুষকে সাহার্য করেন কিন্তু অহংকারী দৌরাত্মকে ক্ষমা করেন না। যেহেতু নিজেকে চিত্রাঙ্গদ এক অপরাজেয় সম্রাট বলে মনে করতেন, মনে করতেন তার সমকক্ষ যোদ্ধা কেউ নেই, সেই কারণে এক ভ্রান্ত ধারনার বশবর্তী হয়ে ভীষ্মকে কিছু না জানিয়ে তিনি গর্ন্ধবরাজকে অকস্মাৎ আক্রমন করে বসলেন। সরস্বতী নদীর তীরে দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধল। তিনবৎসর কাল ধরে চললো এই ভয়ানক যুদ্ধ। অবিরাম অস্ত্রবর্ষণে সমগ্র অঞ্চল হয়ে উঠলো অগ্নিগর্ভ। মায়াবী গর্ন্ধবরাজ মায়া বলে শেষ পর্যন্ত হত্যা করলেন হস্তিনাপুর সম্রাট চিত্রাঙ্গদকে। একটি সম্ভবনাময় জীবন অতি স্বল্পপরিসরে কেবল মাত্র অপরিণত বুদ্ধির কারণে এবং অতিমাত্রায় আত্মঅহংকারী হওয়ায় অকালে চলে গেল।

সংবাদ পেয়ে শোকে ভেঙ্গে পড়লেন সত্যবতী। পুত্রের মৃত্যুর জন্য নিজেকে তার দায়ী বলে মনে হল। এই প্রথম হয়ত তিনি উপলব্ধি করেছিলেন মহামতি ভীষ্মকে বাদ দিয়ে চলতে গিয়ে তিনি ভুল

করেছেন। চিত্রাঙ্গদকে তিনি ভীষ্মের ছত্র ছায়ায় বেড়ে উঠতে দেননি। শোনার চেষ্টা করেন নি ভীষ্মের কোন অভিমত। তার মনের এই ধারনা সম্পূর্ণভাবে বদলে গেল চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর। তিনি বুঝতে পারলেন, রাজা হওয়ার পর তার জ্যেষ্ঠপুত্র ভরতবংশের শিষ্ঠাচার, গৌরব এবং সংস্কৃতি অনুযায়ী চলতে পারেনি। ভারতবংশের পারিবারিক শিক্ষা তার মধ্যে ছিল না। আসলে মহাভারতের কোথাও উল্লেখ নেই যে চিত্রাঙ্গদা ভীষ্মের সঙ্গে কোন আলোচনা করছেন অথবা কোন বিষয়ে মত গ্রহন করছেন। তিনি যে গর্ন্ধবদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন, তা নিয়েও তিনি ভীষ্মকে কোন কথা বলেন নি। এমনকি এই যুদ্ধে ভীষ্মকে তিনি কোন দায়িত্ব গ্রহণের কথাও বলেন নি। কিন্তু চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু নতুন করে ভাবিয়ে তুললো সত্যবতীকে। তিনি বুঝতে পারলেন নাবালক বিচিত্রবীর্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে তার সর্বাগ্রে প্রয়োজন ভীষ্মকে। আত্মঅহংকারে দর্পিত হয়ে যে উপদেশ তিনি চিত্রাঙ্গদকে দিতে পারেন নি, সেই উপদেশ তিনি দিলেন বিচিত্রবীর্যকে। নিজের ভুলকে যেমন শুদরে নেওয়ার চেষ্টা করলেন, তেমনি বদলে দিলেন নিজের ব্যবহারকে।

অমিততেজা চিত্রাঙ্গদ নিহত হলে ভীষ্ম তার প্রেতকার্য বিচিত্রবীর্যকে দিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করালেন। তারপর সত্যবতীর মত নিয়ে নাবালক বিচিত্রবীর্যকে বসালেন রাজসিংহাসনে। অভিষেক পর্ব সম্পন্ন হওয়ার পর রাজমাতা সত্যবতী পুত্রকে আর্শীবাদ করে বললেন—কোন বৎস, এই বিশাল ভরতবংশের তুমি হচ্ছ একমাত্র কুলপ্রদীপ। তুমি কখনই নিজ স্বমতে কোন কার্য কর না। কোন কিছু কাজ করার আগে তুমি তোমার জ্যেষ্ঠ মহামান্য ভীষ্মের পরামর্শ গ্রহণ করবে। তিনি তোমার রক্ষক এবং অভিভাবক। জানি না হঠাৎ রাজমাতার অন্তর কেন এত পরিবর্তন হল। আসলে সত্যবতী বুঝেছিলেন এই ভরতবংশ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারতো যদি গঙ্গাপুত্র সিংহাসনে বসতেন। মুলত তার কারণেই গঙ্গাপুত্র বঞ্চিত হয়েছিলেন তার নায্য অধিকার থেকে, এরজন্য তার মনে কোন ক্ষোভ ছিল না। তিনি রাজমাতা সত্যবতীকে সমবয়সি হওয়া সত্বেও জননী হিসাবে শুধু

মৌখিন সম্ভাষণ করেছেন তাই নয়, যথাযথ সম্মান প্রদর্শনও করেছেন। রাজামাতাকে তিনি কোনদিন অতিক্রম করে যাওয়ার চেষ্টা করেন নি। ফলে ভীষ্মের আচরণে নিজের ভুল বুঝতে পেরে সত্যবতী হয়ত মনে মনে আত্মদহিত হয়েছিলেন। চিত্রাঙ্গদে'-র মৃত্যুর পর বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে তাই তিনি আর কোনভাবেই ভুল রাস্তায় হাঁটার চেষ্টা করেন নি। বরং তার অগ্রজ পুত্র চিত্রাঙ্গদের মতো কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্য যাতে ভীষ্মকে অতিক্রম করে না যায়, তার জন্য তাকে বারবার তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন। কুমার বিচিত্রবীর্য একান্ত অনুগত হিসাবে মাতৃআদেশ শীরধার্য করে ভীষ্মকে যথার্থ মর্যাদা দিয়েছেন। তার সঙ্গে প্রতিটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। স্বমতে কখনই চলার চেষ্টা করেন নি। অপরদিকে আমরা দেখতে পাই ভীষ্মও প্রতিদিন রাজমাতার সঙ্গে দেখা করে বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে তার প্রতিটি আলোচনার যথার্থ ব্যাখা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ফলে ভীষ্মের প্রতি সত্যবতীর মনে এক প্রগাঢ় আস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। যে উদ্ধত মানসিকতা আমরা রাজমাতার মধ্যে প্রথম দেখেছিলাম, সেই উদ্ধত মানসিকতা ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়েছিল।

ভীষ্মের তত্ত্বাবধানে কুমার বিচিত্রবীর্য রাজ্য চালাতে লাগলেন। তার প্রতিটি পদক্ষেপ সেই কারণেই জনমন জয় করেছিল। আসলে পিছন থেকে রাজ্যের মুল হালটি ধরেছিলেন মহামতি ভীষ্ম।

ধীরে ধীরে বিচিত্রবীর্য প্রাপ্ত বয়সে প্রবেশ করলে সত্যবতী তার বিবাহের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেন। ভীষ্মও আপত্তি করলেন না। বংশ পরম্পরা রক্ষার আগ্রহে সত্যবতী যেন একটু বেশীমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি একদিন অন্দর মহলে ডেকে পাঠালেন ভীষ্মকে। ভীম উপস্থিত হতে দু'এক কথার পর সত্যবতী বললেন, আমার ধারণা কুমার বিচিত্রবীর্য পরিণত হয়েছে, তার বিবাহের বয়সও হয়েছে। অতএব আমরা কি তার বিবাহের ব্যবস্থা করতে পারি না?

ভীম সম্মতি জ্ঞাপন করে বললেন, আপনি অনুমতি দিলে আমি কুমারের বিবাহের জন্য চেষ্টা করতে পারি।

—তুমি তাই কর।

ভীষ্ম রাজমাতার সত্যবতীকে আশ্বস্ত করে বললেন, মা আপনি

নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি যত সত্বর সম্ভব বিচিত্রবীর্যের বিবাহের ব্যবস্থা করছি। সত্যবতী নিশ্চিন্ত ছিলেন ভিষ্মের উপর এই দায়ভার চাপিয়ে দিয়ে। আসলে এতদিনে ভীষ্মের প্রতি তার বিশ্বাসযোগ্যতা জন্মেছে। আগে তিনি ভীষ্ম সম্পর্কে যে ভীতি মনে মনে পোষণ করতেন, সেই ভীতি যে নেহাতি অবান্তর ছিল, এটা বোঝার পর নিজেই নিজের কাছে লজ্জিত হয়েছিলেন সত্যবতী। তিনি বুঝেছিলেন, যদি তিনি ভীষ্মকে বিশ্বাস করে প্রথম পুত্র চিত্রাঙ্গদকে তার স্নেহচ্ছায়ায় বর্ধিত হতে দিতেন তাহলে হয়ত চিত্রাঙ্গদকে অকালে মৃত্যু গ্রাস করতো না। কিন্তু তিনি ভীষ্মকে এড়িয়ে চলতে শিখিয়েছিলেন। মায়ের কথা অনুসারে চিত্রাঙ্গদের মনে হয়েছিল ভীষ্ম যেন ভরতবংশের একজন অবঞ্চিত ব্যক্তি। ভীষ্ম প্রথম দিকে চিত্রাঙ্গদকে আগলে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যখন বুঝলেন চিত্রাঙ্গদকে ঠেকানো তার পক্ষে সম্ভব নয়, নিয়তির অমোঘ টানে চিত্রাঙ্গদ ছুটে চলেছেন, তখন তিনি নিজেই দুরে সরে গিয়েছিলেন। সমস্ত ঘটনার জন্য যদি কাউকে দায়ী করা যায় তাহলে তিনি হলেন সত্যবতী। মাতা হয়ে সত্যবতী সন্তান চিত্রাঙ্গদকে শিখিয়েছিলেন, ভীষ্মকে উপেক্ষা করতে। যে ভুল তিনি চিত্রাঙ্গদের ক্ষেত্রে করেছিলেন, সেই ভুল তিনি বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে করতে রাজি ছিলেন না। ফলে বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে তাকে দেখাশুনা করার ভার তিনি অবলীলায় তুলে দিয়েছিলেন ভীষ্মের হাতে।

হস্তিনাপুরের শান্তির কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। ভীষ্ম চারদিকে লোক পাঠালেন বিচিত্রবীর্যের বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধানে। এমন সময় খবর এলো কশীরাজ তার তিনকন্যার বিবাহের জন্য স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেছেন। এই স্বয়ম্বর সভায় কাশীরাজ হস্তিনাপুরের সম্রাট বিচিত্রবীর্যকে আহ্বান করেননি। মনে হয় কাশীরাজ হস্তিনাপুরের সম্রাটকে নেহাতি নাবালক বলে মনে করেছিলেন। স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজাদের পাশে বিচিত্রবীর্য যে নেহাতি বয়সের দিক দিয়ে নাবালক ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তা বলে তাকে নিমন্ত্রণ করা হবে না, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও কাশীরাজের পক্ষে সমুচীত হয়নি। ভীষ্ম অত্যন্ত অসম্মানিত বলে ঘটনাটিকে মনে

করেছিলেন। কাশিরাজের তিনকন্যা অম্বা, অম্বালিকা ও অম্বিকার রূপ সৌন্দর্যের কথা সকলের জানা। এই পরমা সুন্দরীদের বিবাহ করার অভিলাষে ভারতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ রাজারা উপস্থিত হবেন। এই অবস্থায় অপমানিত ভীষ্ম অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন কাশীরাজের ওপর। তিনি মনে মনে ঠিক করলেন এই স্বয়ম্বর সভায় তিনি বিচিত্রবীর্যকে পাঠাবেন না। কারণ বিচিত্রবীর্য হস্তিনাপুরের সম্রাট এবং তিনি অনিমন্ত্রিত, অতএব সম্মান রক্ষায় তার উপস্থিত না থাকাই বাঞ্চনীয়। যা কিছু করার তাকেই করতে হবে। ভীষ্ম মনে মনে বুঝেছিলেন ব্যাপারটা সহজে নিস্পত্তি হবে না, প্রয়োজনে প্রচণ্ড যুদ্ধ হতে পারে। চিত্রাঙ্গদের অকাল মৃত্যুর পর তিনিও মনে মনে কিছুটা সন্দিহান ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তার মনে হয়েছিল বিচিত্রবীর্যের পরিণাম যদি চিত্রাঙ্গদের মতো হয় তাহলে ভরতবংশের অবলুপ্তি ঘটবে। এই চিন্তার কারণ হল, স্বয়ম্বর সভায় ভারতের শ্রেষ্ঠ যুদ্ধ প্রিয় রাজারা সকলেই বর্ত্তমান থাকবেন। এই সমস্ত রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হওযা বিচিত্রবীর্যের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই ভীষ্ম ঠিক করলেন এই স্বয়ম্বর সভায় তিনি নিজে উপস্থিত হবেন এবং কাশীরাজেব তিন কন্যাকে অপহরণ করে এনে তিনি তুলে দেবেন বীর শ্রেষ্ঠ বিচিত্রবীর্যকে। যদি এই অপহরণ কালে কোন বিপদ আসে তবে সেই বিপদ আসবে তার উপর, যা তিনি নিজেই সামাল দিতে পারবেন। অতএব নিজের চিন্তামতো বিষয়টি নিয়ে তিনি আলোচনা করলেন রাজমাতা সত্যবতীর সঙ্গে। কারণ দর্শিয়ে জানালেন কেন তিনি এই স্বয়ম্বর সভায় নিজে যেতে চান। ভীষ্মের বক্তব্য শুনে রাজমাতা সত্যবতী অত্যন্ত প্রীত হলেন। তিনি কোন আপত্তি করলেন না। কেন আপত্তি করবেন, তিনি তো জানতেন তার পুত্রদের মঙ্গলকামনায় ভীষ্মদেব অত্যন্ত তৎপর। কাশীরাজ্যের স্বয়ম্বর সভায় তিনি যেতে চাইছেন নিজের কারনে নয় মুল উদ্দেশ্য হলো বিচিত্রবীর্যকে বিবাহ দেওয়া। রাজমাতা সত্যবতী অনুমতি দিলেন। কারণ ভারতের মধ্যে তখনকারদিনে ভীষ্মই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। বিচিত্রবীর্য তার সন্তান হতে পারে কিন্তু সে ভীষ্মের মতন যুদ্ধবিদ্যায় এতপটু নয়। তাছাড়া ভীষ্ম তার পিতার আশীর্বাদে অক্ষয় পরমায়ু লাভ করেছেন। এই অবস্থায়

তারমতো একজন নির্লোভী ব্রহ্মচারী যে ভাবে কার্যোদ্ধার করতে পারবেন, সেইভাবে এত সহজে কার্যোদ্ধার করা বিচিত্রবীর্যের পক্ষে সম্ভব নয়। একজন নয় তিন তিনজন রাজকন্যাকে স্বয়ম্বর সভা থেকে তুলে আনতে হলে যে দক্ষতার প্রয়োজন, সেই দক্ষতা বিচিত্রবীর্যের মধ্যে ছিল না। সত্যবতী জানতেন তার প্রথমপুত্র চিত্রাঙ্গদ অবিবেচকের মতো যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে প্রাণ দিয়েছেন। অতএব তিনি আর সেই ভুল করতে না চেয়ে সমস্ত দায়িত্ব অকৃপণ ভাবে তুলে দিয়েছিলেন কুমার দেবব্রতের উপর। বিচিত্রবীর্যের জীবন নিরাপত্তার কারণে এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সত্যবতী ভীষ্মকে কাশীরাজ্যে যেতে অনুমতি দিয়েছিলেন।

ভীম একাই রথ সাজিয়ে নিয়ে বারাণসীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। ভীষ্মকে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হতে দেখে সকলেই অবাক হলেন। শঙ্কিত হয়ে পড়লেন কাশীরাজ। কিভাবে তিনি ভীষ্মকে সন্তুষ্ট করবেন ভেবে পেলেন না।

ভীষ্মদেব সভায় উপস্থিত হয়ে সমস্ত মহাপালের উদ্দেশ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে উদ্ধত কণ্ঠে বললেন কাশীরাজের উদ্দেশ্যে—কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করা হল প্রতিটি পিতার যথার্থ কর্তব্য। এই বিবাহকার্য সুসম্পন্ন করার জন্য কেউ কন্যাকে যথার্থ বস্ত্রালংকারে আচ্ছাদিত করে, ধনদান করে গুনবাণ পাত্রে সমর্পন করেন, কেউবা প্রতিজ্ঞাত ধনদান পুনঃসর কন্যা সম্প্রদান করে থাকেন, কেহ বলপূর্বক বিবাহ করে থাকেন, কেহ বা প্রনয় সম্ভাষণে রমনীর মনোরঞ্জন করে পাণী গ্রহণ করে থাকেন, কেউবা আবার কন্যার পিতামাতাকে প্রচুর ধনরত্ন দান করে কন্যাকে বিবাহ করে থাকেন। ধর্মশাস্ত্র অনুসারে পন্ডিতেরা এই অষ্টরীতি বিবাহ বিধি নির্দিষ্ট করেছেন। স্বয়ম্বর সভাও হল একটি অতিউচ্চ বিবাহ বিধি। প্রকৃত বলবান রাজারা স্বয়ম্বর বিবাহকেই অধিক প্রশংসা করে থাকেন। পরাক্রম প্রদর্শন পূর্বক অপহৃত কন্যার পানী গ্রহিতাকে ধর্মবাদীরা ভূষয়ী প্রশংসা করেছেন। আমিও স্বয়ম্বর বিবাহকে সমর্থন করি। আমি এই স্বয়ংবর সভা থেকে কাশীরাজের তিনকন্যাকে বলপূর্বক হরণ করে হস্তিনাপুরে নিয়ে যাচ্ছি।

যদি উপস্থিত মহিপালের মধ্যে কারো সাহস থাকে, তাহলে তিনি এখুনি অস্ত্র ধারণ করুন। আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছি। ভীষ্মের আস্ফালন শুনে কেউই এগিয়ে এলেন না। একরকম প্রায় বীনা যুদ্ধে ভীষ্ম কাশিরাজের তিনকন্যাকে রথে তুলে নিলেন। এই সময় কয়েকজন ভূপাল তারদিকে ধাবিত হলে ভীষ্ম তাদের উদ্দেশ্যে আলৌকিক বান প্রয়োগ করে তাদের পরাজিত করলেন।

উপস্থিত রাজাদের পরাজিত করে ভীষ্ম সভাস্থলে দাঁড়িয়ে বললেন, এত সহজে যে তিন রাজকন্যাকে করায়ত্ত করা সম্ভব হবে এমন ধারণা আমার ছিল না। বিদায় সম্মানীয় অতিথিগণ।

ভীষ্মদেব রথে তিনকন্যাকে তুলে দুরন্ত বেগে ছুটে চললেন হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে। কিছুদুর যাওয়ার পর তিনি শুনতে পেলেন পিছন থেকে ধাবমান রথের শব্দ। ভীষ্ম পিছু ফিরে তাকালেন। দেখতে পেলেন তার দিকে যে রথটি ধেয়ে আসছে, সেই রথে উপস্থিত আছেন সৌভপতি শাল্বরাজ। শাল্বরাজ তাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করা মাত্র ভীষ্ম তার রথ ঘুবিয়ে নিলেন। এরপব শুরু হলো মহারণ। শেষ পর্যন্ত ভীষ্মের অস্ত্র ও শর নিক্ষেপনে শাল্বের রথ ভেঙ্গে পড়লো। মৃত্যু হল তার অশ্ব ও সারথীর। ভূপতিত শাল্বদেবের উদ্দেশ্যে ভীষ্ম বললেন—শাল্বরাজ তুমি সত্যি একজন প্রকৃত বীর ও তেজস্বী পুরুষ। তোমাকে আমি বধ করবো না। অস্ত্রহীনকে হত্যা করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অপরাধ। তুমি মুক্ত। এইবলে ভীষ্ম কাশিরাজের তিন কন্যাকে নিয়ে হস্তিনাপুরের পথে যাত্রা করলেন।

হস্তিনাপুরে পৌঁছনো মাত্র চারদিকে ধুমধাম পড়ে গেল। খবর গেল অন্দরমহলে। রাজমাতা সত্যবতী বেরিয়ে এলেন। তিনি কাশীরাজ্যের তিন কন্যার রূপ দেখে হলেন বিমোহিত। ভীষ্ম বললেন—এই নিন মা, আপনার তিনপুত্র বধু। এদের বরণ করে ঘরে তুলুন।

সেই মুহুর্তে ভীষ্মের প্রতি মনে হয় মনে মনে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন সত্যবতী। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করে তো তার কোন উপায় নেই। এমন একটি দুরূহ কাজ যত সহজ ভাবে করলেন ভীষ্মদেব তার

বৈমাত্র কনিষ্ঠ ভাইয়ের জন্য, যা অন্য কারো পক্ষে করা এত সহজ হতো না।

কথাটা হয়ত সঠিক, এত বড় বড় যোদ্ধাদের সামনে থেকে তিন তিনটি রাজকন্যাকে হরণ করার মতো দুঃসাহস একমাত্র ভীষ্মই দেখাতে পারেন। তিনি তখন ভারতের মধ্যে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। অতএব তার পক্ষে যা সম্ভব হয়েছে, তা অন্য কারো পক্ষে চিন্তা করার সাহস পর্যন্ত নেই। কিন্তু এমন একটি দুঃসাহসিক কাজের জন্য রাজমাতা সত্যবতী অথবা বিচিত্রবীর্য তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকলেও নারীর চোখের জলের মুল্য তাকে দিতে হয়েছিল। এত তোড়াজোড় করে তিনি বিচিত্রবীর্যের জন্য বিবাহের যে ব্যবস্থা করলেন তা আদৌ সুখকর হল না। বরং, অম্বার অভিশাপে কলঙ্কিত হল ভীষ্মের মহান চরিত্র। ব্রহ্মচারী সত্যনিষ্ঠ ভীষ্মের জীবনে অম্বা দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দিলেন। নারী অবমাননার কৃতফল তাকে দুরারোগ্য ক্ষতের মতো আজীবন বহন করতে হয়েছে।

হায়রে! তখন কি তিনি জানতেন কাশীরাজের জ্যেষ্ঠকন্যা বিচিত্রবীর্যকে বিবাহ করতে অস্বীকার করবেন? যখন তিনকন্যা হস্তিনাপুরের রাজভবনে পৌঁছে জানতে পারলেন, ভীষ্ম নিজের কারণে তাদের হরণ করেন নি, তিনি তার বৈমাত্র কনিষ্ঠভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের জন্য এই দুঃসাহসিক কাজ করেছেন, তখন ভীষ্মের পৌরষকে তিরস্কারে দুরে ছুঁড়ে ফেলে প্রতিবাদী অম্বা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, আমার পক্ষে হস্তিনাপুর সম্রাট বিচিত্রবীর্যকে বিবাহ করা সম্ভব নয়।

সমস্ত আনন্দমুখরিত পরিবেশ মুহুর্তের জন্য থমকে গিয়েছে। আসলে অম্বা ছিলেন একজন প্রতিবাদী নারী। তার মনে প্রেম ছিল, আশা ছিল, স্বপ্ন ছিল। ভীষ্মের পৌরুষের দম্ভ তার সেই স্বপ্নময় প্রেম সত্তাকে চুর্ণবিচুর্ণ করেছে। ফলে একরাশ ক্রোধ আর ঘৃনা নিয়ে তিনি কঠিন হয়ে উঠেছিলেন। ভীষ্মকে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন নারী এত সহজ লভ্যা নয়। নারীকে জয় করতে হলে প্রেম ও পৌরুষ উভয়ের প্রয়োজন। যে পুরুষ নারীর মর্যাদাকে উপেক্ষা করে সে যেমন নির্বোধ তেমনি অত্যাচারী, পাপী। অম্বার কণ্ঠস্বর বিন্দুমাত্র কম্পিত হয়নি। বরং তিনি

দৃঢ়কণ্ঠে ভীষ্মকে কঠিন ভাবে আঘাত করেছেন। তার সোচ্চারিত প্রতিবাদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেন নি গঙ্গাপুত্র। বরং অপমানের যন্ত্রণা তিনি নীরবে সহ্য করেছেন। সেই মুহূর্তে অম্বার সামনে তাকে বড় নিঃসঙ্গ, একটি ভাগ্যহীন একজন পুরুষ বলে মনে হয়েছে। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ভীষ্মের ব্যক্তিত্বকে খণ্ড-খণ্ড করে অম্বা তার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী তুলে বললেন—আমি কোন অবস্থার মধ্যে ভীষ্ম ভিন্ন অন্য কোন পুরুষকে স্বামী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে রাজি নই। তারপর ভীষ্মের উদ্দেশ্যে বললেন—একমাত্র আপনাকে আমি স্বামী হিসাবে বরণ করতে প্রস্তুত। মনে রাখবেন গাঙ্গেয় আমি একজন রাজকন্যা, আমার মর্যাদা আছে। অমি সেই মর্যাদাকে আপনার কারণে লুণ্ঠিত হতে দিতে রাজি নই। আপনি আমাদের স্বয়ম্বর সভা থেকে আপন ভুজ বলের দম্ভে হরণ করে এনেছেন। আপনি ভিন্ন অন্য কেউ তাই শাস্ত্র মতে আমার পতি হতে পারে না। ভীষ্ম অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। অম্বা যে এইভাবে তার সামনে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতে পারে এই বিশ্বাস মনে হয় ভীষ্মের ছিল না। তাই তিনি কিছুটা অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে পড়ে বললেন, এ তোমার অন্যায় চাহিদা নারী।

প্রতিবাদী অম্বা বললেন —অন্যায় চাহিদা! এ' কেমন কথা বলছেন গাঙ্গেয়, আপনার অবাঞ্চিত পৌরুষ প্রকাশ যদি অন্যায় না হয়, তাহলে আমার এই চাহিদা অন্যায় হতে পারে না। কোন পুরুষ স্বয়ম্বর সভা থেকে নারীকে হরণ করে নিজের কারণে, অন্যের কারণে নয়। অন্যের কারণে নারী হরণ করা হল দুর্বৃত্তের কাজ। আপনি মহাজ্ঞানী, মহাযোদ্ধা হওয়া সত্বেও অত্যন্ত সচেতন ভাবেই এই অন্যায় কাজ করেছেন। কাজেই অপরাধ.যদি কেউ করে থাকে সেই অপরাধ করেছেন আপনি! আপনি যেহেতু প্রকাশ্যে নারীর মর্যাদাকে লুণ্ঠন করেছেন, সেই কারণে আপনাকেই আমাদের তিন ভগিনীর স্বামী হতে হবে।

ভীষ্ম পড়ে গেলেন মহাফাঁপড়ে। অম্বা অন্যায় কিছু বলেনি। ভীষ্ম আসলে ভাবতে পারেন নি কোন নারী তার ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে এমন ভাবে প্রতিবাদ করতে পারে। সেই মুহূর্তে অম্বার সামনে ভীষ্মকে অত্যন্ত করুণ অপরাধীর মতন দেখাচ্ছিল। কি বলবেন তিনি, তার তো

বলার মতো কোন যুক্তি নেই। অপরাধীর মতো তাই ম্লান কণ্ঠে ভীষ্ম বললেন—তুমি সঠিক কথাই বলেছ কন্যা। কিন্তু আমি নিরুপায়। পিতার কারণে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কাজেই আমি কোন অবস্থার মধ্যে তোমাকে বিবাহ করতে পারি না।

এবার আরও প্রচণ্ড বিক্ষোভ নিয়ে ফেটে পড়লেন অম্বা। বললেন—যদি আপনার পক্ষে বিবাহ করা সম্ভব না হয়, তাহলে স্বয়ম্বর সভা থেকে আপনি আমাদের হরণ করলেন কেন? হরণ করার আগে একবার আমাদের কাছে প্রশ্ন করলেন না কেন? কেন জানতে চাইলেন না আমাদের মনের গভীরে কোন স্বপ্ন আছে কিনা। তাছাড়া আপনার জানা উচিত ছিল স্বয়ম্বর সভা থেকে কন্যা হরণ বীরেরা নিজের কারণেই করে থাকেন, অন্যে কারণে কন্যা হরণ যে সমুচীন নয়, এটা কি আপনি জানতেন না? আপনি নিজে যখন বিবাহ করবেন না, তখন অকারণে আমার মনের প্রেমকে, স্বপ্নকে কেন নষ্ট করলেন?

—তুমি কার প্রতি আসক্তা কন্যা?

—এখন এই প্রশ্ন অবান্তর। তবু আপনি যখন অন্যায় করেছেন তখন আপনার জানা দরকার আমি শাল্বরাজকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছিলাম। আমার মনের এই ইচ্ছার কথা তিনি জানতেন। আমার পিতারও এই বিবাহে কোন আপত্তি ছিল না। আমার সুখ স্বপ্নের মুহূর্তে আপনার আবির্ভাব আমার সমস্ত স্বপ্নকে ভেঙ্গে দিয়েছে। আর আপনার কারণে যখন আমার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে, তখন আপনাকেই আমায় বিবাহ করতে হবে।

—একথা তুমি আমায় আগে বলনি কেন?

—আপনিতো আমায় সেই সুযোগ দেননি। এমনকি আপননি জানতে আগ্রহী হননি কেন এত রাজাদের মধ্যে একমাত্র শাল্বরাজ আপনার পশ্চাৎ অনুসরণ করেছিলেন?

অম্বার কথায় ভীষ্মদেব অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। বুঝতে পারলেন কাজটা তিনি অন্যায় এবং অশাস্ত্রীয় করেছেন। সেই কারণে তিনি সত্বর বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে কয়েকজন বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ সহযোগে অম্বাকে স্বমর্যাদায় শাল্বরাজের কাছে পাঠিয়েদিলেন।

কিন্তু শাল্বরাজ অম্বাকে গ্রহণ করলেন না। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, ভীষ্ম তোমায় বলপূর্বক করস্পর্শ করে সভাস্থল থেকে হরণ করেছেন, অতএব এখন তুমি ধর্মত তারই পত্নী হওয়ার উপযুক্ত, আমার নয়।

ব্রাহ্মনেরা ফিরে এলেন অম্বাকে নিয়ে। ভীষ্মদেব সমস্ত কথা শুনে বুঝলেন, এই বিপদ থেকে একমাত্র অম্বাই তাকে রক্ষা করতে পারে। তাই তিনি অম্বার কাছে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, অনুরোধ করলেন বিচিত্রবীর্যকে বিবাহ করার জন্য। কিন্তু অম্বা সেই অনুরোধ উপেক্ষা করে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ভাষায় ভীষ্মকে বাক্যবানে বিদ্ধস্ত করে বললেন, আপনি একজন শাস্ত্রজ্ঞ, ন্যায়নীতি সম্পন্ন ব্যক্তি। আপনি কি জানেন না, কোন নারীর কর স্পর্শ করলে তা বিবাহের সামিল হয়। তাছাড়া কোন রাজা যখন বলপূর্বক কোন রাজকন্যাকে স্বয়ম্বর সভা থেকে হরণ করে নিয়ে আসে, তখন সেই নারী একমাত্র তারই ভোগ্যা হয়—অন্যের নয়। পরের কারণে অর্থদান করা চলে, কিন্তু পরের কারনে নারী হরণ কোনভাবে সমর্থন যোগ্য নয়।

অপ্রতিভ ভীষ্মদেব বললেন—আমি বিবাহে অপারক। আমি আমার পিতার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কাজেই আমি তোমাকে বিবাহ করতে পারি না।

—বিবাহ যদি না করতে পারেন, তাহলে হরণ করলেন কেন, কেন আপনি হরণ কালে বললেন না, আপনি অন্যের কারণে আমাদের হরণ করতে এসেছেন। আপনি যদি একবার আপনার অভিলাষের কথা আমায় জানাতেন তাহলে আমি কখনই আপনাকে মেনে নিতাম না।

অপ্রস্তুত ভীষ্মদেব অম্বাকে অনেক বোঝালেন কিন্তু প্রতিবাদী অম্বা ভীষ্মের কোন কথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি বললেন, মহামান্য ভীষ্ম আপনাকে শতধীক, ধীক আপনার পিতাকে, ধীক্ আমার একান্ত প্রেমিক শাল্বরাজকে আর সর্বাগ্রে ধীক আমার ভাগ্যকে। তবে এদের মধ্যে আপনি হলেন আমার জীবনে দুর্দশার প্রধান কারণ। আপনার দম্ভকে চূর্ণ করার জন্য আমি রাজকুমারীর বস্ত্র পরিত্যাগ করে সাধিকার বেশে বন গমন করছি। আমার সাধনার দ্বারাই আমি আপনাকে

উপযুক্ত শিক্ষা দিতে চাই। আপনার পৌরুষের ধর্ম চাইতে আমার নারী-ধর্ম যে খুব খাটো নয়, এটাই আমি আপনাকে বোঝাতে চাই। এই বলে অম্বা সদর্পে হস্তিনাপুরের প্রসাদ ত্যাগ করলেন।

বিষন্ন হয়ে পড়লেন ভীষ্ম। সত্যিতো অন্যায় তিনি করেছেন। স্বয়ম্বর সভা থেকে কন্যা হরণ কালে তার আসল সত্যকে সকলের কাছে প্রকাশ করা উচিত ছিল। উচিত ছিল শাল্বরাজকে অনুসরণ কালে প্রশ্ন করা, কিসের অভিপ্রায়ে তিনি তার পশ্চাৎ অনুসরণ করছেন? তিনি তো এসব কিছুই করেন নি। আর স্বয়ম্বর সভা থেকে কন্যাহরণ করা সেই পুরুষের উচিত, যিনি তাকে নিজে গ্রহণ করবেন। অন্যের কারণে এই ধরণের নারীহরণ শাস্ত্র মতে অপরাধ, পাপ। তার মতো একজন বিবেচক মানুষের পক্ষে এতবড় একটা ভুল কাজ করা কি ভাবে সম্ভব হলো। তার মনে হল অম্বার প্রতিটি বক্তব্য অত্যন্ত সঠিক। নিরুপায় গঙ্গাপুত্র নারী নির্যাতনের যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে লাগলেন। কিন্তু তারতো কোন কিছু করার নেই। তিনি ভাবতে পারেন নি এইভাবে কোন নারী তাকে অপরাধী করতে পারে। এমন ভাবে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে পারে। আত্মঅহমিকার সমস্ত গরিমা ভীষ্মের চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে গেল। তিনি মনের মধ্যে অম্বার জন্য এক সুগভীর যন্ত্রণা অনুভব করলেন। তার জীবনের সেই কঠিন মুহূর্তে সত্যবতী কি তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন? মনে হয় না। আসলে ভীষ্মকে সান্ত্বনা দেবার মতো কোন ভাষা রাজমাতা সত্যবতীর ছিল না। বরং তিনি সমস্ত ঘটনার মধ্যে দাঁড়িয়ে বারবার অনুভব করেছিলেন এই বিশাল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন উদার মানুষটির ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য তিনি নিজে দায়ী। তারই কারণে গঙ্গাপুত্র সিংহাসনের অধিকার হারিয়েছেন। হারিয়েছেন বিবাহ করার অধিকার। আসলে সত্যবতীর পালিত পিতা দাসরাজ তার পালিতকন্যার ভাগ্যকে সুনিশ্চিত ও নিষ্কন্টক করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরিবর্তে কি পেলেন সত্যবতী? হায়রে মানুষের ললাট লিখন—তাকে খণ্ডন করার সাধ্য কার আছে? আর নেই বলেই সমস্ত সুখ স্বপ্নের কুসুমগুলি অকালে শুকিয়ে গিয়ে তাকে এক দুর্বিসহ ব্যর্থ জীবনের মধ্যে এনে দাঁড় করিয়েছে, যার জন্য তিনি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না।

মনে পড়ে সত্যবতী হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে এসে জীবন ভোগের এক সুখকর স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তার সেই স্বপ্ন তো ফলবতী হল না। পৌঢ় এক মহারাজকে বিবাহ করে তিনি সন্তান পেলেও সুখ উন্মাদনায় বিভোর হতে পারলেন না। যৌবন বর্তমান থাকা অবস্থায় তাকে গ্রহণ করতে হল বৈধব্য যন্ত্রণা। তবু রাজকন্যা বাসবী দুই পুত্র নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন। মনে প্রাণে চেয়েছিলেন তার এই দুই পুত্র গাঙ্গেয়কে অতিক্রম করে যাক। তারা প্রতিষ্ঠা পাক আপন দক্ষতায়। অদৃষ্টে তার সেই পুত্র গরিমাও ঘটলো না। বরং ভীষ্মকে অতিক্রম করে চলতে গিয়ে অকালে চলে গেল জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্রাঙ্গদ। তার মৃত্যুর কারণ হয়ত তিনি নিজে। আপন মোহাচ্ছন্নতায় তিনি চিত্রাঙ্গদকে শিখিয়েছিলেন ভীষ্মকে অগ্রাহ্য করতে, আর সেই অগ্রাহ্য করার কারণে তাকে অকালে চলে যেতে হল। ভাবতে গিয়ে বেদনাহত হৃদয় যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠেন। স্বামীশোক, পুত্রশোক তাকে ক্রমশ নিরাপত্তাহীন করে তুলেছিল, সেই কারণেই তিনি বড় বেশী করে যেন ভীষ্ম নির্ভর হয়ে পড়েছেন। আর ভীষ্ম'ও তাকে কর্মদক্ষতার মধ্যে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন তিনি তার একান্ত সেবক। তার কনিষ্ঠ পুত্র বিচিত্রবীর্য পারেনি আপন দক্ষতায় কাশীরাজের তিন স্নেহের দুলালীকে হরণ করে আনতে। সেখানেও বিচিত্রবীর্যের কারণে গাঙ্গেয়কে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল।

ভীষ্মকে যত দেখছেন ততো বিস্মিত হচ্ছেন সত্যবতী। আর যত তিনি ভীষ্মকে অনুধাবন করতে পাচ্ছেন, ততোবেশী কষ্ট অনুভব করছেন নিজের মধ্যে। গঙ্গাপুত্রের জীবনে যাবতীয় দুঃখু ও কষ্টের জন্য দায়ীতো তিনি নিজে। অথচ মানুষটা একবারের জন্য কোনদিন তার প্রতি কঠিন হতে পারেননি। বরং সত্যবতীর সমস্ত কঠিন অনুরোধকে তিনি সহজভাবে পালন করেছেন। রাজকার্যে মানুষটা অসাধারণ দায়িত্বজ্ঞান সচেতন। তার কোন পদক্ষেপের মধ্যে কোন আত্মঅহমিকা নেই। তিনি যেন এক মহাঋষি—নিঃস্বার্থ রাজসেবক মাত্র। সত্যবতী এটা পরিস্কার বুঝেছিলেন এই মানুষটার দ্বারা তার অথবা তার সন্তান বিচিত্রবীর্যের কোন ক্ষতি হতে পারে না। তার দাসপিতা আসলে মানুষ চিনতে ভুল

করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন ভীষ্মের দিক থেকে কোন বাধা আসতে পারে, তাই তিনি তাকে দিয়ে দুরন্ত কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন। সত্যবতী নিজেও ভাবতে পারেন নি, ভীষ্ম মানুষ হিসাবে এত মহৎ। তার মনে হয়েছিল তার দশজন পুরুষের মতো তার মধ্যেও লোভ আছে, কামনা আছে, বাসনা আছে, তাইতো সত্যবতী তার পালিত পিতার প্রতিজ্ঞা আরোপের সময় কোনরকম বিরুদ্ধাচরণ করেন নি। একাবারও পিতাকে এসে বলেন নি—এমন কাজ আপনি করবেন না দাসরাজ। ওকে দিয়ে অকারণে এমন দুরহ প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেবেন না। ওর'ও জীবন আছে, স্বপ্ন আছে। কই সেদিনতো তিনি নীরব সাক্ষী হিসাবে সমস্ত ঘটনাকে মেনে নিয়ে ছিলেন। কোথায় ছিল সেদিন তার মধ্যে ভীষ্মের জন্য নুন্যতম সহানুভুতি। বরং সেদিন তিনি নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। তার নিজের ভবিষ্যত সন্তানদের নিরাপত্তার কথা ভেবে একবারের জন্য তার মধ্যে ভীষ্মের প্রতি কোন অনুকম্পা তৈরী হইনি। অথচ আজ সত্যবতী ভীষ্মের পরামর্শ মতো চলতে চলতে বুঝে গেছেন, এই মানুষটি হচ্ছেন কুরুবংশের একমাত্র প্রকৃত রক্ষক। তিনি যতদিন আছেন, ততোদিন এই রাজ্যের কোন ক্ষতি হবে না! বিশাল এই যোদ্ধা যদি সেদিন তার পিতার দ্বারা শর্তে আবদ্ধ না হতেন, তাহলে অম্বার পক্ষে তাকে অভিশাপ দেওয়া সম্ভব হতো না। সত্যবতীর কেন জানিনা মনে হয় একমাত্র ভীষ্মের পক্ষেই সম্ভব হত এই কুরুবংশকে দীর্ঘায়িত করা এবং শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া। তার গর্ভজাত সন্তানেরা কেউই তার সমকক্ষ নয়। এই মহান পুরুষটির দুর্ভাগ্যের জন্য তাই নিজেকেই বারবার দায়ী বলে মনে হল সত্যবতীর।

বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে অম্বালিকা ও অম্বিকার বিবাহ কর্ম সুসম্পন্ন হওয়া সত্বেও ভীষ্ম কিন্তু মনের দিক দিয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারলেন না। রাজবাড়ির আনন্দ উৎসবের মধ্যে ভীষ্মের মন অম্বার কারণে উদ্বীগ্ন হয়ে পড়ে। বারবার তার মনে হয় সরল ওই প্রতিবাদী নারীর কথা। কি অসম্ভব তীব্রতা ছিল তার কণ্ঠস্বরে, কি ভয়ানক সেই কঠিন চাউনি। হৃদয়ের গোপন ক্ষতস্থান থেকে নিঃশব্দে স্খরিত হয় রক্তধারা। আনমনা হয়ে যান মহামতি ভীষ্ম।

এদিকে অম্বা আর নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন না। তিনি ঘুরতে ঘুরতে উপস্থিত হলেন পরশুরামের আশ্রমে। অম্বার মুখে সমস্ত বক্তব্য শুনে পরশুরামের প্রিয় সখা অকৃতব্রন অম্বাকে পরশুরামের কাছে নিয়ে গেলেন। অম্বার পরিচয় এবং তার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন ভীষ্মগুরু পরশুরাম। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, আমার শিষ্য হয়ে গাঙ্গেয় এত আত্মদাম্ভিক হয়ে উঠছে, এতো আমার জানা ছিল না। তারপর অম্বার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, হে কন্যা, তুমি অশ্রু সম্বরণ কর। আমি তোমাকে ভীষ্মের কাছে নিয়ে যাব। দেখি সে কেমন আমার অনুরোধ উপেক্ষা করে। আমি তার গুরু। আশাকরি সে আমার কথা অবশ্যই রাখবে। যদি সে আমার অনুরোধকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে আমি তাকে সমুলে ধ্বংস করবো।

এই বলে পরশুরাম অম্বাকে নিয়ে ভীষ্মের কাছে উপস্থিত হলেন, মহামতি ভীষ্ম আগেই গুপ্তচর মুখে গুরুর আগমন বার্তা শুনে প্রস্তুত হলেন। হাজার গোধন নিয়ে তিনি গুরুঅর্চনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ভীষ্মকে দেখে পরশুরাম বললেন, শোন বৎস্য, আজ আমি তোমার কাছে অকারণে আসেনি। আমার এখানে আগমনের প্রধান কারণ হল তুমি এক অবলা নারীর প্রতি অত্যন্ত হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়েছ। আমি তোমার কাছে এই আচরণ প্রত্যাশা করিনি।

ভীষ্মদেব গুরুর চরণ বন্দনা করে বললেন—হে গুরুদেব আমি কোন নারীর প্রতি হৃদয়হীন আচরণ করেছি বলে আমার মনে পড়ে না।

পরশুরাম এবার অম্বাকে দেখিয়ে বললেন—এই নারীকে কি তুমি চেনো?

—চিনি। এই কন্যাকে আমি আমার বৈমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের জন্য কাশীরাজ্য থেকে হরণ করে নিয়ে এসেছিলাম। এর অপর দুই ভগ্নী আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহে স্বীকৃত হওয়ায়, আমি তাদের বিবাহ দিয়েছি। পরশুরাম বললেন—স্বয়ম্বর সভা থেকে বলপূর্বক কোন কুমারী নারীকে হরণ করার মধ্যে পৌরুষ থাকলেও অন্যের কারণে এই কাজ যে আদৌ সমুচীন নয়, একথা কি তুমি জানতে না? তুমি যে অম্বাকে স্পর্শ করেছিলে এই কথাতো সত্য। আর

তোমারই কারণে তার বাগদত্তা শাল্বরাজ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, এ'কথাও তুমি অবগত আছ। অতএব আমার মনে হয় এমত অবস্থায় ধর্ম রক্ষার্থে তোমার উচিত কাজ হল অম্বাকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা। এই নারী হল ধর্মত তোমার পত্নী।

ভীষ্ম শান্ত কণ্ঠে বললেন—গুরুদেব, ওই রমনী মনে মনে শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করেছেন। শাল্বরাজ যদি তাকে প্রত্যাখ্যান করে থাকেন আমি তো তার জন্য দায়ী হতে পারি না। পরশুরাম উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, তুমিই এই নারীর ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। তোমার কারণেই শাল্বরাজ তাকে পরিত্যাগ করেছেন। এখন এই রমনীর ভাগ্য নির্ধারণের কর্তা হলে তুমি। কারণ তুমি তাকে স্বয়ম্বর সভা থেকে হরণ করে এনেছিলে। হরণকালে তুমি তোমার উদ্দেশ্যের কথা বলনি।

ভীষ্ম প্রবল আপত্তি প্রকাশ করে বললেন—আমি অপারক গুরুদেব আমি ব্রহ্মচারী।

ভীষ্মের এই উত্তর শুনে গুরু পরশুরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন শোন ভীষ্ম, তুমি যদি গঙ্গাপুত্র না হতে, যদি তুমি আমার শিষ্য না হতে, তাহলে এই মুহূর্তে আমি তোমার মতো একজন নারী হরণকারী পুরুষকে বধ করতাম।

ভীষ্ম বললেন, আপনি অযথা আমার প্রতি বিরূপ হচ্ছেন গুরুদেব। আমার পক্ষে যদি কোন উপায় থাকতো তাহলে ওই নারীকে আমি কোনভাবেই উপক্ষো করতাম না। কিন্তু আমি অপারক! আপনি আমার প্রতি বিরূপতা পরিত্যাগ করুন।

—বিরূপতা! আমি যে এতক্ষন তোমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি এটাই তোমার পরম সৌভাগ্য। আমি নির্দেশ করছি তুমি এই কন্যাকে বিবাহ কর। গুরু আদেশ মান্য করাই হলো শিষ্যের প্রকৃত ধর্ম।

—অসম্ভব গুরুদেব, তা হয় না।

পরশুরাম অত্যন্ত বিরক্ত প্রকাশ করে বললেন, তুমি যখন আমার কথা শুনবে না, তাহলে অস্ত্রধারণ করার জন্য প্রস্তুত হও। আমি যদি তোমাকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারি তাহলে এই কন্যাকে তোমার পত্নী রূপে গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় তোমার কোন পরিত্রাণ নেই।

ভীষ্ম সহজ কণ্ঠে বললেন গুরু পরশুরামের উদ্দেশ্যে—গুরুদেব আপনি যখন গুরুধর্ম রক্ষা করলেন না, ক্ষত্রিয়ের মতো যুদ্ধে আহ্বান করলেন, তখন আমিও প্রস্তুত আপনার সঙ্গে অস্ত্রযুদ্ধ করতে। কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গনে শুরু হল সেই মহারণ। সংবাদ পেয়ে গঙ্গাদেবী ছুটে এলেন। পুত্রকে বারবার নিরস্ত হতে বললেন। কিন্তু ভীষ্ম বললেন, মাগো তুমি আমায় ক্ষমা কর। তুমি তো জান তোমার পুত্র কখনও কোন অন্যায় কাজ করে না। আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন এবং ধর্মকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি। আমি জানি, আমি ন্যায়ের পথ ধরে যুদ্ধে যখন অবতীর্ণ হয়েছি, তখন জয় আমার সুনিশ্চিত।

তবু গঙ্গাদেবী অনেক বোঝালেন। বললেন, পরশুরাম তোমার গুরু। গুরুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা শোভন কাজ নয়।

ভীষ্ম বললেন—আমি তো গুরুর প্রতি শিষ্ঠাচার পালন করেছিলাম কিন্তু গুরু যদি আমার সত্য ও ধর্মকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজের মতকে জোর করে চাপিয়ে দিতে চান, তাহলে সেটা মান্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে মা গো, আপনি আমার বিষয়ে কোন চিন্তা করবেন না। আমি সর্ব্বদা সত্যের পথ ধরে চলতে অভ্যস্ত বলেই কোন অস্ত্র আমার অঙ্গ স্পর্শ করতে পারবে না। পিতার আশীর্বাদে জয় আমার হবেই। এইবলে ভীষ্মদেব মাতা গঙ্গাকে প্রণাম করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

তেইশ দিন ধরে চললো এই মহাযুদ্ধ। অসংখ্য ব্রাহ্মণ সেদিন এই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তারাই শেষে ভীষ্মকে বললেন, শোন ভীষ্ম, তুমি তোমার পূর্বজন্মের জ্ঞাত প্রাজাপত্য প্রস্বাপাস্ত্র শর স্মরণ কর, একমাত্র ওই অস্ত্রে দ্বারাই তুমি পরশুরামকে প্রসুপ্ত করতে পারবে। ওই বিদ্যা তাঁর জানা নেই। পরে তুমি সম্মোধনাস্ত্রের দ্বারা গুরুকে জাগরিত করো। এতে তোমার জয় সুনিশ্চিত হবে। এইবলে ব্রাহ্মণেরা অন্তর্হিত হলেন। চব্বিশ দিনের মাথায় যুদ্ধ খানিকক্ষণ চলার পর ভীষ্ম সেই প্রস্বাপাস্ত্র স্মরণ করলেন।

পরাজিত হলেন গুরু পরশুরাম। তিনি এই পরাজয়কে মেনে নিয়ে শিষ্য ভীষ্মকে বুকে টেনে নিয়ে সস্নেহে বললেন, তোমার কাছে আমার পরাজিত হওয়ার জন্য কোন লজ্জা নেই। সেই শিষ্যই হচ্ছে যথার্থ

শিষ্য যে তার গুরুকে অতিক্রম করে যায়। আমি স্বীকার করছি এই ত্রিলোকে তোমার মতো লোকমান্য বীরক্ষত্রিয় আর কেউ নেই। আমি তোমার যুদ্ধে সন্তুষ্ট হয়েছি। সত্যিই তুমি পিতৃভক্ত, সত্যের প্রতীক। তারপরে তিনি অম্বাকে উদ্দেশ্য করে ম্রিয়মান কণ্ঠে বললেন, হে কাশীবাজ দুহিতা, আমি ভীষ্মকে পরাজিত করতে পারিনি। তুমি ভীষ্মের স্মরণ নাও, একমাত্র সেই পারে তোমাকে রক্ষা করতে।

অম্বা আর ভীষ্মের কাছে কোন রকম প্রত্যাশা নিয়ে যেতে রাজি হলেন না। বরং আর মনের মধ্যে প্রতিহিংসার যন্ত্রণা তাকে অস্থির করে তুললো। বললেন, পরশুরামকে, আমি তপস্যায় চললাম, আপনি আশীর্বাদ করুন যেন আমি আমার তপস্যায় সিদ্ধ হতে পারি।

পরশুরাম বললেন—তোমার ইচ্ছা ফলবতী হোক।

এবার অম্বা কঠিন সাধনায় ব্রতী হলেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বর প্রদান করে বললেন, ভদ্রে তুমি পরজন্মে দ্রুপদরাজ্যের কন্যা রূপে জন্মে, পরে পুরুষত্ব লাভ করবে—আর সেই তুমি হবে ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ। এই অম্বাই হলেন পরজন্মে শিখণ্ডী।

কাশীরাজ্যের অপর দুই কন্যা হলেন বিচিত্রবীর্যের ঘরণী। তরুণ বয়সে পরমা সুন্দরী দুই নারীকে স্ত্রী হিসাবে পেয়ে বিচিত্রবীর্য প্রকৃত পক্ষে রাজ্যশাসনের কথা ভুলে গেলেন। সারাক্ষণ তিনি মজে থাকলেন দুই পত্নীর সঙ্গে রসবিহারে। পরমাসুন্দরী এই কামিনী যুগলের মধ্যে ছিল এক মন মদির করা সুতীব্র আকর্ষণ। সেই [illegible] নিতম্বিনীদ্বয়ের পয়োধরযুগল পীন, ক্ষীণ কোটি দেশ এবং [illegible] সকল ছিল রক্তবর্ণ। তাদের ঘন বিকুঞ্চিত শ্যামল কেশবাস বিচিত্রবীর্যকে যেন মানসিকভাবে বিবশ করে দিয়েছিল। সাত-সাতটা বছর কেবলমাত্র পত্নীদের সঙ্গে মোহ ঘোরে বিভোর হয়ে কাটালেন। তার এই হেন আচরণে মহাসমস্যায় পড়ে গেলেন ভীষ্মদেব। এমনটি যে ঘটবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। নিঃস্বার্থ রাজসেবক মানুষটি এসে রাজমাতা সত্যবতীকে বললেন সেই সমস্যার কথা। চিন্তায় পড়ে গেলেন সত্যবতী। কি করবেন তিনি। পুত্র যে তার কামমোহে এত মগ্ন হয়ে পড়বে এটা তার ধারণার মধ্যে ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন তাকে

ভীষ্মের পাশে থেকে দায়িত্ব সচেতন করে তুলতে। রাজপাটে যাতে মন বসে তার কারণেই তার এই দ্রুত বিবাহের উদ্যোগ ছিল। অথচ এখন বুঝতে পারলেন যদি তার কনিষ্ঠপুত্র এইভাবে সর্বোক্ষণ পত্নীসঙ্গে আত্মমগ্ন হয়ে থাকে তাহলে তার পক্ষে রাজ্য চালনাতো সম্ভব হবে না। তিনি ভীষ্মের কাছ থেকে সমস্ত কথা শুনে বিচিত্রবীর্যকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, পুত্র, একি শুনছি তুমি নাকি ঠিক মতো রাজ্যশাসন করছ না। ভীষ্মের উপর সব দায়িত্ব অপর্ণ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ। আমি তোমার কাছ এমন আচরণ প্রত্যাশা করিনি। উত্তরে বিচিত্রবীর্য বললেন,—মা, লোকমান্য ভীষ্মের মতো মানুষ থাকতে এই রাজ্যে কোন অকল্যান হবে না। তিনি বর্তমান থাকতে আমার রাজপাট নিয়ে ব্যস্ততা দেখাবার কোন প্রয়োজন নেই। আমি তার উপর রাজ্যের সমস্ত দায়িত্ব অর্পন করে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। আমি জানি তিনি বর্ত্তমান থাকতে আমাদের রাজ্যে কোন অসন্তোষ দেখা দেবে না।

সত্যবতী বললেন—মনে রেখ তবু তুমি রাজা, এই ভরতকুরু বংশের তুমি হলে পথপ্রদর্শক।

বিচিত্রবীর্য মায়ের কথা শুনে কিছুটা অবাক হয়ে বললেন, আপনিতো আমায় শিখিয়েছেন মহামতি ভীষ্মের প্রতি নির্ভরশীল হতে, তার প্রতি আস্থা বজায় রাখতে। আমি এতদিন ধরে তার আদেশ পালন করে এসেছি। তিনি আমায় যেভাবে চালিত করেছেন, সেই ভাবেই চালিত হয়েছি। তাহলে আজ কেন আপনি আমায় বলছেন নিজ দায়িত্বে রাজ্যশাসন করতে। সত্যবতী নিরুত্তর। কি জবাব দেবেন তিনি। সত্যি তো তিনি বিচিত্রবীর্যকে শিখিয়েছিলেন ভীষ্মের প্রতি নির্ভর হতে। কিন্তু তাবলে তার পুত্র যে এইভাবে সমস্ত দায়িত্ব ভীষ্মের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে দিন যাপন করবে, এটা তিনি আশা করনে নি। হাজার হোক তিনি হলেন রাজা। তিনি ভীষ্মের প্রতি নির্ভর হতে বলেছিলেন। তার মানে এইনয় যে সমস্ত দায়দায়িত্ব মহামতি ভীষ্মের উপর তাকে চাপিয়ে দিতে হবে। আসলে এটা ভীষ্মের প্রতি নির্ভরতা নাকি স্ত্রী সঙ্গের মদিরতা? সত্যবতী আর কথা বাড়ালেন না। কি বললেন তিনি।

শুধু বললেন, মনে রেখ তুমি হস্তিনাপুরের রাজা, ভীষ্ম নয়। তিনি তোমার অভিভাবক মাত্র।

পুত্র বিচিত্রবীর্য বললেন, এখানেই আমি নিশ্চিন্ত যে ভীষ্মের মতো একজন রাজনীতিজ্ঞকে আমি আমার অভিভাবক হিসাবে পেয়েছি।

সত্যবতী নীরব। পুত্রের উত্তর তার মন:পুত হয় নি। তবু করার কিছু তার ছিল না। জ্যেষ্ঠপুত্র ভীষ্মকে অবজ্ঞা করার কারণে অকালে চলে গেল বলেই তিনি কনিষ্ঠ পুত্রের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু তিনি মনে প্রাণে চাননি তার পুত্র বিচিত্রবীর্য এতটা ভীষ্ম নির্ভর হয়ে উঠুক। দায়িত্বশীল পদে থেকে দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়া একধরনের অপরাধ, পাপ। ভীষ্ম সম্পর্কে রাজমাতা সত্যবতী নিশ্চিন্ত। তিনি জানেন মানুষটা রাজধর্মে অত্যন্ত প্রজ্ঞ ও নিপুণ। নির্লোভ এই মানুষটির দিক দিয়ে কোন বিপদের সম্ভবনা নেই। তবু মনের মধ্যে কষ্ট অনুভব করেন রাজমাতা সত্যবতী। তার বারবার মনে হয় মহারাজ শান্তনুর প্রকৃত উত্তরাধিকারী হওয়া উচিত ছিল ওই মানুষটির। কি অসাধারণ দক্ষতায় তিনি তার কনিষ্ঠ পুত্রের সমস্ত অকর্মণ্যতাকে ঢেকে দিয়ে প্রজাকল্যানের সমস্ত গুরু দায়ভার বহন করে নিয়ে চলেছেন নি:শব্দে। একবারের জন্য তার মধ্যে কোন বিরক্তি বা কোন বিরূপতা অথবা কোন অভিযোগ তিনি প্রকাশ করেননি। বরং সমস্ত রাজ্য পরম নিশ্চিন্তে সুখে দিন যাপন করছে। প্রজাদের মনে কোন দুর্ভাবনা নেই।

দেখতে দেখতে সাত সাতটা বছর হয়ে গেল। এই সাতবছর ধরে দুই পরমা সুন্দরী পত্নীর সঙ্গে রতিমিলনে এবং অসংযমী মদাসক্ত হয়ে কালব্যয় করার ফলে অচিরেই বিচিত্রবীর্য ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হলেন। ধর্মাত্মা ভীষ্ম দেশের সমস্ত সেরা সেরা বৈদ্যদের আহ্বান করলেন। প্রাণপণ চেষ্টা করেও তার পক্ষে সম্ভব হল না কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা। আসলে নিয়তির অমোঘ লিখনকে খন্ডন করার সাধ্য কারো নেই। যার যা ভবিতব্য তাকে তা গ্রহণ করতেই হয়। মানুষ শতচেষ্টা করেও ভাগ্য লিখনকে অস্বীকার করতে পারে না। ফলে অত্যন্ত অল্পবয়সে লোকান্তরিত হলেন রাজা বিচিত্রবীর্য। অনেক চেষ্টা করেও ভীষ্ম তার আয়ুসীমাকে বর্ধিত করতে পারলেন না।

পুত্রশোকে ভেঙ্গে পড়লেন সত্যবতী। দুই পুত্রের মধ্যে কেউই তার আর অবশিষ্ঠ রইল না। এই জীবন কি তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন? একের পর এক ঘটনার মধ্যে দিয়ে তিনি উপলব্ধি করলেন, যা কিছু তার জীবনে ঘটেছে তার জন্য দায়ী হলেন তার পালকপিতা। অন্যায়ভাবে তিনি সেদিন কেবল সত্যবতীর কারণে ভীষ্মের প্রতি অবিচার করেছিলেন। এটা হল সেই অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক অবিচারের ফল। সেদিনের ওই প্রতিজ্ঞার মধ্যেই নিহিত ছিল ভরত-কুরুবংশের মুল পাপের বীজ। আর এই পাপের জন্য দায়ী তো সত্যবতীর পালক পিতা নয়—তিনি স্বয়ং। তারই কারণে, তার ভবিষত্যকে কন্টক মুক্ত করার অভিপ্রায় নিয়ে তার পালক পিতা ভীষ্মকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন। তার কারণেই তার স্বামীর প্রথমা মহিষী গঙ্গার পুত্র দেবব্রত শুধু যে রাজ্যাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তাই নয়, এমনকি বিবাহ না করে তিনি তার উত্তরাধিকার পর্যন্ত স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। এতবড় একটা অন্যায় ধর্ম সহ্য করবে কেন? আজ আর পালক পিতাকে অভিযুক্ত করে কোন লাভ নেই। আর অভিযোগ করবেন কি ভাবে, যা কিছু সেদিন ঘটেছিল সবই ঘটেছিল তার চোখের সামনে, তার মৌন সমর্থনে। তিনি যদি একবার মৃদ্যু স্বরেও আপত্তি তুলতেন তাহলে হযত তার পালক পিতা ভীষ্মকে দিয়ে এমন প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিতে পারতেন না। অথচ সেই ক্ষেত্রে সত্যবতী নীরব ছিলেন। বরং মনে মনে এক প্রচ্ছন্ন অহংকার তাকে গ্রাস করেছিল। রাজকন্যা রাজরানী হবে এটাতো কাম্য। তিনিতো রাজরানী থেকে কুরুবংশের রাজমাতাতে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু কি পেয়েছেন তিনি? যৌবনে ভীষ্মকে অসম্মান করতে গিয়ে তার দুই সন্তান প্রকৃত পক্ষে মানুষ হল না। উদ্ধত চিত্রাঙ্গ দকে তিনি বারবার শিখিয়েছিলেন আত্মচেষ্টায় বড় হতে। ভীষ্মকে অতিক্রম করতে, তার কারণেই চিত্রাঙ্গদের অকালমৃত্যু। আর বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে সেই ভুলের সংশোধন করতে গিয়ে তিনি তার দায়ভার চাপিয়ে দিয়েছিলেন মহামতি ভীষ্মের উপর। অতিমাত্রায় ভীষ্ম নির্ভরতা তাকে দায়িত্বজ্ঞানহীন কামুক আর অসংযমী করে তুলেছিল। অতিরিক্ত কামাবেশের কারণে অকালমৃত্যু তাকে গ্রাস করলো। ভাবতে

গিয়ে ব্যথায় বুক ভরে যায় সত্যবতীর। দু'দুটি সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও বিচিত্রবীর্যের কোন সন্তান হল না। সমস্ত কুরুবংশ কি তাহলে লোপ পেয়ে যাবে? মহারাজ শান্তনুর বংশধারা তবে কি স্তব্ধ হয়ে যাবে? মাথার মধ্যে এই একটি মাত্র চিন্তা ক্রমান্বয়ে অস্থির করে তোলে পুত্রহারা রাজমাতাকে। সদ্য বৈধব্য প্রাপ্ত দুই যৌবনবতী পুত্রবধুদের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারেন না। হাজার হোক তিনিও একজন নারী। নিজে একজন নারী হয়ে নারীমনকে যে সহজে উপলব্ধি করতে পারবেন এটাইতো স্বাভাবিক। অবিরত দুঃচিন্তার কালস্রোত তার অন্তরলোকে নিভৃতে প্রবাহিত হয়। যন্ত্রনায় কাতর হয়ে পড়েন সত্যবতী।

ভীষ্ম'ও ভাতৃশোকে কম কাতর হলেন না। তাকেও বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু গভীরভাবে আহত করেছিল। তিনি যে দম্ভ দেখিয়ে কাশীরাজের পরমা সুন্দরী তিনকন্যাকে স্বয়ম্বর সভা থেকে তুলে নিয়ে এসেছিলেন, সেই অমার্জনীয় অপরাধের মধ্যেই নিহিত ছিল তার নিজের আত্মগ্লানী। তবু বিচিত্রবীর্যের বিবাহ দিয়ে তিনি নিজের অধমচীত গভীর ক্ষতকে কোনরকমে আড়াল করে রেখেছিলেন। কিন্তু বিচিত্রবীর্যের আকস্মিক মৃত্যু তাকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। এই মৃত্যু যেমন আকস্মিক তেমনি কুরুবংশের কাছে মস্ত অভিশাপ হয়ে নেমে এসেছে। তিনি বুঝতে পারলেন অম্বার চোখের জল ব্যর্থ হয়নি। নারীর চোখের জলের মুল্য এই প্রথম ভীষ্ম মনে মনে উপলব্ধি করতে পারলেন। আসলে তিনিতো বিচিত্রবীর্যের ভালো করতে চেয়েছিলেন। সংসারে, রাজপাটে যাতে মনবসে, যাতে তার মধ্যে দায়িত্ববোধ জন্মায় তারই কারণে ভীষ্ম সেদিন ওই দুঃসাহসিক কাজ করেছিলেন। তখন কি তিনি জানতেন, কি গভীর এক অনৈতিক কাজ তিনি করতে চলেছেন। অম্বার কারণে ভীষ্মের মনের মধ্যে এক গভীর ক্ষত আছে। হাজার হোক তিনি মানুষ। অম্বার দুচোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি এখনও মাঝে মাঝে তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অন্যায় সে কিছু বলেনি। তার বক্তব্যের মধ্যে যুক্তি ছিল। কিন্তু ভীষ্ম নিরুপায়। অম্বাকে প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া তার কোন উপায় ছিল না। ফলে নীরবে তাকে সেদিন ওই নারীর সমস্ত অভিযোগ মাথা পেতে

নিতে হয়েছিল। তিনি যেন এই ঘটনার মধ্যেই দেখতে পেলেন তাব নিজের জীবনের এক দুরন্ত অভিশাপের স্পষ্ট ছবি।

সত্যবতী যে সত্যি একজন রাজকন্যা, তিনি যে রাজমহিষী হওয়ার একজন উপযুক্ত নারী এটা আমার স্পষ্টত অনুভব করেছি বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর। যদি তিনি সত্যি একজন সামান্যা নাবী হতেন তাহলে তিনি হস্তিনাপুরের ভবিষ্যত এবং কুরুবংশের অস্তিত্ব লোপের চিন্তা নিয়ে এত গভীরভাবে নিজেকে মগ্ন করে রাখতেন না। কি দরকার ছিল তার এত চিন্তার? তার না আছে স্বামী, না আছে দুই পুত্রের মধ্যে কেউ বর্ত্তমান। অতএব শূন্য হৃদয়ে ভাবনা তো নেহাতি অমুলক, অর্থহীন। বরং তিনিতো অনায়াসে পারতেন কুরুরাজ বংশের একজন বিধবা রাজমাতা সেজে আত্মভাবনায় দিন কাটাতে। কিন্তু প্রশ্ন অন্য জায়গায়। সত্যবতী ধীবর পিতার কাছে পালিত হলেও তিনি বসুরাজ কন্যা বাসবী। মহাঋষি পরাশরের স্পর্শে তার মধ্যে জেগেছিল স্বচ্ছ চেতনা। তিনি অস্থির হয়ে পড়েছিলেন তার বিবেকবোধের কারণে। তিনি অনুভব করেছিলেন যা কিছু ঘটেছে সবই হল ভবিতব্য। এই ভবিতব্যকে খণ্ডন করার সাধ্য সামান্য মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মূল পাপটা তিনি করেছেন—তার কারণেই আজ কুরুবংশের এই দুর্দশা। ভীষ্মের মতো একজন প্রজ্ঞ, যোদ্ধা, রাজনীতিজ্ঞ, উদার, নির্লোভ মানুষের প্রতি প্রকৃতপক্ষে অন্যায় করা হয়েছে। ভীষ্মকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে যে অন্যায় সেদিন করা হয়েছিল, সেই অন্যায়ের কোন ক্ষমা নেই। ক্ষমাহীন সেই অন্যায়ের শাস্তি তাই আজ তাকে পেতে হচ্ছে, সর্বস্ব হারিয়ে, নিঃস্ব হয়ে। একদিকে ভরত-কুরুবংশের লয়, আর একদিকে দাসরাজারও আর কোন বংশধারা বর্তমান রইল না। পালক পিতার প্রতি আজ আর কোন অভিযোগ করে লাভ নেই, আর সেই অভিযোগ অর্থহীন। একদিনতো তিনি তার পালক পিতার শর্তকে সমর্থন করেছিলেন। সেদিন তার এবং তার পালক পিতার সন্দেহের তীর ছিল কুমার দেবব্রত'র দিকে। তাকে বঞ্চিত করে সত্যবতীর গর্ভজাত সন্তানেরা যাতে যথার্থ ভাবে কুরুবংশের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে রাজা হতে পারেন তারই কারণে ধীবর রাজ নির্মম শর্তগুলি চাপিয়ে

দিয়েছিলেন। সত্যবতীর মনে তখন ছিল রাজরানী হওয়ার স্বপ্ন। মহারাজ শান্তনুকে তিনি যত না ভালোবাসতেন, তার চেয়ে বেশী ভালোবেসে ছিলেন রাজরানীর পদমর্যাদাকে। হাজার হোক তিনি বসুরাজকন্যা বাসবী। তার রক্তধারায় রাজরক্ত প্রবাহিত, কাজেই তার সন্তানদের অধিকার আছে রাজসিংহাসনে বসার। অন্তরের সেই সুপ্ত বাসনা ফলবতী হলেও, ললাট লিখন তাকে পূর্ণতা দিতে পারেনি। রাজরানী সত্যবতী পরাজিত হয়েছেন, তার আশা, স্বপ্নের মোহঘোর তাকে এক মহাশূন্যতায় এনে দাঁড় করিয়েছে। এখন তিনি রাজমাতা সত্যবতী। এখন আর তার মনের মধ্যে সেই আগের মতো কোন স্বপ্ন নেই। জীবনের সব সুখ স্বপ্ন হারিয়ে এখন তিনি মনের দিক দিয়ে জীবনের সত্যিকার রূপকে চিনতে শিখেছেন। ভাবতে গিয়ে এক ক্ষমাহীন অপরাধ বোধ তাকে কুণ্ঠিত করে তোলে। যে ভীষ্মকে তিনি রাজরানী হয়ে হস্তিনাপুরে আসার পর থেকে পরমশত্রু বলে মনে করেছিলেন, আজ ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে সেই ভীষ্মই হলেন তার রক্ষাকর্তা। আশ্চর্য্য! এই সর্বত্যাগী মানুষটি, একটি বারের জন্য তার মুখে কোন অপ্রসন্নতা ফুটে ওঠেনি। প্রকাশ করেন নি কোন অনুযোগ। বরং প্রথম দিন থেকে তিনি তাকে জননী বলে সম্ভাষণ করে এসেছেন। একান্ত অনুগত রাজসেবক হিসাবে সত্যবতীর প্রতিটি আদেশকে পালন করেছেন। ভীষ্মের প্রতি যে অন্যায় তিনি ও তার পিতা করেছেন, সেই অন্যায় ও অনৈতিক কারণের জন্য আজ তার জীবনে নেমে এসেছে এক শোচনীয় দুর্দশা। পুত্র হারানোর যন্ত্রণা থাকলেও এই বংশের জন্য তাকে তো কোন একটা সুব্যবস্থা করতে হবে। এখন তিনি রাজরানী বাসবী নয়, এখন তিনি রাজমাতা। মায়ের কর্তব্য অত্যন্ত কঠিন। এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে থেকে যে করেই হোক এই বিখ্যাত বংশধারাকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু কি ভাবে সম্ভব? একমাত্র সম্ভব হতে পারে যদি মহামতি ভীষ্ম এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু সত্যবতী তাকে যতদুর চিনেছেন, যতদুর তিনি ভীষ্মকে দেখেছেন তাতে তিনি জানতেন গঙ্গাপুত্রকে বিবাহে সম্মত করা সম্ভব হবে না। তিনি অত্যন্ত পিতৃভক্ত। তার প্রতিজ্ঞার মুল অত্যন্ত দৃঢ়। তবু সত্যবতী সবকিছু জেনে শুনে ঠিক করলেন ভীষ্মকে দিয়েই

এই বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। ভীষ্মকে বোঝাতে হবে এই মহানবংশকে রক্ষা করার দায়বদ্ধতা তারও আছে।

রাজামাতা সত্যবতী অনেক চিন্তাভাবনা করে ডেকে পাঠালেন ভীষ্মকে নিজের কক্ষে। রাজমাতার তলব পেয়ে ছুটে এলেন ভীষ্ম।

—কি ব্যাপার মা, আমাকে কি কারণে ডেকেছেন?

—বসো গাঙ্গেয়, তোমার সঙ্গে আমার কিছু পরামর্শ আছে। একটু একটু করে সত্যবতীর রূপান্তর বোঝা গেল। বোঝা গেল তিনি ধীবর পল্লীতে মানুষ হলেও তার ধমনীতে রাজরক্ত প্রবাহিত আছে। কত সহজ, কত সুন্দরভাবে সত্যবতী ভীষ্মের কাছে নিজের মনের কথাটি খুলে বললেন।

বললেন, শোন মহাভাগ, তুমি ভিন্ন এই মুহূর্তে আর কেউ পৃথিবীতে বর্তমান নেই, যে স্বর্গত মহারাজ শান্তনুর পিণ্ডদান করতে পারে। তোমার পিতার পিণ্ড, যশ এবং এই বংশের ধারা আজ সবই নির্ভর করছে তোমার উপর। আমি জানি তুমি একজন সত্যপরায়ন, ন্যায়নিষ্ঠ, ধর্মকৃত পুরুষ। ধর্ম তোমার মধ্যেই বিরাজ করছেন। তুমি বৃহস্পতি ও শুক্রের মতো মহাজ্ঞানী। তাই আমি তোমার উপর ভরসা রেখে এক মহাদায়িত্বের ভার দিতে চাই।

সত্যবতীর বক্তব্যের মধ্যে আবেগ ছিল কিন্তু ভনিতা ছিল না। তিনি কেবল ভীষ্ম সম্পর্কে এত কথা প্রয়োগ করলেন তার হৃদয়ের অর্ন্তস্থলকে স্পর্শ করার জন্য। তিনি জানতেন ভীষ্মের মধ্যে একটা সংবেদশীল মন আছে। এরপর সত্যবতী ধীরে ধীরে রাজামাতা হিসাবে কুটনীতি প্রয়োগ করলেন। বললেন, দেখ পুত্র এই মুহূর্তে আমার মন অত্যন্ত বেদনাকাতর। আমার দুই পুত্র চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য অকালে চলে গেল। তাদের জন্য আমার যতনা দুঃখু তার চাইতেও আমি অনুতপ্ত বোধ করছি একজন ভাগ্যহীন মাতা হিসাবে আমার দুই অল্পবয়স্কা যুবতী পুত্রবধুদের জন্য। তারা উভয়ে নিঃসন্তান। এতদিনের মধ্যেও তাদের দুজনের কারো গর্ভে একটি মাত্র সন্তান পর্যন্ত এলো না। মনের মধ্যে তাদের যে কি গভীর যন্ত্রণার প্রবাহ চলেছে তা তুমি পুরুষ হয়ে উপলব্ধি করতে না পারলেও, আমি পাচ্ছি। সন্তান কোলে থাকলে

রমনী বহুক্ষেত্রে স্বামী শোক থেকে উত্তীর্ণ হতে পারে। কিন্তু অপুত্রক কোন যৌবনা রমনীর নিঃসঙ্গ বৈধব্য জীবন যন্ত্রণা ভোগ করা অত্যন্ত কঠিন। তাছাড়া তোমাদের এই সুবিশাল রাজবংশ নিঃশব্দে বিলুপ্ত হয়ে যাক এটা কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারি না। তাই আমার অনুরোধ তুমি এই বংশধারাকে রক্ষা করার দায়িত্ব নাও। তুমি তোমার নিঃসন্তান ভাতৃবধুদের ধর্মানুসারে বিবাহ করে রাজ্যভার গ্রহণ কর।

ভীষ্ম তাকালেন। সত্যবতী বললেন, আর যদি তুমি বিবাহে অনিচ্ছুক হও, তাহলে আমি তোমায় অনুমতি দিচ্ছি তুমি নিয়োগ প্রথা অনুযায়ী আমার দুই পুত্রবধুকে পুত্রবতী কর।

কি করুন অনুনয়। রাজমাতা সত্যবতী নিজেও কোনদিন ভাবতে পারেন নি একদিন তাকে ভীষ্মের হাত ধরে এইভাবে কাতর অনুনয় করতে হবে। মনে পড়ে প্রথমদিন তিনি হস্তিনাপুরে এসেছিলেন ভীষ্মের সঙ্গে। ভীষ্মের তেজস্বীতা তাকে মুগ্ধ করলেও, তাঁর কঠিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সত্বেও ভীষ্ম সম্পর্কে নিরাপদ হতে পারেন নি সত্যবতী। বরং রাজরানী হওয়ার পর চেয়েছিলেন ভীষ্মকে অবজ্ঞায় অবাঞ্ছিতের মতো দুরে সরিয়ে রাখতে। আজ প্রতি পদক্ষেপে সেই অবাঞ্ছিত মানুষটিই হয়ে উঠেছেন সত্যবতীর জীবনের একান্ত আশ্রয়। হায়রে সত্যবতী কোথায় গেল তোমার সেই দর্পিত অহংকার। এই অহংকারের পাপকে আজ তুমি কি ভাবে খণ্ডন করবে? নিজের পাপবোধ আজ তাকে বারংবার বিদ্ধ করে। তার মনে হয় এই পাপ থেকে উত্তরণের জন্য তার কাছে আজ একটি মাত্র পথ খোলা অছে—সেই পথ হল মহামতি ভীষ্মকে তার প্রস্তাবে রাজি করানো। কিন্তু কাজটা যে সহজ হবে না এটাও তার মধ্যে আশঙ্কা ছিল। তিনিতো চোখের উপর দেখেছেন ভীষ্ম কিভাবে গুরু পরশুরামকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভীষ্ম যদি তিনি দুর্বল চিত্তের পুরুষ হতেন তাহলে সেইদিনই তিনি গুরু আদেশকে মান্য করে অম্বাকে বিবাহ করতে পারতেন, তাতে কোন দোষের হতো না। কারণ গুরু হলেন শ্রেষ্ঠ আদেশকারী। অথচ ভীষ্ম তার সত্যরক্ষার জন্য গুরুকে অমান্য করে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। তবু এত কিছু জানা সত্বেও সত্যবতী সরাসরি তার কাছেই বংশরক্ষার কারণে অনুরোধ

করলেন। এই অনুরোধ একাবারে অমুলক ছিল না। তার এই অনুরোধ করাই ছিল স্বাভাবিক। আগেই বলেছি রাজমাতা হওয়ার পর সত্যবতীর মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন এসেছিল। তিনি রাজনীতির কুটচালে যেন ভীষ্মকে একবার নতুন করে ঝালিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। ভীষ্মকে তার অনুরোধ করার প্রয়োজন ছিল কেবল মাত্র নিজের চরিত্রের আর একটা অধ্যায়কে তুলে ধরার জন্য। ঘটনা বিন্যাসের কারণে এখানে যে এক মহাকবির আবির্ভাবের প্রয়োজন আছে। তিনি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ না করলেতো মহাভারতের কথা অমৃত সমান হয়ে ওঠে না। রক্ষা পায় না কুরুবংশ। এই বংশকে যেকরেই হোক রক্ষার ভার যে সত্যবতীর কোন গর্ভজাত সন্তানকে নিতে হবে। ভীষ্ম তার গর্ভজাত সন্তান নয়, সেই সন্তান হলেন লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা এক মহামুনি—তিনি হলেন ব্যাসদেব। ব্যাস হলেন তার যৌবনের ক্ষণসুখের একটি রোমাঞ্চিত ফসল। অতএব তার আগমনের রাস্তাটা যাতে পরিস্কার হয় তারই জন্য সত্যবতী অনেক ভাবনা চিন্তা করে ভীষ্মকে এমন একটি অযৌক্তিক প্রস্তাব দিয়েছিলেন, এই কথা বললে মনে হয় খুব একটা মিথ্যে বলা হবে না।

আসলে স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে তার পুত্রদের মৃত্যু পর্যন্ত ভীষ্মের সান্নিধ্য তাকে রাজনীতিতে যথেষ্ঠ পটু করে তুলেছিল। সর্বোপরি তিনি ছিলেন বসুরাজকন্যা বাসবী, তার ধমনীতে যে রাজরক্ত প্রবাহিত—সেটি অন্তত এই ঘটনা থেকে কিছুটা আন্দাজ করতে পারা যায়। তানাহলে সব জেনে শুনে তিনি ভীষ্মকে নিয়োগ প্রথায় সন্তান উৎপাদনের কথা বলতেন না। তিনি জানতেন ভীষ্ম এই প্রস্তাব মেনে নেবেন না। আসলে ভীষ্ম যেহেতু এই রাজকুলের অভিভাবক, সেই কারণে তিনি তার সম্মুখে আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে এই প্রস্তাব দিয়ে, প্রস্তাবটিকে অনুমোদন করে নেওয়া। হলোও তাই সত্যবতীর বক্তব্য শোনার পর ভীষ্ম বললেন—মা আপনি আমায় এতক্ষণ অনেক অনুরোধ করলেন। কিন্তু আপনিতো জানেন কোন ধর্মানুসারে আমি সন্তান উৎপাদনে অক্ষম। আপনার বিবাহের সময় আমি আপনার পিতা দাসরাজের কাছে অঙ্গীকার করে যে কথা বলেছিলাম, আশাকরি নিশ্চয় তা আপনার স্মরণে আছে।

সত্যবতী জেনে শুনে বোকা সেজে বললেন—তা আছে, কিন্তু সে তো শুধু মৌখিক অঙ্গীকার মাত্র। কিন্তু ভেবে দেখ যদি, তোমার সহায়তায় ভরত-কুরুবংশে রক্ষা পায়, ধর্ম রক্ষা পায় এবং সমস্ত আত্মীয় সজন এবং প্রজাকুল যদি আনন্দিত হয়, তাহলেও কি তুমি তার কোন মুল্য দেবে না, ওই তুচ্ছ অঙ্গীকার তোমার কাছে এত বড়, এত সত্য।

ভীষ্ম সহজ কণ্ঠে বললেন—আপনি যাকে তুচ্ছ বলছেন সেটাই হল আমার কাছে মহাধর্ম। ধর্ম ও সত্য উভয়ই আমার কাছে সম মূল্যবান। যদি ধর্মের কথা বলেন, তাহলে বলবো আমি অগ্রজ ভ্রাতা হিসাবে কনিষ্ঠ ভাতৃবধুদের পত্নী রূপে গ্রহণ করতে পারি না। এই কাজ শাস্ত্র বিরুদ্ধ। শাস্ত্র মতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে ভার্যা হিসাবে গ্রহণ করতে পারে, এই ক্ষেত্রে কোন ধর্মীয় বাধা থাকে না। আর সত্যের কাছে আমি অঙ্গীকার বদ্ধ। আমি সত্যের জন্য ইন্দ্রত্ব পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারি, পারি পৃথিবীর যে কোন ঈপ্সিত বস্তুকে ত্যাগ করতে—তবু সত্যকে নয়। স্বয়ং ধর্মরাজ যদি সত্যকে পরিত্যাগ করেন, তবুও আমি কোন অবস্থায় সত্যকে পরিত্যাগ করতে পারবো না।

সত্যবতী ভীষ্মের উত্তরে অন্তরে খুশী হলেও মুখে কোন রকম অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন না। বরং মহামুনি ব্যাসের আগমনকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে ভীষ্মকে সহানুভূতি মাখা কণ্ঠে বললেন—আমি জানি তুমি সত্যকে কোন অবস্থায় পরিত্যাগ করতে পারবে না। তবু পিতার বংশ যাতে রক্ষা পায়, ধর্মের উচ্ছেদ যাতে না হয়, তার জন্যেতো তোমাকে এইবংশের জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে কিছু ভাবনা চিন্তার দায়িত্ব নিতে হবে। দেখ পুত্র, জীবনের ঘটনাবলী পূর্ব নির্দ্ধারিত বলেই আমরা মানুষজন আগাম কিছু জানতে পারি না; ফলে জীবনের ইচ্ছাগুলো প্রায় প্রতিমুহূর্তে বাস্তবের চাপে পড়ে জটিলতার সৃষ্টি করে। আমার প্রশ্ন মহারাজের জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে তোমার কি কোন দায়বদ্ধতা নেই? এতবড় একটা সমস্যা কি জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে তোমাকে স্পর্শ করেনি? তুমি কি চাও তোমাদের বংশ লুপ্ত হয়ে যাক। সত্যবতীর চতুর বাক্যজালে জড়িয়ে গিয়ে ভীষ্ম অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করলেন। তার আত্মমর্যাদায় যেন আঘাত করেছিল কথাগুলো। সত্যবতীতো

আঘাত করতেই চেয়েছিলেন, আঘাত না করলে এই সত্যনিষ্ঠ মানুষটি সহজে মুখ খুলবেন না। ভীম বললেন—সত্য রক্ষার্থে আমি নিজে অপারক হলেও দায়িত্ব এবং কর্তব্য উভয়ই আমাব আপনাব মতন সক্রিয় আছে। আমার স্বর্গত পিতার পুত্রগণ যাতে এই পৃথিবীতে অক্ষয় থাকেন, আমি অবশ্যই সেই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্‌গ্রীব। নিয়োগ প্রথার ক্ষেত্রে সর্বত্র যা হয়ে থাকে, আমি অবশ্যই সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পরামর্শ দিই। আমাদের সনাতন হিন্দুমতে, এমনকি বেদেও প্রমাণ আছে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপন্ন হলে সেই পুত্র পানীগ্রহীতাবই পুত্র বলে সমাজে ধর্ম মতে বিবেচিত হয়। আপনি আপদ্ধর্ম্মকুশল প্রজ্ঞ পুরোহিতদের সঙ্গে আলোচনা করে এই ব্যাপাবে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। আর যদি এত আলোচনার মধ্যে যেতে না চান তাহলে একজন রূপবান, গুণবান সদাচারী ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করে বিচিত্রবীর্যেব পত্নীদের গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মের ব্যবস্থা করুন। এতে যদি সেই ব্রাহ্মণকে উপযুক্ত অর্থ দক্ষিণা দিতে হয় তাতেও কারো কোন আপত্তির কারণ থাকবে বলে আমি মনে করি না।

মহামতি ভীষ্মের এই কথা থেকেই বোঝা গেল মহাভারতের যুগে নিযোগ প্রথায় সন্তান উৎপাদন করা এবং এই কারণে অর্থব্যয় করার মধ্যে কোন রকম বাধা ছিল না। তবে ভীষ্ম সত্যভঙ্গ করতে রাজি নন বরং প্রয়োজনে তিনি কোন রূপবান, গুণবান ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করার পক্ষপাতি এবং এই কারণে রাজকোষের অর্থ ব্যয় করতেও তার কোন বাধা নেই। আসলে মনে হয় ভীষ্ম নিজের সত্য পালনের উদ্দেশ্যে সাত তাড়াতাড়ি একটি ধর্মীয় উপায় জ্যেষ্ঠভ্রাতা হিসাবে সত্যবতীকে বাতলে দিলেন।

সত্যবতী মনে মনে এই কথাটাই শুনতে চাইছিলেন ভীষ্মের মুখ থেকে। তিনি জানতেন ভীষ্ম অসম্মত হবেন তা সত্বেও তিনি ভীষ্মের দিকে দায়িত্বের তীর ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। তবে এত তাড়াতাড়ি যে ভীষ্ম এমন একটা উত্তর দিয়ে তাকে প্রীত করবেন এটা ভাবতে পারেননি সত্যবতী। তবে সত্যবতীর ইচ্ছে ছিল ভীষ্ম স্বয়ং এই দায়িত্ব গ্রহণ করলে ভরত-কুরু বংশের মঙ্গল হবে। আগামী দিনে বংশবিস্তার নিয়ে

কোন উদ্বেগ থাকবে না। বরং এতে তিনিও অনেকখানি পাপবোধ থেকে নিস্কৃতি পাবেন। তবে ভীষ্ম যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ না করেন তখন তার কুমারী অবস্থায় গর্ভজাত সন্তানকে ডেকে এই দায়িত্ব দিতে হবে। অবশ্য এরজন্য অভিভাবক ভীষ্মের অনুমতির প্রয়োজন। ভীষ্ম আত্ম সত্য রক্ষার্থে সেই পথেই হাঁটলেন। যদি নিয়োগ প্রথায় ব্রাহ্মণ ডেকে এই কাজ করাতে হয় তাহলে আত্মগর্ভজাত ব্যাসদেবই হলেন সেই উপযুক্ত পুরুষ। কিন্তু এতবড় একটা বিষয় তিনি ভীষ্মকে বলবেন কি করে। এখানে সত্যবতী কিন্তু, কোনরকম চতুরতার আশ্রয় নিলেন না। সত্যের কাছে সত্যকে অস্বীকার করা অন্যায়, পাপ। ভীষ্ম তার কাছে সত্যস্বরূপ, ধর্ম স্বরূপ। এই কুরুবংশের তিনি হলেন একমাত্র জীবন্ত কুল প্রদীপ। তিনি হলেন মহারাজ শান্তনুর বংশের প্রকৃত রক্ষাকর্তা। সমগ্র প্রজাকুল তার অনুগত। প্রজ্ঞ, বিচক্ষণ, ধর্মজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ মানুষটিকে আবার নতুন করে অবমাননা করে তিনি আর কোন পাপ বাড়াবার চেষ্টা করলেন না। বরং তার কাছে অকপটে নিজের গোপন পাপের কথা বলে তিনি যেন কিছুটা স্বস্তি পেতে চাইলেন। আর ভীষ্মকে ঘটনাটা না বললে তার নিজের ইচ্ছাও পরিপূর্ণ হবে না। অনেক ভেবে সত্যবতী বললেন—শোন গাঙ্গেয়, তুমি তোমার প্রতিজ্ঞার বিষয়ে যে কথা বলেছ তা সম্পূর্ণ সত্য। আমি সব জেনে তাই তোমাকে দ্বিতীয়বার অনরোধ করে বিব্রত করতে চাই না। তবে পুত্র, আজ তোমাকে আমার জীবনের এমন এক গোপন সত্য বলবো, যা আমি কোনদিন কাউকে বলিনি। আমার এই গোপন কথাটির খবর এই বিশ্বচরাচরে কারো জানা নেই! কেবল তোমাকে বলছি এই কারণে যেহেতু আমি তোমাকে একজন ধর্মজ্ঞ, সত্যবান, ন্যায়নিষ্ঠ পুরুষ বলে মনে করি। মনে করি তুমি এই বংশের প্রধান রক্ষক এবং অভিভাবক। আশাকরি, তুমি আমার প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনে, বিচার করে যা তোমার বিবেচনা বলে মনে হয় তাই করবে। এই বলে সত্যবতী তার কুমারী জীবনের গোপন ক্ষণপ্রেমের কাহিনী ভীষ্মের কাছে উন্মোচন করলেন। বললেন সেদিনের সেই তমসাচ্ছন্ন পরিবেশের কথা। তার পিতা দাসরাজের একটি ছোট নৌকা ছিল। যৌবনারাম্ভের কোন এক গোধুলি বেলায় অকস্মাৎ তার

নৌকার যাত্রী হয়েছিলেন মহামুনি পরাশর। তিনি তাকে প্রথম 'বাসবী' নামে সম্ভাষণ করে বিমোহিত করেন। এরপর সত্যবতী বলে গেলেন কিভাবে তিনি 'মৎস্যগন্ধা' থেকে "পদ্মগন্ধায়" রূপান্তরিত হলেন। কিভাবে এই মহাঋষি বিভূতি প্রয়োগ করে চারদিক ঘন কুযাশা আবৃত্ত করে তার সঙ্গে সঙ্গম করেছিলেন। সেই সঙ্গে জানালেন তিনি কেমন করে মুনিবরের আকাঙ্খা পুরন করে যমুনা দ্বীপে একপুত্র সন্তান প্রশব করেন। তার সেই পুত্র হলেন দ্বৈপায়ন ব্যাস। সন্তান ব্যাস ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র পিতার সঙ্গে বনগমন করেন। আমার মনে হয় সেই মহাতাপসকে অনুরোধ করলে তিনি অবশ্যই বিচিত্রবীর্যের পত্নীদের গর্ভে আমাদের অভীষ্ট বংশলাভ করতে সাহার্য করবেন। আমার সেই পুত্র আমাকে ত্যাগ করে পিতার সঙ্গে তপস্যায় যাওয়ার আগে বলে গিয়েছিল, "মা কোন কর্তব্য কর্মে, কোন সংকটে পড়লে আপনি আমায় নির্দ্বিধায় স্মরণ করতে পারেন, আমি যেখানেই উপস্থিত থাকি না কেন ঠিক আপনার কাছে উপস্থিত হব।" এই পর্যন্ত বলে সত্যবতী তাকালেন ভীষ্মের দিকে। দেখলেন তার মধ্যে কোন বিরূপ ভাবন্তর পরিলক্ষিত হয় কিনা।

ভীষ্ম সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করলেন। তার মধ্যে এক অপার বিস্ময় খেলে গেল। দ্বৈপায়নের জন্ম কাহিনী শুনে তিনি স্তম্ভিত হলেন আরও বেশী বিস্মিত হলেন যখন জানলেন রাজামাতার কানীন পুত্র হলেন মহাঋষি ব্যাস।

আহ্, সত্যবতীতো এটাই চাইছিলেন। তিনি ভীষ্মের মুখে বিস্ময়ের ছাপ লক্ষ্য করে বললেন, শোন পুত্র, আমি চাই এই দায়িত্ব ব্যাসকে দেওয়া হোক, সেই হল উপযুক্ত ব্যক্তি। তুমি আমায় শুধু অনুমতি দাও। তুমি অনুমতি দিলে তবেই আমি তাকে স্মরণ করবো।

ভীষ্ম বললেন—এতে আমার অনুমতির দেওয়ার কি আছে মা, আপনি রাজমাতা, আপনার সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

—না পুত্র তা হয় না। তুমি হলে কুরুবংশের রক্ষক এবং অভিভাবক অতএব তোমার অনুমতি সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ভীষ্ম বুঝতে পারলেন মায়ের মনের কথা। তাই তিনি কোন রকম কালবিলম্ব না করে বললেন, এতে আমার কোন অমত নেই। হাজার গুনবান ব্রাহ্মণ অপেক্ষা

দ্বৈপায়ন ব্যাস হলেন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তার মতন একজন সহৃদয় ঋষি যদি অনুগ্রহ কবে এই মহৎকার্য্য সুসম্পন্ন করেন, তাহলে ভরত-কুরুবংশের অবশ্যই শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে।

আসলে এই ক্ষেত্রে ভীষ্মের তো কোন অমত করার প্রশ্নই উঠতে পারে না। কারণ তিনি নিজে এই দায়িত্ব না নিয়ে নিয়োগ প্রথায় সন্তান উৎপাদনের প্রস্তাব দিয়েছেন সত্যবতীকে। ঘটনাতো এমন নয় যে সত্যবতী ভীষ্মকে অগ্রাহ্য করে নিজের খুশী মতো ব্যাসদেবকে নিমন্ত্রণের প্রস্তাব কবেছেন। প্রথম দিকে সত্যবতীর সঙ্গে ভীষ্মের যে সম্পর্কই থাকুক না কেন, পরবর্তীকালে দুই পুত্র বিয়োগের পর সত্যবতী ভীষ্মের অনেক কাছে সরে এসেছিলেন। স্বামী হারা হওয়ার পর তিনি ভেবেছিলেন নিজেব দুই পুত্রকে নিয়ে তিনি স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকতে পারবেন। কিন্তু ভাগ্যের নিমর্ম পরিহাসে তার দুই পুত্রই অকালে চলে যায়। তখনই তিনি বুঝতে পারেন ভীষ্মকে অস্বীকার করে তিনি ভুল করেছেন। তাকে বাদ দিয়ে কোনভাবেই তার পক্ষে করুবংশের রাজমাতা হিসাবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাই তিনি ভীষ্মের অনেক কাছে সরে আসেন। ভীষ্মও কোনদিন কোন মুহুর্তের জন্য তাকে অস্বীকাব করেননি, অমর্যদা প্রকাশ করেননি। তবু সত্যবতী এই বিশাল রাজপুরীতে নিজেকে একজন নিসঙ্গ মৃতবৎসা জননী বলে মনে করতেন। তার মনে হতো এই বিরাটরাজ্যে তার নিজের বলে কেউ নেই। হয়ত এই মানসিকতা থেকেই নিজের কামীনপুত্র ব্যাসদেবের ওপর তার ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছিল। তারই কারণে তিনি তার নিজের জীবনের এক অন্ধকার ঘটনাকে মহামতি ভীষ্মের সামনে উন্মোচিত করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। তার মনে হয়েছিল এতে যেমন ভরতবংশ রক্ষা পাবে তেমনি তিনি ব্যাসকে দিয়ে ভুলতে পারবেন তার পুত্রশোকের যন্ত্রণা। সেই কারণে তিনি ভীষ্মের সম্মতি পেয়ে মনে মনে স্বস্তিবোধ করলেন। তপস্বী পুত্রকে হস্তিনাপুরের আসতে আহ্বান করলেন।

জননী সত্যবতীর আহ্বান যখন ব্যাসদেবের কর্ণ গোচর হল, যখন তিনি অন্তরের মধ্যে মাতৃ আহ্বান শুনতে পেলেন, তখন শোনা যায় তিনি শাক্তি ছাত্রদের বেদশিক্ষা দিচ্ছিলেন। জননীর আহ্বান শুনে তিনি

তার সম্মুখে উপস্থিত হন। বর্ত্তমান প্রজন্মের পাঠকদের কাছে মহাভারতের কাহিনীগুলো সম্পূর্ণভাবে জানা নেই। তারা হয়ত ভাবতে পারেন এ' অবার কেমন গপ্পো কথা। স্মরণ করামাত্র উপস্থিত হওয়া কি সম্ভব? সবই সম্ভব। অলৌকিক যোগ প্রক্রিয়ায় অনেক কিছুই করা যায়। সম্ভব-অসম্ভবের প্রশ্ন তুলে পাঠকদের আমি বিভ্রান্তের মধ্যে ফেলতে চাই না। শুধু যারা অতিমাত্রায় বাস্তববাদী তাদের কাছে ব্যাখ্যা দেবার জন্য বলি, এমনও তো হতে পারে তাকে স্মরণ করার অর্থ হল তাকে হস্তিনাপুরে আসার জন্য কোন দুতকে পাঠানো হয়েছিল। দুত যখন তার আশ্রমে যায় তখন তিনি ছাত্রদের বেদ পাঠ করাছিলেন। তার আজ্ঞা মাত্র উপস্থিত হওয়া এমন কোন কষ্টসাধ্য ঘটনা নয়। শুধু মহাভারত বা পুরান নয়, বাস্তবে চক্ষেও আমরা এমন কিছু মহাজ্ঞানী যোগবিদ্যা বিষারদ মহাপ্রাণ মানুষকে দেখেছি যারা অনায়াসে সুক্ষ্মদেহে যন্ত্রতন্ত্র যাতায়াত করতে পারতেন। কাজেই ব্যাসদেবের পক্ষে সত্যবতীর বার্তা পাঠানো মাত্র আগমন নতুন কোন ঘটনা নয়।

এবার আসা যাক ব্যাসদেবের আগমন প্রসঙ্গে। ব্যাসদেব মায়ের আহ্বান শোনা মাত্র হস্তিনাপুরে ছুটে এলেন। তাকে সম্মুখে দেখে বিস্ময়ে বিমুঢ় হয়ে গেলেন রাজমাতা সত্যবতী। জন্মের পর প্রকৃত পক্ষে সন্তানকে এই তার প্রথম দর্শন। মনের আবেগকে সত্যবতী তাই কোন ভাবে চাপা দিতে পারেন নি। শূন্য হৃদয়ে মাতা সত্যবতী বাৎসল্য আবেগে জড়িয়ে ধরলেন পুত্রকে। আনন্দে তার মন ভরে উঠলো। কে বলে তিনি নিঃস্ব রিক্ত জননী। মহর্ষিও নয়ন জলে জননীকে অভিষিক্ত করে অত্যন্ত বিনীত ভাবে বললেন, মা আপনার অভিপ্রেত কার্যসাধনের জন্যই আমি এখানে এসেছি। আপনি আমায় দয়া করে অনুমতি করুন কি প্রিয়কার্য সুসম্পন্ন আমায় করতে হবে।

সত্যবতী নয়নের অশ্রু সম্বরণ করে বললেন, হে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার্থে, তুমি আমার পুত্র হলেও তুমি আমার কাছে সত্য স্বরূপ প্রনম্য। রাজরানী হিসাবে আমি দুই পুত্রের জননী হলেও, বর্তমানে তারা কেউ বেঁচে নেই। কনিষ্ঠপুত্র বিচিত্রবীর্যের দুই অল্পবয়সী ভার্যা আছে। তারা উভয়ে নিঃসন্তান অথচ সু-সন্তান উৎপাদনে সক্ষম। যদি তুমি পিতৃসমৃদ্ধ

বিচাব কর তাহলে গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম হলেন এই বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিবাহ এবং রাজ্যশাসন কোনটাই সে করবে না। আমি তাকে বহুবার অনুরোধ করা সত্বেও সে তার প্রতিজ্ঞাচ্যুত হতে সম্মত হয়নি। অথচ এতবড় একটা বংশ লুপ্ত হয়ে যাক, রাজমাতা হিসাবে এ'আমার কাছে কোনমতেই কাম্য নয়। তুমি নিশ্চয় মনে কর পুত্রের উপব পিতার যেমন প্রভুত্ব থাকে, তেমনি মাতার'ও আছে। সেই মাতৃসম্পর্কে তুমি হলে আমার দুই পুত্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। তাই আমি সমস্ত দিক বিবেচনা করে ভীষ্মের অনুমতি নিয়ে তোমাকে এই ভরত-কুরু বংশ রক্ষার্থে আহ্বান করেছি। তুমি তোমার দুই অসহায় ভ্রাতৃজায়াদের কথা একবার চিন্তা কর। তারা উভয়ই পুত্রার্থিনী। তুমি দয়া করে তাদের পুত্রবতী কর। রক্ষা কর এই বিখ্যাত বংশকে অবলুপ্তির হাত থেকে।

মাতা সত্যবতীর বক্তব্য মন দিয়ে শুনলেন ব্যাসদেব। তারপর শান্তকণ্ঠে বললেন, মা আপনি সর্বধর্মজ্ঞাত আছেন এবং ধর্মের প্রতি আপনার প্রগাঢ় ভক্তি আছে. শুধুমাত্র সেই কারণেই আমি আপনার অভিলাষ ধর্মসম্মত বিবেচনা করে আপনার অভিপ্রায়ে সম্মত হলাম। আমি কথা দিচ্ছি ভ্রাতার ক্ষেত্রে আমি তাদের মিত্র-বরুন সাদৃশ্য পুত্রদান করবো। তবে তার আগে তাদের উভয়কে সংবৎসর কাল নিয়মাচার সহ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রতোপাসনা করতে হবে। তা না হলে ব্রত বিবর্জ্জিতা কোন অপবিত্র রমনীর অঙ্গ আমি স্পর্শ করতে পারি না।

সত্যবতী ব্যাসদেবের কথায় সন্তুষ্ট হলেও তার মনের উৎকণ্ঠা দুর হল না। একবছর কাল ব্রতপালনের পর পুত্র উৎপাদনের জন্য ব্যাস সচেষ্ট হবেন—এতো দীর্ঘসময়ের ব্যাপার। এই দীর্ঘসময় অপেক্ষা করাতো কোনভাবেই সম্ভব নয় পুত্র। অরাজক রাজ্যের ভার গ্রহণ কে করবে। তাই তিনি ব্যাসদেবকে বললেন—পুত্র, তুমি যা বলছ সেতো দীর্ঘসময়ের ব্যাপার, এতসময় অপেক্ষা করতে আমার মন চাইছে না। আমি চাই আমার পুত্রবধুরা অতি দ্রুত গর্ভবতী হোক। এরজন্য যদি কোন যজ্ঞক্রিয়ার ব্যবস্থা করতে হয়, তা করা যাবে। কিন্তু এতদিন অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তুমি তো জান, অরাজক রাজ্যের প্রজারা অনাথ হয়, ধর্ম বিনষ্ট হয়, দেবতারা অন্তর্হিত হন।

মায়ের অন্তর ব্যাগ্রতা লক্ষ করে মৃদ্যু হাসলেন ব্যাসদেব। বললেন—মা আমি এই বংশের মঙ্গলের জন্যই এই কথা বলেছিলাম, আপনি আমায় হয়ত ভুল বুঝেছেন। তারপর একটু চিন্তান্বিত ভাবে বললেন—দি আপনার পুত্র বধুরা আমার এই বিশাল আকৃতির রুদ্ররূপ, ভয়ানক তেজ, এবং আমার শরীরের অসহ্য দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারেন, তাহলে আমি তাদের অকালিক পুত্র প্রদান করবো। আপনি আপনার পুত্র বধুদের শুচিভাবে শয়নকক্ষে আমার জন্য প্রতীক্ষা করতে বলুন।

সত্যবতী আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু তিনি জানতেন না তার এই আশ্বস্ততা নেহাতি সামায়িক, এরপর অপেক্ষা করে আছে আরও দুর্বিসহ কিছু ঘটনা। হয়ত দুরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যাসদেব সেটা অনুমান করেই একবছর কাল ব্রতপালনের কথা বলেছিলেন। তিনি মায়ের মনে আবার নতুন করে কোন হতাশার সৃষ্টি না হয়, তাই তাকে খুলে কিছু বলতে পারেন নি। সত্যবতীর এরপর দায়িত্ব ছিল পুত্রবধুদের প্রকৃত সত্যকে খুলে বলা। কিন্তু তিনি অম্বিকা এবং অম্বালিকা কাউকেই ব্যাসদেবের কথা বলেন নি। বলেননি তার ওই বিরাট কৃষ্ণবর্ণ জটাজুটধারী রুদ্ররূপের কথা। ফলে অম্বিকা এবং অম্বালিকা পুত্র কামনায় মনে মনে কোন রূপবান আত্মীয়কে আশা করেছিল। তাদের পক্ষে সেই আশা করা অন্যায় কিছু ছিল না। এই ক্ষেত্রে সত্যবতীর উচিত ছিল যথার্থভাবে ব্যাসের রূপ বর্ণনা করে তাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখা। তিনি দুই পুত্রবধুকে বোঝাতে গিয়ে প্রথমেই ধর্মের কথা বললেন। ধর্মের পর এলেন রাজ্যে, রাজ্যের পর বংশপরম্পরার কথায়। তিনি এমনভাবে বুদ্ধি দিয়ে নিজের যুক্তিকে সাজালেন যেন তিনি এই কাজে দায়বদ্ধ। এই বিশাল বংশের ধারা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার জন্য তিনি এবং তার দুই পুত্রবধু দায়ী থাকবেন। এরপর তিনি ভীষ্মের কথা তুলে বললেন, মহামতি ভীষ্ম যে যুক্তি দিয়েছেন, সেটা এখন কেবল মাত্র তোমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। তোমার দুজনে আমাদের রাজ পরিবারের সকল আত্মীয় পরিজনের অভিলাষ পূর্ণ করে ভরত-কুরুবংশকে রক্ষা কর।

—কি ভাবে? অম্বিকা জানতে চাইলেন।

সত্যবতী বললেন, তোমার এক দেবর ব্রহ্মর্ষির কৃপায় তোমরা দেবরাজ সাদৃশ্য পুত্রলাভ করবে।

ব্যাস, এই পর্যন্ত বললেন সত্যবতী, বাকি অংশ তিনি আর ভাঙ্গলেন না। একবারের জন্য তিনি বললেন না মহামুনি ব্যাসদেবের কথা। ফলে তাদের চিন্তার স্রোত বিপরিত খাদে প্রবাহিত হল। অথচ এই ক্ষেত্রে সত্যবতীর উচিত ছিল ব্যাসদেবের রুদ্রমুর্ত্তি সম্পর্কে তার পুত্রবধুদের অবিহিত করা। বিশেষ করে ব্যাসদেবের ভয়ংকর চেহারা সম্পর্কে তাদের সর্তক করে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। অথচ সত্যবতী সেই কাজটি করলেন না। বরং তিনি পুত্র বধুদের বোঝাবার সময় বারবার মহামতি ভীষ্মের নাম উচ্চারণ করলেন। কেন এমন কাজ কবলেন সত্যবতী? এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলা যায়, সত্যবতীর মনে কোন একটা ভীতি বোধ তাকে পুত্রবধুদের কাছে ব্যাস প্রসঙ্গে বেশী কথা জানাতে বাধা দিয়েছে। তার মনে হয়েছে ব্যাস প্রসঙ্গে অতিরিক্ত কোন কথা বলতে গেলে যদি তার গোপন পাপের কথা পুত্রবধুদের কাছে ফাঁস হয়ে যায়, যদি তারা জানাতে পারেন এই ব্যাস হলেন তার কুমারী জীবনের ক্ষনমিলনের ফসল, তখন কোন লজ্জায় তিনি তাদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াবেন। দুই পুত্রবধু তাকে এখন যে সম্মান করে সেই সম্মান তারা আর করবে না। হয়ত বা এটাও হতে পারে ব্যাসদেবের ওই ভয়ঙ্কর চেহারার কথা শুনলে তার পুত্রবধুরা হয়ত কেউই মিলনে আগ্রহী হবে না, এটা ধরে নিয়েই সত্যবতী সরাসরি ব্যাস প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। তাদের নিয়োগ প্রথায় সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রে উজ্জীবিত করার জন্য তিনি বারবার ভীষ্মের কথা বলেছেন। ভীষ্মের নাম এতবার উচ্চারণের কারণ হল এই ভীষ্মেই তাদের স্বয়ম্বর সভা থেকে ভুজ বলে তুলে এনেছিলেন। ফলে মনের গভীরে ভীষ্মের প্রতি কোন দুর্বলতা তাদের থাকলেও থাকতে পারে। ধর্মত তারাই ভীষ্মের সহধর্মিনী হওয়ার প্রকৃত দাবীদার। কাজেই তিনি তার পুত্রবধুদের কাছে দেবর সম্পর্কীয় কথাটা বললেও, প্রকৃত সত্যটাকে কিন্তু ভাঙ্লেন না। তিনি তাদের একটা রহস্যের মধ্যে রেখে দিয়ে নিজের দৃষ্টিকোন থেকে বিষয়টাকে বিশ্লেষণ করলেন। তার মনে হল তিনি কুমারী অবস্থায়

যদি পরাশরের মতো ওই জটাজুটধারী মুনিকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারেন, তাহলে তার পুত্রবধুরাও সন্তান কামনায় অবশ্যই ব্যাসের সঙ্গে মিলিত হতে কুণ্ঠিত হবে না। কোন নারী না চায় মা হতে। মা হওয়ার স্বপ্ন প্রত্যেকের মধ্যে আছে। কাজেই সেই মাতৃত্বের স্বাদ পেতে তারা ব্যাসদেবকে সহজ ভাবেই গ্রহণ করবে। তাই তিনি আগুপিছু অনেক ভাবনা চিন্তা করে, দুই পুত্রবধুর মনে দেবর সম্পর্কীয় কোন পুরুষের বিষয়ে মনের গভীরে নতুন করে কামনার স্বপ্ন এঁকে দিয়ে তাদের শয়ন কক্ষে অপেক্ষা করতে বললেন। এখানেই একটা মস্ত ভুল করে গেলেন সত্যবতী। কারণ তার পুত্রবধুরা মনে মনে সন্তান কামনায় কোন রূপবান দেবরকে পাওয়ার স্বপ্নে বিভোর ছিল। স্বয়ং ভীষ্ম যদি উপস্থিত হতেন, তাকে যদি অম্বালিকা বা অম্বিকা শয়ন কক্ষে দেখতে পেতেন তাহলে তারা হয়ত আনন্দ বিহ্বলতায় হতবাক হয়ে যেতেন, শিহরিত হতেন না। যে কোন নারী মিলনের ক্ষেত্রে গুণের তুলনায় রূপকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে বেশী। এই ক্ষেত্রে অম্বালিকা ও অম্বিকা যদি মনে মনে কোন রূপবান গুণবান রাজপরিবার সম্পর্কিত দেবরের স্বপ্ন দেখে থাকেন তাহলে তো কোন অন্যায় তারা করেন নি। এইক্ষেত্রে সত্যবতী নিজেকে বিচার করে নিজের দৃষ্টিকোন থেকে পুত্রবধুদের বিশ্লেষণ করতে গিয়েছিলেন, আর সেটাই হয়েছিল তার মস্ত অপরাধ। সত্যবতী যতই রাজকন্যা হন না কেন—তার জন্ম বৃত্তান্ত আদৌ স্বাভাবিক নয়। এক অবৈধ সুখ মিলনের ফলে তার জন্ম। বংশ পরিচয় মাতার যথার্থ না হওয়ার কারণে বসুরাজ কন্যাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। তার ধমনীতে রাজরক্ত থাকলেও তিনি বড় হয়েছিলেন ধীবর পল্লীতে। ফলে তার মানসিকতার সঙ্গে কাশীরাজকন্যাদের মানসিকতা কখনই এক হতে পারে না—এটাই সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারেন নি সত্যবতী।

ব্যাসদেব কিন্তু ঘটনা অনুধাবন করেই বহুআগেই সর্তক করে দিতে চেয়েছিলেন মাতা সত্যবতীকে। বলেছিলেন তার ভ্রাতৃবধুরা যেন সংবৎসর কাল নিয়মানুসারে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তার নির্দিষ্ট ব্রতোপসনা করেন। কারণ ব্যাস জানতেন এই ব্রতোপসনার কারণে তাকে একাধিকবার হস্তিনাপুরে যেতে হবে, ফলে দুই ভ্রাতৃবধুর সঙ্গে

তার কিছুটা মানসিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে। এই অবস্থায় তারা ব্যাসদেবকে কিছুটা বোঝার সময় পাবে। কিন্তু স্যতবতী ব্যাসদেবের এক বৎসর কাল ধরে ব্রতপালনের ব্যাপারে আপত্তি করে দ্রুত কার্যসমাধার পথে এগুতে চাইলেন। তিনি চেয়েছিলেন ব্যাসকে দিয়ে দ্রুত উদ্দেশ্য সাধনপর্ব সমাধা করে তাকে মুক্তি দিতে এবং সেই সঙ্গে নিজে স্বস্তি পেতে। ব্যাসদেব রাজপুরীতে দীর্ঘসময় অবস্থান করুন এটা মনে হয় চাননি সত্যবতী। আত্মরক্ষার কারণেই তাই তিনি দ্রুত কার্যোদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। এই দ্রুততার জন্য কি পরিণাম হতে পারে তা ব্যাসদেব জানতেন তবু—তিনি মাতাকে নতুন করে শোকে আচ্ছন্ন করতে চাননি। শুধু বলেছিলেন, যদি আমার বিকটমুর্তি, ভয়ানক বেশ এবং আমার অসহ্য গায়ের গন্ধ তারা সহ্য করতে পারেন, তাহলে আজই তারা গর্ভবতী হবেন।

ব্যাসদেবের এই কথার অর্থ ছিল, তার এই ভয়ানক চেহারাটির কথা সত্যবতী যেন তার পুত্রবধুদের জানিয়ে রাখেন। আসলে মিলনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি সর্বাগ্রে প্রয়োজন। মানসিকভাবে প্রস্তুত না থাকলে সেই মিলন ধর্ষনের পর্যায় পৌঁছায়, তার মধ্যে কোন আন্তরিক আবেগ উচ্ছ্বাসের ছায়াপাত ঘটে না। এমন পরিস্থিতির মধ্যে যাতে ব্যাসদেবকে পড়তে না হয় তারই কারণে তিনি নিজের রূপাকৃতির কথা তার দুই ভ্রাতৃবধুকে বলার জন্য বলেছিলেন। সত্যবতী রাজমাতা হলেও ব্যাসদেবের অন্তরদৃষ্টিকে অনুভব করার মতো গভীর অধ্যাত্মিক চেতনা তার মধ্যে ছিল না। তিনি নিজেকে আপন অহংকারে বুদ্ধিমতী বলে মনে করলেও, সংসারজীবনে দেখা গেছে তিনি প্রচুর ভুল করেছেন। তার এই একেকটি ভুলের জন্য তাকে বিস্তর মাসুল দিতে হয়েছে। এই ক্ষেত্রেও সেই মাসুল তাকে দিতে হলো। তিনি অম্বিকা ও অম্বালিকা, কারো কাছেই ব্যাসদেবের ওই ভয়াবহ রুদ্রমুর্তির কথা বললেন না। বরং দেবর সম্পর্কীয় কথাটা বলায় তারা মনে মনে আত্মীয়ের মধ্যে কোন রূপবান দেবর স্থানীয় পুরুষ আছে তাদের কথা মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন। কে হতে পারেন সেই পুরুষ? অম্বিকার প্রথমেই মনে হল এই দেবর ভীষ্ম নয়তো? তিনি তাদের স্বয়ম্বর সভা

থেকে হরণ করে নিয়ে এসেছিলেন, সেই অর্থে তিনি শাস্ত্রমতে তাদের স্বামী। কিন্তু ভীষ্ম বিবাহের অপারক এমন কি সন্তান উৎপাদনেও অক্ষম—এক মহাপ্রতিজ্ঞার দ্বারা নিজেকে তিনি আবদ্ধ করে রেখেছেন, এই দৃঢ়চেতা মানুষটির পক্ষে এই দায়িত্ব গ্রহণ করা কখনই সম্ভব নয়। যদি কোন সম্ভবনা থাকতো তাহলে অবশ্যই তিনি অম্বাকে বিবাহ করতেন, প্রত্যাখ্যান করতেন না। মনে পড়ে অম্বিকার সেই দিনের কথা। কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা বলে মহামতি ভীষ্ম একাই অতগুলো যোদ্ধার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে তাদের নির্বিঘ্নে হস্তিনাপুরে নিয়ে এসেছিলেন। ভীষ্মের পৌরুষে তারা তিন ভাগ্নী বিমোহিত হয়েছিলেন। এরপর যখন তারা শুনলেন ভীষ্ম নিজের কারণে তাদের হরণ করেননি, করেছেন কুমার বিচিত্রবীর্যের জন্য, তখন তারা আহত হয়েছিলেন। অম্বা প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু অম্বার মতো প্রতিবাদী অন্তর বা মন অম্বিকা, অম্বালিকার ছিল না। তারা চেয়েছিল রাজসুখ। বিচিত্রবীর্য রূপবান। সেই রূপের মোহে তারা কেউই অম্বার মতো প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পারেনি। নীরবে বিচিত্রবীর্যের মতো একজন কামুক পুরুষকে তারা স্বামী হিসাবে মেনে নিয়েছিল। মনের মধ্যে তখন নানা স্মৃতির ঝড় চলে, এরই মধ্যে মিলন লাগি তীব্র পিপাসা। কে হবে এই দেবর? একের পর এক এই রাজপরিবারের অসংখ্য যুবা পুরুষের মুখ চোখের উপর ভেসে ওঠে। হঠাৎ সেই রোমনীয় মুহূর্তে রানী অম্বিকার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করলেন মহাঋষি ব্যাস। ঋষির পিঙ্গলজটা, বিশাল শ্মশ্রু, উজ্বল তেজদীপ্ত নয়ন, অতিকৃষ্ণকায় গাত্র বরণ দেখে শিউরে উঠলেন অম্বিকা। কোথায় গেলেন সেই সুন্দর দেবকান্ত যুবা পুরুষ, যিনি এতক্ষণ অম্বিকার সমস্ত ভাবনাকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। সেই রূপবান দেবরের পরিবর্তে এ'তিনি কাকে দেখছেন তার শয়নকক্ষে। এই ভয়ানক আকৃতি মুনির সঙ্গে তাকে সহবাস করতে' হবে। ভাবতে গিয়ে অম্বিকা দুই চোখ বন্ধ করে ফেললেন। তিনি কিছুতেই চোখ খুলবেন না—এই ভয়ানক রূপকে সহ্য করার ক্ষমতা তার নেই। অনেক বোঝালেন মহর্ষি ব্যাস। তবু অম্বিকা একবারের জন্য তাকালেন না তার দিকে। সমগ্র সহবাসকালে ভয়ে দুই চোখ সারাক্ষণ বন্ধ করে রাখলেন। ব্যাসদেব

একসময় বেরিয়ে এলেন অম্বিকার কক্ষ থেকে। উদবীঘ্ন রাজমাতা সত্যবতী প্রশ্ন করলেন—এই সন্তান কেমন হবে পুত্র? মাতার প্রশ্নের উত্তরে ব্যাসদেব বললেন—এই সন্তান অতিশয় বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং বলবান হবেন। কিন্তু একমাত্র মাতৃদোষে এই কুমার 'জন্মান্ধ' হবে।

—জন্মান্ধ হবে! হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন সত্যবতী। বললেন ব্যাসদেবের উদ্দেশ্য—অন্ধব্যাক্তি রাজা হবে কি করে, রাজ্যশাসন করা কোন অন্ধের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি চাই কুরুবংশের উপযুক্ত রাজা হওয়ার মতো এক সুযোগ্য সন্তানকে। তুমি আমার বাসনাকে চরিতার্থ কর পুত্র।

এবার মহাযোগী মৃদ্যু হেসে প্রবেশ করলেন অম্বালিকার শয়নকক্ষে। অম্বালিকা অম্বিকার মতো ভয় পেলেও সে কিন্তু দুই চোখ মেলে তাকিয়েছিল মহামুনির দিকে। ভীত, বিবর্ণ এবং অত্যন্ত সংকুচিত অবস্থার মধ্যে তাদের মিলন হল। মিলনের পর ব্যাসদেব অম্বালিকাকে বললেন, ভদ্রে তুমি আমার বিরাট আকৃতির চেহারা দেখে অত্যন্ত ভীত ও শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলে। তোমার এই সংকোচনের কারণেই তোমার পুত্র পান্ডুবর্ণের হবে। তার নাম হবে পাণ্ডু।

এইবলে ব্যাসদেব কক্ষের বাইরে বেরিয়ে আসা মাত্র সত্যবতী আগের মতো পুত্র বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলেন। ব্যাসদেব বললেন, পুত্র পাণ্ডু বর্ণের হবে। এর নাম পাণ্ডু।

এই কথা শুনে সত্যবতী ব্যাসদেবকে বললেন—তবুও তো সর্বাঙ্গ সুন্দর নিখুঁত পুত্রের জন্ম হল না বৎস, আমি চাই সর্বাঙ্গ সুন্দর এক পরিপূর্ণ পুত্রের।

অতঃপর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধুর পুনরায় ঋতুকাল উপস্থিত হলে সত্যবতী পুনরায় ব্যাসদেবকে আহ্বান করলেন। ব্যাসদেব এলেন। সত্যবতী অম্বিকাকে অনেক বোঝালেন। কিন্তু অম্বিকা মন থেকে ওই ভয়ানক মূর্তি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি সত্যবতী পিড়াপিড়িতে মৌখিক সম্মতি দিলেও কার্যত নিজে শয়ন কক্ষের মধ্যে উপস্থিত থাকলেন না। তার অবর্তমানে এক প্রিয় দাসীকে নিজের বস্ত্র ও অলঙ্কারে আচ্ছাদিত করে আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলেন। ব্যাসদেবের কাছে কোন

কিছু অজানা ছিল না। তিনি ঘরে প্রবেশ করা মাত্র ওই দাসী তাকে পরম ভক্তি ভরে সেবা করলেন। পরে মহর্ষি ব্যাস শয্যাত্যাগ কালে অত্যন্ত প্রীত হয়ে দাসীকে বললেন, হে শুভে, তুমি অচিরেই দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবে। তোমার গর্ভজাত সন্তান হবে অসাধারণ বুদ্ধিমান ও একজন পরম ধার্মিক।

অম্বিকার শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে ব্যাসদেব বললেন মা, আপনার পুত্রবধু নিজে উপস্থিত না হয়ে তিনি তার এক সুন্দরী দাসীকে নিজের বস্ত্র ও অলংকারে আচ্ছাদিত করে নিয়োগ করেছিলেন। ওই শুদ্র দাসীর গর্ভে ঋষি অনীম্মান্ডের শাপে ধর্মরাজ বিদুর নামে জন্ম নেবেন।

মাতা সত্যবতীকে পুত্র জন্ম বৃতান্ত নিবেদন করে, ধর্মের নিকট অঋনী হয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন। এইভাবেই জন্ম নিলেন জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুর। ধৃতরাষ্ট্র যে হেতু জন্মান্ধ ছিলেন এবং বিদুর শুদ্রানীর গর্ভজাত সন্তান, সেই কারণে সত্যবতী পাণ্ডুকে ভবিষ্যতের রাজা বলে ঘোষণা করলেন।

মহাভারতের কথকের বর্ণনা অনুসারে বলা যায় এই তিন কুমারের জন্মের পর কুরুজাঙ্গল, কুরব এবং কুরুক্ষেত্র এই তিনটি জনপদ অতীব সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। পৃথিবী স্বরস ও সুস্বাদ শষ্যে পরিপূর্ণ হয়। কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি হয় এবং প্রচুর অর্থাগম হয়। মানুষ সুখে দিন কাটাতে থাকে। এই সময় দস্যু, বা তস্কর কিংবা দুবৃর্ত্তের কোন প্রাদুর্ভাব ছিল না। সর্বত্রসত্য বিরাজ করত। লোভহীন, ইর্ষাহীন ভাবেই সেই সময় মানুষ দিন কাটাতো।

মহাত্মা ভীষ্ম রাজমাতা সত্যবতীর নির্দেশ মতোই এবং তার সঙ্গে রাজ্যের সকল বিষয়ে আলোচনা করে নানা রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রাজ্য চালাতে লাগলেন। এতে বোঝা যায় ভীষ্ম নাবালকদের অবর্তমানে কুরুকুলকে রক্ষার জন্য যথেষ্ঠ সক্রীয় ছিলেন। তিনি নিজে সক্রীয়ভাবে রাজ্য পরিচালনায় নিজের কোন মতকে কখনই চাপিয়ে দেননি। বরং তিনি প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে একজন শুদ্ধাচারী ধার্মিক, নির্লোভ মহাত্মা হিসাবে রাজামাতা সত্যবতীকে সঠিক পথে চালাবার চেষ্টা করেছিলেন।

সত্যবতীর মনে সুখ ছিল না। তিনি যা চেয়েছিলেন তা সফল হয়নি আর এই সফল না হওয়ার পিছনে যে তার নিবুর্দ্ধিতা অনেকখানি দায়ী সেটা তিনি তিনপুত্রের জন্ম বৃত্তান্ত শুনে বুঝতে পারলেন। বার বার মনে হল, তার উচিত ছিল দুই পুত্রবধুকে ব্যাসের সম্পর্কে কিছুটা অবিহিত করা। কিন্তু এখন আর এসব কথা ভেবে কোন লাভ নেই, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। তবে এই কুমারেরা যাতে ভীষ্মের ছত্রছায়ায় বড় হতে পারে, সেই কারণে তিনি ভীষ্মের উপর সমস্ত দায়িত্ব অপর্ণ করলেন। মহাত্মা ভীষ্ম সেই দায়িত্ব নিখুঁতভাবে পালন করেছিলেন। তিনি তাদের নিজের অধীনে রেখে যেমন অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছেন তেমনি অধ্যায়ন করিয়েছেন ধর্মনীতি, সমাজনীতি তেমনি দিয়েছেন রাজনীতির শিক্ষা। ফলে রাজতনয়েরা তরুনাবস্থায় ধুর্নবিদ্যা, গদাযুদ্ধ, গজশিক্ষা, অসিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে যেমন দক্ষ হয়ে উঠলেন তেমনি নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, ভূগোল, পুরান, বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি বিষয়ে হয়ে উঠলেন বিশেষ পারদর্শী। এদের মধ্যে একেকজন কুমার একেকটি বিষয়ে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিলেন। পাণ্ডু হলেন অদ্বিতীয় ধানুষ্ক, ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন অসাধারণ বলবান আর শুদ্রপুত্র বিদুর হয়ে উঠলেন ধর্মশাস্ত্রে অত্যন্ত পন্ডিত।

ধীরে ধীরে কুমারেরা একত্রে বড় হতে লাগলেন। জ্ঞান হওয়ার পর ধৃতরাষ্ট্র জানতে পারেন তিনি এইবংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়া সত্ত্বেও অন্ধত্বের কারণে তিনি রাজ্যাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তারকনিষ্ঠ ভ্রাতা পান্ডু হবে আগামী দিনে ভরত-কুরু বংশের রাজা। ফলে ধৃতরাষ্ট্রের মনে সেই থেকে শুরু হয় গোপন ঈর্ষা। মনের ভিতরে জন্মাতে থাকে গভীর ক্ষোভ ও বেদনা। এই বেদনা বা ক্ষোভ তাকে ঈর্ষান্বিত করার কারণ ছিল। কারণ এই বংশের নিয়মানুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্রের রাজা হওয়ার কথা। তিনি সেই হিসাবে জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়া সত্ত্বেও আপন অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তার জন্মমুহুর্তে রাজমাতা ঘোষণা করেছেন— "জন্মান্ধ" ব্যক্তির কখনই রাজ্য পরিচালনার অধিকার থাকেনা। অতএব

ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে রাজা হওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে তার ভিতরের বেদনা ও ক্ষোভ তাকে পাণ্ডুর প্রতি ঈর্ষান্বিত করে তুলেছিল। বারবার তার মনে হয়েছে তাকে অন্যায় ভাবে রাজ্যাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে কেবল মাত্র অন্ধত্বের কারণে। মনের এই ক্ষোভের কথা তিনি কাউকে মুখে বলতে পারতেন না, তবে তার আচরণে পাণ্ডুর প্রতি বিরূপতা মাঝে মাঝে প্রকাশ পেয়ে যেত। ধৃতরাষ্ট্রের এই আচরণ আর কেউ লক্ষ্য না করলেও ভীষ্ম মনে মনে উপলব্ধি করে শিউরে উঠেছিলেন।

পাণ্ডু সিংহাসনে বসার পর থেকে ধৃতরাষ্ট্রের ভিতরের ক্ষোভ যেন আরও বেড়ে গেল। চিন্তান্বিত ভীষ্ম সত্যবতীকে কুমাদের বিবাহের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন। তিনি সত্যবতীকে বললেন—আমার মনে হয় কুমারদের বিবাহের ব্যবস্থা করা হোক।

আপত্তি করলেন না সত্যবতী। তিনিও মনে মনে এই ইচ্ছাই পোষণ করছিলেন। কারণ ভরত-কুরু বংশের জন্মধারা যাতে অব্যাহত থাকে তারই কারণে সময় থাকতে বিবাহের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। তাছাড়া রাজমাতা হিসাবে সত্যবতী চেয়েছিলেন ছেলের ঘরে নাতি দেখতে—এই ইচ্ছা কার না হয়। সবচেয়ে বড় কথা তার পাপের কারনে যে ভরত-কুরু বংশ লুপ্ত হয়ে যায়নি এটাই তিনি দেখে যেতে চান। হতে চান পাপ মুক্ত। ধৃতরাষ্ট্রের জন্য তার মনে কিঞ্চিত বেদনা থাকলেও তিনি যে সঠিক কারণে তাকে রাজ সিংহাসনে বসাতে চাননি, তাঁর পশ্চাতে অবশ্যই যুক্তি ছিল। এই ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্রের সন্তান যদি জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসাবে এই বংশধারাকে রক্ষা করতে পারে, তাহলে সেই হবে পর্যায়ক্রমে পরবর্তীকালে এই বংশের রাজা। এই ক্ষেত্রে রাজা না হলেও রাজপিতার যোগ্য সম্মানটুকু পেতে পারেন ধৃতরাষ্ট্র। মনে হয় এরফলে ধৃতরাষ্ট্রের মনের মধ্যে আর কোন বেদনা থাকবে না। অতএব সত্যবতী ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহের জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ভীষ্মকে বললেন, তুমি এমন এক কন্যার সন্ধান কর যে ধৃতরাষ্ট্রকে পুত্র দিতে পারবে। অর্থাৎ সেই নারী যেন আবার দৈববশতঃ বন্ধ্যা নারী না হয়।

ভীষ্ম রাজামাতার আদেশ পাওয়া মাত্র চারদিকে সুলক্ষনা কন্যার সন্ধানে লোক পাঠালেন। বলেদিলেন অনুসন্ধানকারী ব্রাহ্মণদের (ঘটক শ্রেণী) আপনারা এমন কন্যার সন্ধান করুণ যাতে এই ভরত-কুরু বংশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে পারে। আসলে সত্যবতীর মতো ভীষ্মও মনে মনে কুরুবংশের সন্তান নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তিনি জানতেন বিচিত্রবীর্যের দুই স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সে মুলত ছিল অপুত্রক। দীর্ঘ সহবাস সত্ত্বেও সে সন্তান উৎপাদন করতে পারেনি। ব্যাসদেবের কৃপায় অম্বিকা ও অম্বালিকার সন্তান প্রাপ্তি হয়েছে। মহারাজ শান্তনুর পর থেকে এইবংশের রাজাদের আয়ু ক্রমশ সংক্ষীপ্ত হয়ে এসেছে। অল্প বয়সে মারা গেছে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। অতএব এমন অবস্থায় ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর বিবাহের জন্য বেশী সময় ব্যয় করা উচিত কাজ হবে না।

ভীষ্ম যাদের দিয়ে সুলক্ষণা কন্যার সন্ধান সংগ্রহ করতে পাঠালেন, তাদের একজন এসে খবর দিয়ে ভীষ্মকে বললেন, হে প্রভু, আপনি যেমন কন্যার সন্ধান করছেন, ঠিক তেমনি একটি কন্যার সন্ধান আমি পেয়েছি গান্ধার রাজ্যে। তিনি হলেন মহারাজ সুবলের কন্যা গান্ধারী। শুনেছি ওই কন্যা শিবের আরাধনা করে, শতপুত্রের জননী হওয়ার বর পেয়েছেন।

ভীষ্ম ব্রাহ্মণের মুখে এই কথা শুনে নিজের এক বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীর সঙ্গে ধর্মপ্রাণ বাগপটু বিদুরকে পাঠালেন গান্ধার রাজ্যে। গান্ধার রাজ্য বৈদিক যুগে এবং পরবর্তী ভগবান বুদ্ধের সময় যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী ছিল। কিন্তু মহাভারতের কাহিনীকার গান্ধার দেশকে সেই সমৃদ্ধির ব্যাপকতা দেননি। আসলে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে গান্ধার রাজ্যের সীমানা কখনই স্থির ছিল না। এই রাজ্যের সীমানা কখনও বেড়েছে, কখনও কমেছে। অর্থাৎ গান্ধার রাজ্যের নিজস্ব কোন স্থায়ী পরিধি মহাভারতের কাহিনীকার দিতে পারেন নি। তবে তার বর্ণনা থেকে বোঝা যায় এই রাজ্য কাশী, কাঞ্চী, অবন্তীর মতো বৃহৎ ছিল না, তুলনায় ছিল অত্যন্ত নগন্য। গান্ধারীর পিতা সুবল বংশ পরম্পরায় এই রাজ্য পান নি। তিনি নিজের দক্ষতায় এই রাজ্যকে জয় করেছিলেন। আর নিজের জয় গৌরব ঘোষণা করার জন্যই কন্যার নাম রেখেছিলেন গান্ধারী। অনেকের মতে এই গান্ধার রাজ্যটা ছিল আফগানিস্থান, কাবুল,

কান্দাহার অঞ্চল হয়তবা আরো পরিস্কার করে বলা যায় বর্ত্তমান আফগানিস্থানের পূর্বাঞ্চল থেকে শুরু করে একাবারে উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এইরাজ্য। তবে এটা সত্য মহাভারতের যুগে এই বাজ্যের ব্যাপকতা বেশী ছিল না। তাছাড়া তখন গান্ধার রাজ্যে আর্য সংস্কৃতির অবক্ষয় শুরু হয়েছে। ফলে যবন, খশ্, কম্বোজ প্রভৃতিব সঙ্গে এক নিশ্বাসে গান্ধারের নাম উচ্চারিত হত। ভীষ্ম গান্ধারীর বিষয়ে সমস্ত খোঁজ খবর নিয়ে এবং নিজের গুপ্তচর মাধ্যমে সমস্ত সংবাদ যাচাই করে দেখা করলেন রাজমাতা সত্যবতীর সঙ্গে। তিনি হলেন বর্ত্তমানে হস্তিনাপুরের রাজরাজেশ্বরী। তার কথাই শেষ কথা। তিনি ভীষ্মের মুখ থেকে গান্ধারীর বিষয়ে সমস্ত কথা অবগত হয়ে সম্মতি দিলেন। হোক ক্ষুদ্র রাজ্য, রাজকন্যা তো বটে তাছাড়া পাত্রের দিকটাও দেখতে হবে—ধৃতরাষ্ট্র হলেন জন্মান্ধ। একজন প্রতিবন্ধী যুবরাজ। এমন একজন পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে কোন বড় রাজ্যের রাজা সাগ্রহে এগিয়ে আসবেন না এটা সত্যবতীর ভালোমতোই জানা ছিল গান্ধাব রাজ যেহেতু ক্ষুদ্ররাজ্যের অধীশ্বর হয়ত, সেই কারণে তিনি কন্যাকে এমন পাত্রের হাতে সমর্পণ করতে আপত্তি করবেন না। ববং খুশী হবেন। তাই তিনি ভীমকে বললেন—শোন পুত্র, তুমি পাত্রীর যে পরিচয় দিলে তা অতীব সুন্দর। ক্ষুদ্র রাজ্যের কন্যা বলে আমার কোন আপত্তি করার কারণ নেই। মনে রাখতে হবে জাতীকুলমান মর্যাদায় আমরা বড় হলেও আমাদের পাত্র একজন জন্মান্ধ। এই পাত্রী যদি তোমার বিচারে সুলক্ষণা হয়, সত্যি যদি সে শিবের বরে শতপুত্রেব জননী হওয়ার বর পেয়ে থাকে, তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে গান্ধার রাজকে বলবে তিনি যেন তার কন্যাকে নিয়ে সদলবলে হস্তিনাপুরে আসেন। যুবরাজ ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে অতদূরে গিয়ে বিবাহ করতে যাওয়া সম্ভব নয়।

কথাটা বলেই সত্যবতীর মনে হল যদি গান্ধার রাজ সম্মত না হন। একে অন্ধপাত্র তার উপর আবার কন্যাকে নিয়ে হস্তিনাপুরে আসার প্রস্তাব দিলে যদি তিনি এই বিবাহ প্রস্তাব খারিচ করে দেন, তাই তিনি নিজের বুদ্ধি বলে আর কথা না বাড়িয়ে ভীষ্মকে বললেন-আমার

সম্মতি আছে। আমার যা বলার তোমাকে বলেছি। এখন তুমি যা ভালো বোঝ তাই কর।

ভীষ্ম কোন উত্তর দিলেন না। মহাভারতের কাহিনীকার ভীষ্মের সেই মুহূর্তের কোন চিন্তাধারার ব্যাখ্যা করেন নি। তবে বুঝেছিলেন, রাজমাতা সত্যবতী ওঁকে কি বলতে চান। ভীষ্ম তাই স্বচ্ছন্দে গান্ধার রাজার কাছে ধৃতরাষ্ট্রের জন্য কন্যা গান্ধারীকে দাবী করে এক পত্র পাঠালেন। ভীষ্মের পত্র পড়ে এবং দূতের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে গান্ধার রাজ মুহূর্তের জন্য থমকে গেলেন। পাত্র "জন্মান্ধ"। এমন এক জন্মান্ধ পাত্রের হাতে তিনি তার স্নেহের দুলালী কন্যাকে তুলে দেবেন কিভাবে? পরক্ষণে আবার মনে হল তার রাজ্য সম্মানের বিচারে হস্তিনাপুরের আভিজাত্যের তুলনায় অত্যন্ত নগন্য। এমন একটা বড় ঘরে বিয়ের প্রস্তাব যখন এসেছে তখন এই প্রস্তাবকে হাতছাড়া করে দুঃসাহস দেখিয়ে কোন লাভ নেই। স্বয়ং ভীষ্মের প্রস্তাব। এই প্রস্তাবকে নাকচ করার সাধ্য তার নেই। তিনি শুনেছেন কিভাবে ভীষ্ম স্বয়ম্বর সভা থেকে কাশীরাজের তিনকন্যাকে হরণ করেছিলেন। সেদিন সভায় উপস্থিত অংগুলো বড় বড় বীর যোদ্ধা একত্রিত হয়েও তাকে বাধা দিতে পারেনি। কাজেই ভীষ্মকে বাধা দেবার ক্ষমতা তার নেই। বরং তার এই প্রস্তাব মেনে নেওয়াই শ্রেয়। হোক পাত্র জন্মান্ধ—তবু হস্তিনাপুরের যুবরাজ বলে কথা। এমন ঘরে বিবাহের সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ পাওয়াতো কম কথা নয়। সবথেকে বড় কথা হল এই সম্পর্ক স্থাপনে মহামতি ভীষ্ম হবেন আত্মীয়। অতএব সাতপাঁচ না ভেবে, মনের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব না রেখে তিনি কন্যার বিবাহ প্রস্তাবে রাজি হলেন। একবারের জন্য তিনি কন্যা গান্ধারীর মতামত নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করলেন না।

বিবাহ স্থির হল। গান্ধারী জানতে পারলেন তার বিবাহ হতে চলেছে। বিবাহের কথা শুনে তার কুমারী অন্তর পুলক চঞ্চল হয়ে ওঠে। এই চঞ্চলতাই তো স্বাভাবিক। মনে মনে তিনি কল্পনায় এক সুদর্শন রাজকুমারকে দেখতে পান। কিন্তু এই আনন্দ চঞ্চলতা বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না যখন গান্ধারী শুনলেন পাত্র সুদর্শন হলেও জন্মান্ধ। "জন্মান্ধ" কথাটা শোনামাত্র গান্ধারীর হৃদয়ে সমস্ত স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন হয়ে

গেল। বিদ্রোহিনী হয়ে উঠলেন ভিতরে ভিতরে। তিনি কন্যা সন্তান বলে তার প্রতি পিতার এত অবহেলা। সমস্ত জেনেশুনে তিনি একজন অন্ধস্বামীর হাতে তাকে সানন্দে তুলে দিচ্ছেন। আত্মধিক্কারে কেঁপে উঠেছিল তার বুক। তবু মুখে তিনি একটিও কথা বললেন না সমস্ত কিছুকে ভবিতব্য বলে মেনে নিয়ে এক অনিশ্চিত জীবনের পথে পা বাড়ালেন গান্ধারী। পিতাকে দোষারোপ করে একটি প্রতিবাদ পর্যন্ত করলেন না। ভাই শকুনির হাত ধরে তিনি গান্ধার রাজ্য ত্যাগ করে হস্তিনাপুরের দিকে যাত্রা করলেন। এই যাত্রা পথে গান্ধারী ঠিক করে নিলেন, তিনিও তার চক্ষুদ্বয়কে বেঁধে রাখবেন। স্বামীর মতো অন্ধত্বে দিন যাপন করবেন। তার স্বামী যখন তাকে দেখতে পাবেন না, তিনিও তেমনি দেখতে চান না স্বামীর মুখ। এরপর থেকে প্রকৃত পক্ষে গান্ধারীকে আমরা কোন সময়ের জন্য চোখ খুলতে দেখিনি। এমন কাজ গান্ধারী কেন করলেন? একি তার মনের একান্ত অভিমান? হতে পারে অভিমান। হয়ত তার মনে হয়েছিল অন্ধস্বামীর অন্ধস্ত্রী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ভাগ্য যখন তাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনের পথে আহ্বান করেছে তখন নিজের দুই চোখ খোলা রেখে পৃথিবীর সুখের আলো দেখা তার পক্ষে মিথ্যে। এই মিথে স্বপ্ন দেখার চাইতে অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকাই শ্রেয়। তিনি আর পৃথিবীর আলো দেখতে চান না। চান না পিতামাতা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন পরিজন কারো মুখদর্শন করতে। মনের চূড়ান্ত অভিমান বশে গান্ধারী যে এমন একটা সিদ্ধান্ত নিজে গ্রহন করেছিলেন হয়ত এটা বলাই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যথেষ্ট বাস্তব সম্মত। মহাভারতের মহাকবি অবশ্য গান্ধারী এহেন আচরণের জন্য ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, গান্ধারী পতিব্রতা নারী। পতিপরায়না বলেই তার পক্ষে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহন করা সম্ভব হয়েছিল। কোন চক্ষুস্মতী নারী যদি তার স্বামীকে অন্ধ দেখে তখন তার মধ্যে স্বামীর প্রতিবন্ধকতার জন্য আত্মঅহংকার জন্মায়। পর পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভবনা থাকে। স্বামীর মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। এই সেই কারণে মনের সমস্ত ইন্দ্রিয় শক্তিকে একত্র করে যাতে তিনি একমাত্র তার স্বামীতেই নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারেন তারই কারণে তার এই স্বেচ্ছা অন্ধত্ব নেওয়া। অর্থাৎ মহাভারতের কবি বলতে

চেয়েছেন গান্ধারীর মধ্যে কোন অভিমান ছিল না। বরং পতিগৃহে এসে তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে সুব্যবহার করেছেন। তার কোন দোষ বা ত্রুটি কখনই কারো নজরে পড়েনি। এমনকি মহাভারতের কবি বলেছেন, গান্ধারী এমন সুব্রতা নারী ছিলেন যে তিনি কোনদিন কোন পুরুষের নাম পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করেন নি। কথাটার মধ্যে কতটা সত্য বা মিথ্যে আছে তা প্রকৃতভাবে যাচাই করার কোন উপায় নেই। কারণ মহাভারতের কবি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে গান্ধারীর মনের নিজস্ব ভাবনাচিন্তাকে এড়িয়ে গেছেন। যা কিছু তার নিজস্ব ভাবনা তাই তিনি চাপিয়ে দিয়েছেন গান্ধারীর বলে—যার সবটুকু বাস্তব দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে যথার্থভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। বরং তার চেয়ে বলা ভাল, গান্ধারী তার নিজস্ব ভাগ্যকে মেনে নিয়েই কুরুরাজবংশে পা বাড়িয়েছিলেন। তার চোখ বেধে রাখার ক্ষেত্রে আধুনিক ব্যাখাকারেরা পতিব্রতার ব্যাপারটা মানতে চাননি। বরং তাদের ধারনায় স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্ব তার উপর যেভাবে নেমে এসেছিল, তাতে তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া গান্ধারীর কোন উপায় ছিল না। এখানে তার মানসিক ধৈর্য্য শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আর ধৃতরাষ্ট্র তিনি দীর্ঘদিন বাদে নিজের মনের কথা কাউকে বলার মতো একজনকে কাছে পেয়ে বারবার তার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে মানসিক ঈর্ষাকে প্রকাশ করেছেন। চেয়েছেন নিজের মনের ঈর্ষার অনলকে গান্ধারীর মধ্যে জাগিয়ে তুলতে। বারবার তিনি গান্ধারীকে অনুযোগের সুরে বলেছেন, আমি অন্ধত্বের কারনে জ্যেষ্ঠপুত্র হওয়া সত্বেও রাজসিংহাসনের অধিকার বঞ্চিত হয়েছি। কিন্তু প্রিয়তমা আমার পুত্র যদি আগে ভূমিষ্ঠ হয় তাহলে পর্যায়ক্রমে সেই হবে হস্তিনাপুরের রাজা। এই কথার ভিতর দিয়েই ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে বোঝাতে চেয়েছেন, অতিসত্বর তার একটি পুত্রের প্রয়োজন। পরম্পরা অনুযায়ী সে যেন জ্যেষ্ঠ পুত্র হয়। ধৃরাষ্ট্রের এই বক্তব্য পরোক্ষভাবে গান্ধারীকে টেনে এনেছিল এক ঈর্ষার পরোক্ষ প্রতিযোগিতার মধ্যে।

গান্ধারী শতপুত্রের জননী হবেন, এই বর তিনি পেয়েছিলেন শিবের আরাধনা করে, এমন একটা কথা আমরা তার বিবাহপর্বে শুনেছি। তবু দেখি তিনি শ্বশুর প্রতিম ব্যাসদেবের কাছ থেকে একই আশীর্বাদ

চাইলেন। আসলে ধৃতরাষ্ট্রের ঈর্ষার অনল মনে হয় গান্ধারীকে গভীরভাবে দগ্ধ করে ছিল, আর এই কারণে পুত্রের আশায় তিনি ব্যাসদেবেব কাছ থেকে একই আর্শীবাদ প্রার্থনা করলেন। অর্থাৎ কোনভাবে যেন তার প্রত্যাশা, তার স্বামীর আকাঙ্খা নষ্ট না হয়। মহাভারতের কথক বলেছেন, ব্যাসদেব একবাব নাকি অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুদার্থ হয়ে গান্ধারীর কাছে যান। গান্ধারী তাকে অত্যন্ত যত্নসহকারে সেবা করেন। তিনি সন্তুষ্ট হয়ে তখন গান্ধারীকে বর দিতে চান। গান্ধারী অন্ধস্বামী ধৃতরাষ্ট্রের কথা মনে রেখেই তার আছে শতপুত্রের বর প্রার্থনা করেন। এখানে বুঝতে একটু অসুবিধে হয় শিবের শতপুত্রের বর তার উপর থাকা সত্বেও গান্ধারী কেন দ্বিতীয়বাব ব্যাসদেবের কাছ থেকে একই বর প্রার্থনা করলেন। তবে কি ধরে নিতে হবে তাব শিবের বব পাওয়ার ঘটনাটা অতিরঞ্জিত, কাল্পনিক মাত্র। মনে হয় প্রকৃত পক্ষে শিবের বর পাওয়াব ঘটনাটা ছিল রটনা মাত্র, সেটাকে সত্যে প্রমান করার জন্যই মনে হয় গান্ধারী ব্যাসদেবেব কাছ থেকে শতপুত্রের বর চেয়েছিলেন। তা না হলে তার মতো বুদ্ধিমতী নারী একই বব ব্যাসদেবের কাছে চাইলেন কেন। আর যদি বা চাইলেন তাহলে তিনি কেন ব্যাসদেবকে বলতে পারলেন না আমাকে এমন সন্তান দিন যে এইবংশের রাজা হতে পারে।,এটাই তো তার চাওযা উচিত ছিল, কারণ তার অন্ধস্বামীতো তার কাছে এই প্রার্থনাই করেছিলেন।

ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, গান্ধারী দু'দুবার শতপুত্রের বর পাওয়া সত্বেও অন্ধস্বামী ধৃতরাষ্ট্রের প্রত্যাশা পুরন হয়নি। যে ঈর্ষার অনল ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিলেন—সেই অনলে দগ্ধ হয়েও গান্ধারী পারেননি তার স্বামীর আকাঙ্খাকে পরিপূর্ণ রূপ দিতে। তার মনবাসনাকে পুরণ করতে। ধৃতরাষ্ট্র ও পান্ডু প্রায় সম-সময়ে বিবাহ করেছিলেন। বিবাহের পর পান্ডু বেশ দীর্ঘসময় কাটিয়েছেন যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে। রাজ্যের সীমানা বাড়িয়েছেন, প্রজাকল্যান করেছেন এবং প্রথমা পত্নী কুন্তীর সন্তান না হওয়ার কারনে দ্বিতীয়বার বিবাহ করছেন মাদ্রীকে। পরে দেখা যায় দৈব ঘটনায় গান্ধারী ও কুন্তী প্রায় একই সঙ্গে প্রায় গর্ভবতী হন। বরং সময় বিচারে গান্ধারী গর্ভবতী হয়েছিলেন

আগে অথচ পরে, গর্ভবতী হয়ে আগে সন্তান প্রসব করেন কুন্তী—এখানেই গান্ধারীর দুর্ভাগ্য। তিনি প্রথম গর্ভধারণ করা সত্বেও সেই গর্ভ সময় অতিক্রম করে যায় তবু সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না। এই দুর্বসহ গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করতে গান্ধারীর ভালো লাগছিল না। তবু তিনি সহ্য করেছিলেন এই যন্ত্রণা, আশা করেছিলেন কুন্তি সন্তান প্রসব করার আগেই তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে। কিন্তু যখন শুনলেন কুন্তীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে সেই পুত্রই হয়েছে এই বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তখন তিনি লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে মিশে গিয়েছিলেন। বারবার তার মনে হয়েছিল, তিনি স্বামী ধৃতরাষ্ট্রকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি তিনি রাখতে পারেন নি। ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা গান্ধারীর জীবনকে অসহ্য করে তুলেছিল।

এই প্রসঙ্গে একটু তোলা থাক, দৃশ্য বদল করে আমরা একটু পিছনে সরে এসে পাণ্ডুর বিবাহ আসরে প্রবেশ করি।

যদু মহারাজ শূরের কন্যা হলেন পৃথা। মহারাজাশূর নিসন্তান কুন্তীভোজ রাজাকে তার কন্যা সন্তানটিকে দান করেন। আসলে তখনকার দিনে কন্যাসন্তান ছিল রাজপরিবারের কাছে অবাঞ্ছিত। ফলে কন্যাসন্তান হলে অনেকেই সেই সন্তান নিঃসন্তান কোন বন্ধুবান্ধবকে দান করতেন, যেমন মৎস্যরাজ বসু রাজার ক্ষেত্রে ঘটেছিল। তার কন্যা রত্নটি দাসরাজাকে দান করেছিলেন। নিঃসন্তান কুন্তীভোজ রাজ শুররাজের ওই কন্যাকে পিতা হিসাবে পালন করলেন। রাজ্যের নামানুসারে নাম দিলেন কুন্তী। অসাধারণ রূপবতী ছিলেন এই কন্যা। তিনি দিনে দিনে দ্বিতীয় চন্দ্রকালার মতো বাড়তে লাগলেন। তার সৌন্দর্যের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ছোটবেলা থেকেই কুন্তী ছিলেন অত্যন্ত অতিথি পরায়ণ। একবার এই অবস্থায় হঠাৎ কুন্তীভোজ রাজ্যে এসে উপস্থিত হলেন মহামুনি দুর্বাসা। তাকে সেবার দায়িত্ব ভার পড়লো কিশোরী কুন্তীর উপর। এই মহামুনি দুর্বাসা ছিলেন মহাতেজী। তিনি শিবের অংশে জন্মেছিলেন। অত্যন্ত রাগী বলে সকলে তাকে এড়িয়ে চলতে ভালোবাসতেন। দুর্বাসার আগমনে কুন্তীভোজ রাজ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করলেন, শেষে অনেক ভাবনা চিন্তা করে কুন্তীকেই

তিনি নিয়োগ করলেন অতিথি সেবায়। দুর্বাসার এই আগমন অনর্থক ছিল না। তিনি কুন্তী ভোজরাজার দত্তক কন্যা কুন্তীর রূপের কথা শুনেছিলেন, আসলে তাকে দেখা এবং তার সেবা পাওয়াই ছিল দুর্বাসার উদ্দেশ্য। যদি তা না হবে তাহলে দুর্বাসা হঠাৎ করে এতরাজ্য থাকতে কুন্তীভোজ রাজ্যে এলেন কেন? আর কেনই বা একবৎসর কাল সেখানে অকারণে বাস করলেন? মহাভারতের কাহিনী মতে, দুর্বাসা কুন্তীর সেবায সন্তুষ্ট হয়ে তাকে একমহামন্ত্র দান করেন, যে মন্ত্র বলে যে কোন দেবতাকে আহ্বান করে পুত্রবতী হওয়া যায। শোনা যায় বালিকা কুন্তী এই মন্ত্র পাওয়ার পর নেহাতি কৌতুহল বশে সূর্যদেবকে আহ্বান করেন। সূর্যদেব উপস্থিত হলে কুন্তী অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। কুন্তীকে ভীত হতে দেখে সূর্যদেব বললেন, দেখ কন্যা তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ। তুমি আনন্দ চিতে আমার ভোগাভিলাষ পূর্ণ কর। তোমার ভয় নেই আমি তোমার কুমারীত্বহরণ করবো না। আমার আশীর্বাদে তোমার কুমারীত্ব যথার্থভাবে বর্তমান থাকবে—ঠিক যেমনটি পরাশর সত্যবতীকে বলে ছিলেন, ঠিক একই ভাষা এখানে সূর্যদেবের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল। কুন্তী তবুও কুণ্ঠিত হওয়ায় সূর্যদেব বললেন, তুমি আমায আহ্বান করেছ বলেই আমি তোমার সম্মুখে এসেছি। এখন যদি তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান কর তাহলে তোমার বরদাতা ব্রাহ্মণ দুর্বাসা এবং তোমার পিতৃকুল উভয়ই সমুলে বিনষ্ট হবে।

কিন্তু এবার দোটানায় পড়লেন। এতো রিতিমতো নারী ভোগের জন্য দুবৃর্ত্তের শাসানি। অবলা কুন্তী অনুনয় করে বললেন—কিন্তু দেব এতে সকলে যে আমাকে কলঙ্কিনী বলবে? সূর্যদেব বললেন—আমি পুনরায় বলছি আমার আশীর্বাদে তোমার কোন দোষ হবে না। তোমার কুমারীত্ব বর্তমান থাকবে।

অগত্যা কুন্তী সম্মত হলেন। তাদের এই সহবাসের ফলে কুন্তী গর্ভবতী হলেন এবং সর্বশাস্ত্রবেত্তা, কবচকুন্ডলধারী, পরম রূপবান এক সন্তান প্রশব করলেন। এই পুত্রই হলেন কর্ণ। ভগবান সূর্যদেব সন্তুষ্ট হয়ে কুন্তীকে কন্যাত্ব প্রদান করে অদৃশ্য হলেন।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কুন্তী সেই পুত্রকে আত্মপাপ গোপন করার উদ্দেশ্যে জলে ভাসিয়ে দিলেন। আসলে কুন্তী এই সদ্যজাত পুত্র

সন্তানকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্য তাকে দায়মুক্ত হতে দেয়নি। আসলে এই সন্তানতো সাধারণ কোন মানুষের সন্তান নয়। জলে ভাসিয়েদিলেই কি তার জীবন ভেসে যাবে। প্রতিটি জন্মের পিছনে একটা না একটা কারণ নির্দিষ্ট থাকে। এইক্ষেত্রেও সেই কারণ চিহ্নিত ছিল বলেই মহাভারতের কাহিনীকার আবার সেই পুত্রকে কুন্তীর সামনে এনেছিলেন হস্তিনাপুরের কুমারদের অস্ত্র পরীক্ষার দিনে। পরিচয় তিনি অধিরথের পুত্র। থাক এখন কুন্তী ও কর্নের কাহিনীর কথা। ফিরে আমি পূর্ব প্রসঙ্গে। কর্নের জন্ম সম্পর্কে মহাভাবতের কাহিনীকার যে ভাবেই ব্যাখা করুন না কেন সাধারণ দৃষ্টিতে কর্ণের জন্ম পর্যালোচনা করলে মনে হয় কর্ণ হলেন রুদ্ররূপ দুর্বাসার পুত্র। কারন দুবাসা কুন্তীভোজ রাজ্যে দীর্ঘদিন ছিলেন, কুন্তী তার সেবা করেছিলেন। তার রূপ, যৌবন যে দুর্বাসাকে আকৃষ্ট করে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। মহামুনি পরাশর যদি এক লহমায় সত্যবতীকে দেখে কামাসক্ত হতে পারেন, পুত্র বাসনায় অধীর হতে পারনে, তাহলে দীর্ঘ সঙ্গলাভের ফলে কুন্তীর সঙ্গে দুর্বাসার দেহমিলন এমন কিছু অমুলক ঘটনা বলে মনে হয় না। বরং বলা যায় এটাই স্বাভাবিক। মহামুনি বলেই সেদিন দুর্বাসার তেজে কর্ণের মতো সন্তান তার গর্ভে জন্মেছিল—তা না হলে স্বাভাবিকভাবে অন্য কোন পুরুষের সঙ্গ করলে কুন্তী হয়ত সন্তানবতী হতেন না। মহামুনী দুর্বাসা বুঝেছিলেন, এই কন্যার রূপ থাকলেও গর্ভধারনের ক্ষমতা নেই, আর হয়ত সেই কারণে তিনি ভবির্য্যতের কথা ভেবে কুন্তীকে ওই মহামন্ত্র দান করেছিলেন, যাতে ভবির্য্যতে মহারাজ পান্ডুর বংশ বৃদ্ধি পায়। দেবতার অংশে সমস্ত দোষ কাটিয়ে জন্মাতে পারেন কুন্তীর পুত্ররা। আসলে মহামুনি ও মহাঋষিরা তখনকার দিনে ছিলেন প্রখর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। ভবির্য্যতকে তারা স্পষ্ট দেখতে পেতেন। হয়ত সেদিন দুর্বাসাও কুন্তীর মধ্যে এমন কিছু দোষ দেখেছিলেন, যাতে কুন্তী সেই শারীরিক দোষগুলিকে খণ্ডন করে সন্তান দিতে পারেন, তারই জন্য তিনি ওই মহামন্ত্র কুন্তিকে দান করেছিলেন। তবে এইক্ষেত্রে মহাভারতের কবি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে দুর্বাসার কেন কেচ্ছকেত্তন না করে গোটা ব্যাপারটা চাপিয়ে দিয়েছিলেন সূর্যদেবের উপর। আসলে মনে হয় মহাকাব্যের কবি চাননি তার

পরমপিতা পরাশরের মতো মুনি দুর্বাসা একই নিয়মে তাকে অতিক্রম করে যান। পরাশর একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মুনি, তিনি যা করতে পারেন তা অন্য কেউ একই নিয়মে একইভাবে করুক মনে হয় এটা তার ইচ্ছে ছিল না। মুনি শ্রেষ্ঠ পরাশর কুমারী সত্যবতীর সঙ্গে রতি মিলনেব পর সন্তানভূমিষ্ট শেযে তাকে কুমারীত্ব দান করেছিলেন—দুর্বাসাও ঠিক একই নিয়মে একই ধারায় কুন্তীকে সন্তান ভূমিষ্ঠের পর কুমারীত্ব দান করুণ এটা তিনি বরদাস্ত করেন নি। পরাশরের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে তাই মহাভারতের কাহিনীকার কর্ণের জন্ম লাভের দায়ভার চাপিয়ে দিয়েছিলেন সূর্যের উপর। সূর্যদেব একজন ক্ষমতাবান বৈদিক দেবতা। কাজেই তিনি পরাশর তুল্য কাজ করতে পারেন—দুর্বাসা নয়, এটা বোঝাবার জন্যই কাহিনীকার এত আড়ম্বর করেছেন। অহেতুক টেনে এনেছেন সূর্যদেবকে।

কুমারী কুন্তীর এই ক্ষণ মিলনের কাহিনী সত্যবতীর মতোই লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল। কেউই জানতেন না কুন্তী কুমারী অবস্থায় এক পুত্র সন্তান প্রসব করেছেন। যদি জানা থাকতো তাহলে নিশ্চয় বিভিন্ন দেশের রাজারা কুন্তীর প্রনয় প্রার্থী হতেন না, এমনকি কুন্তীভোজ রাজার পক্ষে সম্ভব হতো না ঢাক ঢোল পিটিয়ে ঘটা করে স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করার।

কুন্তীর স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিত ছিলেন মহারাজ পাণ্ডু। ভীষ্মের আশীর্বাদ নিয়েই তিনি এই স্বয়ম্বর সভায় এসেছিলেন। উপস্থিত অসংখ্য রাজার মধ্যে কুন্তীভোজ রাজকন্যা কুন্তী মহারাজ পাণ্ডুর কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন বরমাল্য।

এই খবর হস্তিনাপুরে আসামাত্র হস্তিনাপুরে জয়ধ্বনি উঠলো। ঘরে ঘরে জ্বলে আলো আলো। উৎসবের বন্যা বয়ে গেল। কুরুকুলপ্রদীপ মহীপতি পাণ্ডু ধ্বজপতাকাশালিনী মহতি পতকিনীসমভিব্যাহারে মহর্ষিগণ ও দ্বিজগণের আর্শীবাদ গ্রহণ করে, মহামতি ভীষ্মের আহ্বানে সদ্যবিবাহিতা পত্নী সহ স্বপুরে প্রবেশ করলেন।

সাজানো হল রাজধানী, ফুলশয্যায় সুসজ্জিত হল পাণ্ডুভবন। যথাসময়ে ভীষ্মের সঙ্গে পত্নীসহ রাজপ্রাঙ্গনে এসে প্রবেশ করলেন পাণ্ডু। রাজামাতা সত্যবতী নববধুকে বরণ করে ঘরে তুললেন। দুরে দাঁড়িয়ে

ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী এরা কেউই দেখতে পেলেন না কুন্তীকে। শুধু শুনলেন কন্যা অসম্ভব রূপবতী, ঈর্ষার অনল ধৃতরাষ্ট্রের তীব্র হয়ে উঠলো। এই প্রথম তার মাথায় চিন্তা এলো, পাণ্ডু সন্তান জন্মের অধিকার পেয়েছে। সে'ও তার মতো পিতা হতে পারে। মনের গভীরে যে ঈর্ষা একদিন সুপ্ত অবস্থায় ছিল, সেই ঈর্ষা জাগরিত হল। তিনি গান্ধারীকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, শোন প্রিয়া আমি সত্বর সন্তানের পিতা হতে চাই। আমি চাই আমার পুত্র যেন এই বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপে ভূমিষ্ঠ হয়। ধৃতরাষ্ট্রে অনুরোধের ফলে গান্ধারীর মধ্যেও সেই ঈর্ষা ও হিংসার কিছু ভাগ এসে পড়েছিল। স্বামীর অন্ধত্বের কারনে তিনি রাজরানী হতে পারেননি। তাকে অত্যন্ত রাজমাতা হতে হবে। নচেৎ এই রাজপুরীতে বাস করা হবে তার পক্ষে নিরর্থক। মনের এই গোপন হিংসাকে চরিতার্থ করার কারণেই তিনি মা হওয়ার বাসনাকে ফলবতী করার জন্য ব্যসদেবের কাছে শতপুত্রের জননী হওয়ার আর্শীবাদ প্রার্থনা করেছিলেন।

মহাভারতের কাহিনীকার গান্ধারীকে সতী-সাবিত্রী বলে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ধৃতরাষ্ট্রের নীচ মানসিকতা তাকে কোনভাবে স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু এসব হলো মুখের কথা। বাত্ কি বাত্। কারণ পরবর্তী পর্যায়ে আমরা গান্ধারীর যে আচরণ দেখেছি তাতে তাকে একবারের জন্য সতীলক্ষী পবিত্র সর্বশুভাকাঙ্খী নারী বলে মনে হয়নি। ধৃতরাষ্ট্রের মতো ঈর্ষার তীব্রতা তার মধ্যে না থাকলেও কিঞ্চিত যে হীনতা তার মধ্যে ছিল তা আমরা দেখতে পাই। হয়ত অনেকে বলবেন, অন্ধ স্বামীর কারণেই তারমধ্যে এই হীনমন্যতা কাজ করেছিল। তাছাড়া একথাতো সত্যি তিনি জ্যেষ্ঠপুত্রের ভার্যা হওয়া সত্বেও রাজরানীর মর্যাদা পাননি বরং সদ্যবিবাহিতা কুন্তী অনেকবেশী মর্যাদা পেতেন সকলের কাছে। আর এই কারণে হয়ত গান্ধারী কুন্তীকে এড়িয়ে চলতেন। মহাভারতে কোথাও আমরা দেখিনি দুই ভাতৃবধুকে একত্রে থেকে পরম প্রিয় সখীর মতো পরস্পরের সঙ্গে গল্পো করেছেন। বরং দেখেছি কুন্তীর সঙ্গে গান্ধারীর সর্বত্র ব্যবধান।

এদিকে বছর ঘুরে যায় পুত্র লাভের সম্ভবনা কারো মধ্যে দেখা

যায় না। মহাচিন্তায় পড়ে গেলেন কুরুবংশের অভিভাবক মহামতি ভীষ্ম। হাজার হোক তিনি হলেন এই বংশের রক্ষক এবং সুহৃদ অভিভাবক। অতএব তার কিছু দায়বদ্ধতা নিশ্চয় আছে। ধৃতরাষ্ট্রের জন্য দ্বিতীয় কোন রাজকুমারী পাওয়া যাবে না, কিন্তু চেষ্টা করলে পান্ডুর দ্বিতীয়বার বিবাহ সম্ভব। কেন জানি না ভীষ্মের হয়ত মনে হয়েছিল কুন্তী সুন্দরী হলেও প্রকৃতপক্ষে সন্তান ধারনের ক্ষমতা তার নেই। কুন্তীর কারনেই পান্ডু সন্তান লাভে বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ ভীষ্মের মতো একজন প্রজ্ঞ ব্যক্তি একবারের জন্য ভেবে দেখেলেন না সন্তান না হওয়ার জন্য প্রকৃত পক্ষে দোষী কে? পান্ডু নাকি কুন্তী? বরং বিবাহের পর থেকে ভীষ্মের পান্ডুকে কেমন যেন অন্যরকম বলে মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল পান্ডু ধীরে ধীরে অনেক বদলে যাচ্ছে। তার সংসারের প্রতি কোন মোহ নেই, কোন আকর্ষন নেই। দিনরাত তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ তার শিকার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। সংসারে মন বসেনি। তবে কি কুন্তীর সঙ্গে তার কোন মানসিক বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়েছে। মানসিক বিচ্ছেদ ঘটে থাকলে শারীরিক মিলনতো সফল হতে পারে না। মহামান্য ভীষ্ম চিন্তায় পড়লেন। দেখা করলেন রাজমাতার সঙ্গে। আলোচনা হল। রাজমাতা সত্যবতীও এই ব্যাপারে চিন্তিত। তিনি ভরত-কুরুবংশের ধারাবহিকতাকে দেখে যেতে চান, তারই জন্য তিনি ধৃতরাষ্ট্র ও পান্ডুর এত দ্রুত বিবাহ দিলেন। অথচ সময় পার হয়ে যাওয়া সত্বেও গান্ধারী বা কুন্তী কেউ গর্ভবতী হলেন না। একই কথা বললেন সত্যবতী, তার কথা অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বললেন, একজন অন্ধযুবরাজের জন্য দ্বিতীয় কোন মেয়ের ভাগ্য আমি নষ্ট করতে চাই না, তাছাড়া বিবাহের সময় শুনেছি গান্ধারী শিবের বর প্রাপ্ত হয়েছে, আশাকরি সে নিশ্চিত পুত্রবতী হবে। কিন্তু পান্ডু, তারতো দ্বিতীয় বার বিবাহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ভীষ্ম বললেন, পান্ডুর সংসারে প্রতি মন নেই, রাজকার্যও সে ঠিক মতন করছে না। দিনরাত যুদ্ধবিগ্রহ আর শিকার নিয়ে ব্যস্ত আছে। আমার মনে হয় তার দ্বিতীয়বার বিবাহের ব্যবস্থা করাই বাঞ্চনীয়। সত্যবতী বললেন—আমার কোন আপত্তি নেই। তুমি যা ভালো হয় তাই কর।

পান্ডুর দ্বিতীয় বিবাহ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। দোষ পড়ল কুন্তীর উপর। একবারের জন্য তারা পান্ডু যে সন্তান উৎপাদনে অক্ষম

এই কথাটা মনে করলেন না। পাণ্ডুতো কুন্তীকে এড়িয়ে চলেন। আসলে পাণ্ডু নিজে জানতেন যে তার সন্তান সৃষ্টির ক্ষমতা নেই। অথচ এক বারের জন্য তিনি সে কথা কাউকে মুখ ফুটে বললেন না। আসলে পুরুষ শাসিত সমাজে কোন পুরুষ চায় না নিজের অক্ষমতাকে প্রকাশ করতে। সব দোষ হয় নারীর। এই ক্ষেত্রে এই অভিযোগ একাবারে মিথ্যে ছিল না। মহামুনি দুর্বাসা কুন্তীর এই অক্ষমতার কথা জানতেন বলেই তাকে সন্তান উৎপাদনের মন্ত্র শিখিয়েছিলেন। তার এই অক্ষমতা একমাত্র দেবশক্তির দ্বারাই খণ্ডিত হতে পারে। আবার অনেকের ধারণা, দুর্বাসা তার ভাগ্যগতিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই তিনি কুন্তীকে ওই মহামন্ত্র দান করেছিলেন যাতে তিনি পুত্রবতী হতে পারেন। কিন্তু এই কথা কুন্তী কাকে বলবেন। অতএব নীরবে তাকে মনবেদনা সহ্য করতে হল। ভীষ্ম পাণ্ডুর দ্বিতীয় বিবাহের জন্য তোড়জোড় করতে লাগলেন। ফলে মহাভারতের কাহিনীকার সৃষ্টি করলেন মাদ্রী চরিত্রকে। অথচ এই চরিত্রটিব জন্য কাহিনীকার অকারণ উচ্ছ্বাসে একটি অতিরিক্ত শব্দ পর্যন্ত ব্যয় করেন নি। স্বল্প পরিসরের এই চরিত্রটিকে অনেকে অনাবশ্যক বলে মনে কবেন। কোন প্রযোজন ছিল না মাদ্রীর সঙ্গে পাণ্ডুর জীবন যোগ করে কুন্তীকে খানিকটা অপ্রস্তুত করা। অবশ্য এটা প্রাথমিক দৃষ্টি ভঙ্গি। আমরা যদি মহাভারতের গূঢ়তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করি তাহলে বলবো, কোন চরিত্র এই কাব্যে অনাবশ্যক নয়। কাহিনী বিন্যাসে প্রতিটি চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা ছিল। স্বল্প পরিসরের মধ্যে মাদ্রীর আবির্ভাব এবং তার মৃত্যু এই দুই ঘটনাকেই মহাভারতের কবি অত্যন্ত সামঞ্জস্য বজায় রেখে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। মাদ্রীর প্রয়োজন কোথায়—সেটা বলতে গেলে বলতে হয় পাণ্ডুর মৃত্যু। এই চরিত্রটি না থাকলে পাণ্ডুর মৃত্যু সম্ভব হত না। আর যদি পাণ্ডুর মৃত্যু না হত, যদি তিনি বেঁচে থাকতেন তাহলে তাকে আপন ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্রগণের সঙ্গে ঘরোয়া যুদ্ধে নেমে পড়তে হত, যেটা আদৌ সুখকর বা সুখ পাঠ্য হত না।

পাণ্ডুর প্রথমা পত্নী অপেক্ষা দ্বিতীয় পত্নী মাদ্রী ছিলেন প্রকৃত সুন্দরী। তার রূপ মাদকতায় রাজা পাণ্ডু যে অতিমাত্রায় মোহগ্রস্থ ছিলেন, এটা তার মৃত্যু পর্যালোচনা করলেই সহজে বোঝা যায়। আর এটাও বোঝা

যায় মহাভারতের কবি মাদ্রীকে রঙ্গমঞ্চে নিয়ে এসেছিলেন কেবল মাত্র পাণ্ডুর মৃত্যুর কারণে। পরে তিনি মাদ্রীকে সহমরণে পাঠিয়ে তার গায়ে পতিব্রতানারীর তক্‌মা এঁটে দিয়ে তাকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন।

আশ্চর্য চরিত্র এই রাজা-পাণ্ডুর। অবাক হয়ে ভাবতে হয় একজন পুরুষ হয়ে তিনি সন্তান উৎপাদনে অক্ষম একথা জানা সত্বেও কুন্তীকে অবমাননা করে তিনি দ্বিতীয়বার দ্বারপরিগ্রহ করলেন কিভাবে? একজন নারীকে না হয় আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে বিপন্ন করা যায়, তাবলে একই কারণে তিনি দুটি নারীর জীবন নষ্ট করবেন এই কথা কিছুতেই মানা যায় না। বরং তারতো উচিত ছিল দ্বিতীয় বিবাহের উদ্যোগ নেবার সময় সরাসরি ভীষ্মকে বাধা দেওয়া। পাণ্ডু একবারও বলেন নি তিনি বিবাহ করবেন না। বরং নীরবতা পালন করে ভীষ্মকে দ্বিতীয় বিবাহের উদ্যোগে অনুপ্রানিত করেছিলেন। এটাতো সত্যি নয় বা কিছুতেই মানা যায় না যে তাকে কিছু না জানিয়ে ভীষ্ম বিবাহের দিনস্থির করেছেন। বিচিত্রবীর্যের বিবাহের পর থেকে ভীষ্ম এই ব্যাপারে অত্যন্ত সর্তক হয়ে পড়েছিলেন। তিনি চাননি পরবর্তী পর্যায়ে তার কারণে কোন অশান্তি তৈরী হোক, আর সেই অশান্তির দায় ভাগ কাঁধে নিয়ে তাকে জীবনভোর যন্ত্রনা সহ্য করতে হোক। এক অম্বার ঘটনাই তার জীবনকে কলঙ্কিত করেছে। সেই গভীর ক্ষত তাকে বহন করে নিয়ে যেতে হচ্ছে এখনও। ভাবতে গিয়ে অম্বার মুখ যতবার মনে পড়ে ততোবারই বিষন্ন হয়ে যান ভীষ্ম। ওই দুরহ স্মৃতি চট করে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।

ভীষ্ম পাণ্ডুর দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য উদ্যোগে নিয়ে চারদিকে লোকপাঠালেন। অর্থাৎ এখনকার দিনের বিচারে বলা যায় ভীষ্ম পাণ্ডুর বিবাহের জন্য একাধীক ঘটক লাগলেন। এই ঘটক মারফৎ খবর পেলেন মদ্র দেশের রাজার এক বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। কন্যা অসম্ভব রূপবতী। দেশের নামানুসারে কন্যার নাম মাদ্রী। মাদ্রীর পিতা দেহ রেখেছেন বটে, তবে তার ভ্রাতা শল্যদেব হলেন বর্ত্তমান অভিভাবক। তিনি তার ভগিনীর বিবাহের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে আছেন। এই খবর পেয়ে ভীষ্ম সদলবলে মদ্র রাজ্যে যাত্রা করলেন। সঙ্গে নিলেন অসংখ্য সৈন্য ও অনুচর। মনের দিক দিয়ে তিনি আর কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব রাখতে রাজি নন। বিচিত্রবীর্যের বিবাহের সময় তিনি

একাই গিয়েছিলেন। এখন আর মনে সেই বল নেই—অম্বার ঘটনা ভীষ্মকে এখন সংযত করে দিয়েছে। এই কারণে সঙ্গে এত লোকজন এবং বিজ্ঞ ব্রাহ্মনদের নেওয়া, যাতে কোনরকম কিছু অমঙ্গল না ঘটে। এবার একার বুদ্ধিতে কোন কাজ নয়, যা কিছু করতে হবে আলোচনার ভিত্তিতে।

শল্যরাজ ভীষ্মের আগমন বার্ত্তা শুনে নিজেই এগিয়ে এলেন, সাদর সম্ভাষণে নিয়ে গেলেন রাজগৃহে। একজন অভিজাত রাজপুরুষকে যে ভাবে সন্মান দেখানো উচিত তার চেয়ে অনেক বেশী শিষ্ঠাচার প্রদর্শন করলেন শল্যরাজ। ভীষ্ম মদ্ররাজ শল্যের ব্যবহারে খুশী হলেন।

শুরু হল আলোচনা। মদ্ররাজ জানতে চাইলেন ভীষ্মের কাছে, কি কারনে তিনি এখানে এসেছেন। উত্তরে ভীষ্ম বললেন, শুনেছি তোমার এক পরমরূপবতী ভগিনী আছে, আমি তার সঙ্গে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুর বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আশাকরি এই বিবাহে তোমার কোন আপত্তি নেই। মদ্ররাজ শল্য অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। এতো হাতে চাঁদ পাওয়া। অপ্রত্যাশিত এই অভাবনীয় যোগাযোগ। এই প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করা নেহাতি বোকামো, তাই শল্যরাজ অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন—এতো আমার পরম সৌভাগ্য। কুরুবংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন অত্যন্ত মর্যাদার ব্যাপার। এই প্রস্তাবে অমতের কোন কারণ নেই।

মদ্ররাজ শল্যের আপত্তি না থাকায় ভীষ্ম একবার মাদ্রীকে দেখতে চাইলেন। অতি নম্র ও সুন্দরী মাদ্রীকে দেখে ভীষ্মের মন ভরে গেল। আহা! রূপতো নয় যেন এক সাক্ষাৎ দেবী প্রতিমা। আসলে এই মদ্র রাজ্যের মেয়েরা সাধারণত রূপবতী হয়ে থাকে। অঞ্চলটা ভারতের উত্তরে—বলা যায় জম্মু-কাশ্মীর অঞ্চল, যে অঞ্চল পশ্চিম পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দীর্ঘাঙ্গী, সুঠাম গড়নের মাদ্রীর রক্তিম গৌরবর্ণে ছিলেন সমাচ্ছন্না। তার দুই চোখের চাউনিতে ছিল এক সুগভীর আবেশ। এই রূপকে একবার প্রত্যক্ষ করলে সহজে চোখ ফেরানো যায় না। মনে মনে মাদ্রীর রূপ দেখে খুশী হলেন বিচক্ষণ কুরুতিলক ভীষ্ম। তার মনে হল এই নারী হল পাণ্ডুর একমাত্র উপযুক্তা। একে সহধর্মিনী হিসাবে পেলে পাণ্ডুর মনের বিষন্নতা অবশ্যই দুর হবে, সংসারে মন বসবে।

ভীষ্ম সম্মত হলে শল্যবাজ বললেন, বিবাহের ক্ষেত্রে আমাদের নিযম আছে।

—বল কি তোমাদের নিয়ম, তবে আমি যতদুর জানি তোমাদের পূর্বপুরুষদের নিয়ম অনুযায়ী কন্যাকে ক্রয় করতে হয়। বল আমাকে কত রত্ন দিয়ে তোমার ভগিনীকে ক্রয় করতে হবে। শল্যরাজ বললেন—সে আপনার বিবেচনা।

ভীষ্ম প্রচুর ধনরত্ন মদ্ররাজকে দিয়ে মাদ্রীকে গ্রহণ করলেন। তারপর এক শুভদিন দেখে মাদ্রীর সঙ্গে পাণ্ডুর বিবাহ সুসম্পন্ন হল। এতবড় ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্বেও কুন্তী কিন্তু একটিও কথা বললেন না। দেখালেন না কোনবকম বিষন্নতা, বরং নারী জীবনের এই দুঃসহ যন্ত্রনাকে নীরবে বুকে লালন করে হাসি মুখে তিনি সতীন মাদ্রীকে কাছে টেনে নিলেন। মাদ্রী বরং একটু আত্মঅহংকারী ও অভিমানী ছিলেন। তুলনায় কুন্তী ছিলেন অনেক সহজ।

ভীষ্ম এবং বাজমাতা সত্যবতী উভয়েই আশা করেছিলেন মাদ্রী হয়ত অচিবেই গর্ভবতী হবেন। কিন্তু কোথায়? পাণ্ডুর মধ্যে তো কোনরকম পবিবর্ত্তন দেখা গেল না। ঘরে দু'দুজন স্ত্রী বর্ত্তমান থাকতে পাণ্ডু আদৌ ঘরমুখী হলেন না। বরং বেড়ে গেল রাজ্যজয়ের নেশা। তিনি রাজ্য সীমানা বাড়াবার উদ্দেশ্যে একে একে জয় করলেন মগধ, বিদেহ, কাঞ্চী প্রভৃতি রাজ্য। ভীষ্মের অবাক লাগলো। এমনটি তো তিনি চাননি—তিনি চেয়েছিলেন পাণ্ডুকে সংসারী করতে। কুরুবংশের বৃদ্ধির কারণেই তাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দেওয়া, অথচ গৃহের প্রতি কোন মনযোগ তার নেই। আসলে পাণ্ডুতো নিজেই জানেন কেন তিনি গৃহে থাকতে চান না। সন্তানের জন্ম দেবার ক্ষমতা তার নেই। আগে শুধু কুন্তী ছিল, তাকে বন্ধ্যা বলে চালিয়ে দেওয়া গেছে কিন্তু মাদ্রী তাকে তিনি উপেক্ষা করবেন কিভাবে।

রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে পরিশ্রান্ত পাণ্ডু ঘরে ফিরলেন। এবার তার মধ্যে দেখা গেল এক অন্যধরনের নৈরাশ্য ও বৈরাগ্য চেতনা। কিসের নৈরাশ্য, কেনই বা বৈরাগ্য কিছুই বোঝা গেল না। কোথায় দিগ্বিজয়ের পর আনন্দে ঘর সংসারে মন দেবেন তা না তিনি হঠাৎ করে বনবিহারে যাবেন বলে স্থির করলেন।

পাভুর বনবিহারের বাসনার কথা শুনে কুন্তী কিন্তু তার স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি পরিস্কার ভাবে পাভুকে বললেন, শোন আমিও মাদ্রী তোমার সহধর্মিনী, তুমি যদি বনগমন কর তাহলে আমরা এই রাজপুরীতে কার ভরসায় থাকবো। আমার ইচ্ছে তোমার প্রথমা পত্নী হিসাবে আমি তোমার সঙ্গে বনগমন করি। স্বামী ছাড়া স্ত্রীর কোন মূল্য সংসারে নেই, আর কেউ তার মুল্য দেয় না। মাদ্রীও এই ক্ষেত্রে কুন্তীর সঙ্গে সহমত পোষণ করলেন। ফলে কিছুটা অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে গেলেন রাজা পাভু। দুই সহধর্মিনীদের চাপে পড়ে তাদের দুজন'কে সঙ্গে নিতে বাধ্য হলেন।

পাভু বনগমন করলে বাধ্য হয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বসানো অন্তবর্তী সম্রাট হিসাবে। রাজসিংহাসনে বসে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে ভাগ্যদেবীর উদ্দেশ্যে সহস্র প্রণাম জানালেন। এইভাবে যে তিনি রাজসিংহাসনের মালিক হবেন এতো তার কল্পনার মধ্যেও ছিল না। হঠাৎ আনন্দে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র পাভুর প্রতি উদার হয়ে পড়লেন। ভ্রাতার বিরহে তার গন্ডদেশ বেয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রুও ঝরে পড়তে দেখা গেল।

কাহিনী এগিয়ে যায় নিঃশব্দে। তখনও পর্যন্ত রাজা নিজের অক্ষমতার কথা কুন্তী বা মাদ্রী কারো কাছে প্রকাশ করেননি। তার ব্যক্তিগত সমস্যা তখনও তার কাছে চরম রূপ নেয়নি। হস্তিনাপুরের সঙ্গে তার যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। বিদুর প্রায়ই আসতেন পাভুর আস্তানায়। তার কোনরকম যাতে অসুবিধে না হয় সেদিকে বিদুরকে লক্ষ্য করতে বলেছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। ভীষ্ম মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। সত্যি কি ভরত-কুরু বংশের ধারা অবরুদ্ধ হয়ে যাবে, লুপ্ত হবে এতবড় একটা সাম্রাজ্য। বনে এসে পাভু ব্রহ্মচারী মতো দিন যাপন করতে লাগলেন। ব্যাপারটা পাভুর আত্মরক্ষার পক্ষে এই পর্যন্ত যথেষ্ট অনুকুল ছিল। কেউ কোন সন্দেহ প্রকাশ করে নি। পাভুও ভেবেছিলেন এইভাবে তার ব্যক্তিগত সমস্যাকে দুই স্ত্রীর কাছে গোপন রাখতে পারবেন। কিন্তু সমস্যা তীব্র আকার নিলো যখন তিনি শুনলেন গান্ধারী গর্ভবতী হয়েছেন। খবরটা শুনে মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলেন রাজা পাভু। তিনি তো জানেন তার নিজের পুত্র উৎপাদনের ক্ষমতা নেই—তাহলে তার বংশধারা রক্ষিত হবে কিভাবে?

কিভাবে তিনি পরম্পরার মধ্যে বেঁচে থাকবেন? কিভাবে তিনি কুন্তী ও মাদ্রীকে বলবেন তার অক্ষমতার কথা। স্বামী হয়ে স্ত্রীর কাছে কেমন করে স্বীকার করবেন, তিনি সন্তানের জন্ম দিতে অক্ষম এক পুরুষ। পুরুষ শাসিত সমাজ বলেই মহাভারতের কাহিনীকার চমৎকার একটা গপ্পো ফেঁদে এই কঠিন সমস্যা থেকে উদ্ধার করেছেন পাণ্ডুকে। যদি কাহিনীকার এই উপকাহিনীটিকে সংযুক্ত না করতেন তাহলে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারতেন না মহারাজ পাণ্ডু—তার চাইতেও আরও বেশী কলঙ্কিত হতেন স্বয়ং ব্যাসদেব। তিনিতো তারই ঔরসজাত পুত্র। তার বীজেই পাণ্ডুর জন্ম, সেই পাণ্ডু কিনা প্রজনন অক্ষম পুরুষ। ছিঃ এমন কথা কি বলা যায়। অতএব পাণ্ডুকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ে আসা হল মৃগমুনীর অভিশাপ ব্যঞ্জনা। মৃগরূপ ধারণ করে কিমিন্দম্ মুনি একদিন মহাঅরণ্যের মধ্যে মৃগীরূপী স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত ছিলেন, তখন অত্যন্ত অবিবেচকের মতো পাণ্ডু নাকি তাকে শরবিদ্ধ করেন। শরবিদ্ধ মুনি নিজরূপ ধারন করে পাণ্ডুকে অভিশাপ দিয়ে বলেন, তুমি ব্রহ্ম হত্যার পাপ করেছ। এই পাপের ফলে তুমি কামাবশে তোমার পত্নীকে স্পর্শ করা মাত্র তোমার মৃত্যু হবে। এই অভিশাপ দিয়েই তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

মহাভারতের কাহিনীকারকে অবশ্যই তারিফ করতে হয় এমন একটা উপকাহিনী খাড়া করার জন্য—এতে পাণ্ডু সাময়িকভাবে নিজেকে আড়াল করতে পেরেছেন বটে তবে স্বস্তি বোধ করেন নি। তিনিতো নিজে জানেন আসল সত্যটা কোথায়? তার দুই স্ত্রী পরমা সুন্দরী তাদের তিনি দেহসুখ থেকে বঞ্চিত করেছেন কেবলমাত্র নিজেকে আড়াল করার কারণে। বিশেষভাবে মাদ্রীকে তার বিবাহ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। তবু করলেন কুন্তীর উপর দায়বদ্ধতার দোষটুকু চাপিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু তার পরম্পরা? মন বিষন্ন হয়ে যায়। শেষে জীবনের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করবেন বলে সংকল্প করলেন। মনস্থির করে তিনি কুন্তী ও মাদ্রীকে কাছে ডেকে বললেন, শোন আমার আর সংসার ধর্ম পালনের ইচ্ছে নেই। আমি কঠোর বৈরাগ্যের জীবন গ্রহণ করতে চাই। আমার অনুরোধ, তোমরা দু'জনে রাজধানীতে ফিরে যাও। কুন্তী ও মাদ্রী কেউই প্রস্তাব মেনে নিলেন না। তারা বললেন, আমরা

কার ভরসায় রাজপুরীতে যাব। আমার তোমার সহধর্মিনী। তোমার ধর্ম পত্নী। আমারও তোমার সঙ্গে বনগমন করে তপস্যা করবো। তুমি যদি ইন্দ্রিয় দমনের জন্য বৈরাগ্য সাধনে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে পার, তাহলে আমরাও পারবো। আমরাও ইন্দ্রিয় সুখ চাই না। চাই স্ত্রী হিসাবে স্বামীর সান্নিধ্য।

কুন্তী ও মাদ্রীর মুখ থেকে রাজা পান্ডু যে এমন কথা শুনবেন আশা করেন নি। মনে মনে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, শোন ভদ্রে, আমার এই বৈরাগ্যের কারণ অত্যন্ত যন্ত্রণা দায়ক। তোমার ইতিমধ্যে শুনেছ গান্ধারী গর্ভবতী হয়েছে। আমার জেষ্ঠ্যের পরম্পরা রক্ষিত হলেও আমার কোনদিন বংশবৃদ্ধি ঘটবে না। এই বলে তিনি সুযোগ মতো নিজের অক্ষমতাকে চাপা দিতে মৃগমুনির গপ্পোটি দুই স্ত্রীকে শুনিয়েদিলেন।

কুন্তী বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমরা কেউই তোমার অমঙ্গল চাই না। মুনির অভিশাপ যাতে আমাদের তিনজনের মিলিত কঠোর সাধনায় লঙ্ঘিত হয় তারজন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। বুক থেকে একটা বোঝা নেমে গেল বটে, কিন্তু বংশবিস্তারতো হল না। মনের মধ্যে একরাশ হতাশা নিয়ে মুক্তির সন্ধান করতে লাগলেন পান্ডু। মুক্তি! মুক্তি চাইলেই কি মুক্তি পাওয়া যায়। নিয়মের মধ্যেই মানুষকে চলতে হয়। যে অক্ষমতার কথা তিনি তার স্ত্রীদের কাছে গোপন করেছিলেন, সেই গোপনতা ধরা পড়ে গেল সাধনসিদ্ধ ঋষিদের কাছে। একদিন ঘুরতে ঘুরতে পান্ডু এসে উপস্থিত হলেন একদল সাধনসিদ্ধ ঋষিদের সম্মুখে। তারা বললেন, কি রাজা তোমার দুঃখু কিসের। পুত্রের কারণে দুঃখু করছ! আমরা তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার পুত্র আছে। অতএব আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তাকে তুমি ফলে পরিণত করার চেষ্টা কর। সাধনসিদ্ধ ঋষিদের ইঙ্গিত বুঝতে কোন অসুবিধে হল না রাজা পান্ডুর। তিনি প্রজনন অক্ষম, তাহলে তার সন্তান হবে কি করে? তাহলে কি ঋষিরা তাকে বলছেন তিনি প্রজনন অক্ষম নয়? কিন্তু তাতো হতে পারে না, তাহলে কি ঋষিরা অন্যভাবে সন্তান লাভের কথা তাকে বলেছেন। আবার ছুটে গেলে ঋষিদের কাছে। তারা বললেন, সমাজের

মধ্যেই তো উপায় নির্ধারণ করা আছে। তুমি উদ্যোগী হও পাণ্ডু— তুমি উদ্যোগ নিলেই সন্তান লাভ হবে।

পাণ্ডু যে নিয়োগ প্রথার কথা জানতেন না তা নয়। তিনি নিজেই নিয়োগ প্রথার সন্তান। কিন্তু স্ত্রীদের নিয়োগ প্রথার কথা বলবেন কিভাবে।

ফিরে এলেন। ভাবতে লাগলেন। কাকে কথাটা বলবেন কুন্তী না মাদ্রী। কুন্তীকেই বলাটা শ্রেয় কারণ সে প্রথমা মহিষী। ধর্মত প্রথমা পত্নী হলেন সঠিক অর্থে পত্নী। তাছাড়া মাদ্রী অনেক ছেলেমানুষ। তার মধ্যে চপলতা আছে। জীবনকে সে ভালোমতো চিনতে শেখেনি। বরং কুন্তীর মধ্যে জীবনধারার বৈচিত্রতা আছে। সে অনেক ঘটনার মুখোমুখি হয়েছে। তাছাড়া তার মনের মধ্যে ইতিমধ্যে পড়েছে আধ্যাত্মিকতার ছাপ। কন্যাসন্তান হওয়ার কারণে তার পিতা তাকে কুন্তীভোজ রাজার কাছে দত্তক দিয়েছিলেন। নিজ গৃহ পরিবেশ ছেড়ে পরগৃহে তিনি মানুষ হয়েছেন। কাজেই সব দিক বিবেচনা করে তিনি ওই সিদ্ধঋষিদের কথা কুন্তীকেই বলবেন বলে ঠিক করলেন। আসলে মহাভারতের কাহিনীকার বহু আগেই তার জন্য পথ করে রেখেছেন। কুন্তীর জীবনে দুর্বাসার আগমন অভিশাপ নয় আর্শীবাদ হয়ে দেখা দিয়েছিল। দুর্বাসার আগমন না ঘটলে কুন্তীতো ওই সন্তান উৎপাদনের মন্ত্র পেতেন না, তাকে বন্ধ্যা হয়েই থাকতে হতো। কাজেই যে নারী সন্তান উৎপাদনের মন্ত্র জানে তাকেই তো নিয়োগ প্রথার জন্য সর্বাগ্রে অনুরোধ করা ভাল। সেই কারণে মহাভারতের কাহিনীকার পাণ্ডুকে দিয়ে বাছাই করে নিয়েছিলেন কুন্তীকে। তার সন্তানের প্রয়োজন। পরম্পরার মধ্যে বেঁচে না থাকলে জীবন মিথ্যে হয়ে যায়। অতএব তিনি কুন্তীকে নির্জনে ডেকে সিদ্ধঋষিদের কথা বললেন এবং কুন্তীকে অনুরোধ করে বললেন, তুমি আমার এই ইচ্ছেকে উপেক্ষা কর না প্রিয়তমা। আমার সন্তানের প্রয়োজন। মৃগমুনীর অভিশাপে আমি রতি মিলনে অক্ষম, কিন্তু আমারও তো পুত্রের চাহিদা আছে। গান্ধারী গর্ভ ধারণ করেছে। আমি চাই তুমি নিয়োগ প্রথার মাধ্যমে গর্ভবতী হও। কুন্তী যেন আকাশ থেকে পড়লেন। স্বয়ং পাণ্ডু তাকে নিয়োগ প্রথায় সন্তান উৎপাদনের কথা বলছেন। সন্তান উৎপাদনের মন্ত্র তার জানা আছে। মনে পড়ে যৌবন সন্ধিক্ষণে ঋষি

দুর্বাসার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ দিনগুলোর কথা। ঋষি তাকে খুশী হয়ে এই মন্ত্রদান করেছিলেন। তবে কি ঋষি জানতেন ভবিষ্যতে ওই মন্ত্র কাজে লাগবে কুন্তীর। মুনি ঋষিদের পক্ষে সবই আগেভাগে জানা সম্ভব। রাজা পান্ডুর সকরুন মিনতি কুন্তীকে বিচলিত করে তুললো। কুন্তী বললেন, সত্যি কি তুমি সন্তান প্রার্থনা কর দেব?

—হ্যাঁ দেবী। আমি পুত্র সন্তান চাই।

এই প্রথম বুকে বল নিয়ে কুন্তী তার সন্তান উৎপাদনের মন্ত্রের কথা মহারাজ পান্ডুকে বললেন। শুনে পান্ডু আনন্দে বিহ্বল হয়ে বললেন—এতো সুবর্ণ সুযোগ কুন্তী। আমি এই সুযোগ নষ্ট করতে চাই না। আমি চাই পৃথিবীর মনুষ্য সকল জানুক রাজা পান্ডু অপুত্রক ছিলেন না, তারও পুত্র সন্তান ছিল।

এই মন্ত্র উচ্চারণে দেবমিলনের ক্ষেত্রে কুন্তী কিন্তু নিজের কোন ইচ্ছাকে প্রয়োগ করেন নি। পান্ডু যেমন তাকে যে দেবতাকে আরাধনা করতে বলেছিলেন, তিনি সেই দেবতাকেই আহ্বান করে তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এখানে কুন্তী নিজস্ব কোন ইচ্ছা কাজ করেনি। পান্ডুর ইচ্ছায় কুন্তী প্রথম ধর্মরাজ পরে পবনদেব ও ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হন। এই তিনদেবতার সঙ্গে মিলনের ফলে কুন্তীর গর্ভে জন্ম নিলেন—যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন। এই তিন কুন্তীপুত্র তিন দেবতার ঔরসজাত হলেও সামাজিক বিধি নিয়মে পান্ডুর পুত্র বলেই পরিচিত হলেন।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন পান্ডু। তিনপুত্র লাভ করার পরেও তিনি কুন্তীর কাছে আর একটি পুত্র প্রত্যাশা করেছিলেন কিন্তু নিয়োগের মাধ্যমে কুন্তী আর সন্তান গর্ভে ধারণ করতে চাননি। মনে হয় শারীরিক প্রতিবদ্ধতার কারণে হয়ত পুত্র ধারনের ক্ষেত্রে তার অসম্ভব কষ্ট হত, যা তার পক্ষে সহ্য করা কঠিন ছিল। তাই কুন্তী বলেছিলেন, আর নয় মহারাজ, তিনটি সন্তান নিয়েই আপনি সুখে থাকুন।

কুন্তীর তিন-তিনটি সন্তান হল অথচ মাদ্রীর একটিও সন্তান নেই। মনের দিক দিয়ে মাদ্রী অত্যন্ত কষ্ট পেতে লাগলেন তার তো সন্তান হলনা। নারীমাত্র সন্তান অভিলাষী। মাদ্রীর দুর্ভাগ্য তার কুন্তীর মতো কোন মন্ত্রজানা ছিল না। এখন যদি তাকে পুত্র লাভ করতে তাহলে তাকে জ্যেষ্ঠা কুন্তীর উপর নির্ভরশীল হতে হবে। কিন্তু মাদ্রীর পক্ষে

কিছুতেই কুন্তীর কাছে পুত্র লাভের মন্ত্র শিখতে চাওয়ার জন্য অনুরোধ করা সম্ভব নয়। কেন তিনি কুন্তীর কাছে অনুরোধ করে নিজেকে ছোট করবেন। তাহলে কি আমরা বুঝবো দুই সতীনের মধ্যে সম্পর্ক ভালো ছিল না। ছিল, খুব ভাল ছিল। তবে কুন্তী যতটা সহজ ছিলেন মাদ্রী ততোটা সহজ ছিলেন না। তার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন অহংকার ছিল। ছিল অভিমান। আর এই অহংকার আর আত্মাভিমানের কারনেই মাদ্রী কুন্তীর কাছে মন্ত্র শিখতে চেয়ে ছোট হতে চান নি। তার মনে হয়েছে পুত্র না হওয়ার জন্য দায়ী হলেন রাজা পাণ্ডু, তিনি নিজে নয়। স্বামীব অক্ষমতার কারহে তিনি পুত্র লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। কাজেই মাদ্রী ঠিক করলেন ওই মন্ত্র শেখাবার কথা তিনি সরাসরি কুন্তীকে না বলে রাজা পাণ্ডুকেই বলবেন। যার কারণে তিনি পুত্র লাভে বঞ্চিত হয়েছেন, তাকেই পুত্রলাভের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ বাজা পাণ্ডু নিজে তার হয়ে কুন্তীকে অনুরোধ করুণ যেন তিনি মাদ্রীকে এই মন্ত্র শিখিয়ে দেন।

আসলে মাদ্রীর অহংকার শুধু রূপের জন্য ছিল না, ছিল বংশ মর্যাদায়। কুন্তীভোজ রাজ্য অপেক্ষা মদ্র রাজ্য মহাভারতের যুগে ছিল অনেক বেশী বিস্তৃত। তাছাড়া তিনি কুন্তীর মতো স্বইচ্ছায় স্বয়ম্বর সভায় পাণ্ডুকে স্বামী হিসাবে নির্বাচন করেন নি বরং মহামতি ভীষ্ম তাকে নিজে পছন্দ করে বহুমুদ্রা ও অলংকারের বিনিময়ে ক্রয় করে হস্তিনাপুবে নিয়ে এসেছিলেন অক্ষম স্বামী পাণ্ডুর সঙ্গে বিয়ে দেবাব জন্য। কুন্তী প্রথমা স্ত্রী হিসাবে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পাণ্ডু তাকে বিয়ে করেছিলেন—এখানেই মনে হয় মাদ্রী ছাপিয়ে গেছেন জ্যেষ্ঠা কুন্তীকে। আর আজ সেই কুন্তীর কাছে তাকে কিনা মাথা নিচু করে দাঁড়াতে হবে সন্তান উৎপাদনের মন্ত্র শেখার জন্য। অসম্ভব—তা হতে পারে না। দোষ তার নয়, দোষ রাজা পাণ্ডুর। অতএব মাদ্রী মনে মনে ঠিক করলেন কাঁটা দিয়ে তিনি কাঁটা তুলবেন। আর মাদ্রী এও জানতেন রাজা পাণ্ডু কুন্তীকে অনুরোধ করলেন, কুন্তী তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না।

মনের মধ্যে দৃঢ়তা এনে মাদ্রী একদিন সরাসরি এসে মহারাজ পাণ্ডুকে বললেন, আমি কি দোষ করেছি রাজা যে আমার গর্ভে কোন সন্তান জন্মাবে না। আমিও একজন নারী। আমার মধ্যেও সন্তানের আকাঙ্খা

আছে। তুমি আমায় সন্তান দাও। মাদ্রী এই ক্ষেত্রে জেনেশুনে অপারক পান্ডুকে খোঁচা মারলেন। সন্তান উৎপাদন অক্ষম পান্ডু কোন কথা বলতে পারলেন না। শুধু বললেন—তুমি তো আমার কথা শুনেছ মাদ্রী।

—শুনেছি। তাহলে কুন্তীর তিনটি সন্তান হল কিভাবে?

—তার নিজের দক্ষতায়। ঈশ্বরের কৃপায় তার পুত্র উৎপাদনের মন্ত্র জানা ছিল।

—আমাকেও তাহলে সেই মন্ত্র শিখিয়ে দাও।

মহাফাঁপড়ে পড়ে গেলেন রাজা পান্ডু। কি বলবেন তিনি। শেষে না পেরে তাকে বললেন তুমি কুন্তীকে অনুরোধ কর।

ক্ষোভে ফেটে পড়লেন মাদ্রী। বললেন—আমি কেন কুন্তীর কাছে মন্ত্র শেখার কথা বলবো। আমার চাহিদা তোমার কাছে। তুমি তাকে বলে আমার সন্তান হওয়ার ব্যবস্থা কর। আমি চাই আমার গর্ভজাত সন্তান তোমার পরিচয় নিয়ে বড় হোক।

রাজা পান্ডু নীরব। কি বলবেন তিনি। মাদ্রী বললেন—আমিতো আমার কারণে পুত্র ভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়নি। আমি পুত্রভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি তোমার কারণে। কাজেই আমার যা কিছু করনীয় তোমাকে করতে হবে।

মাদ্রীর অনুযোগগুলো যেন বুকে তীর হয়ে বিঁধে গেল। কথাগুলো অপ্রিয় হলেও নির্মম সত্য। খানিক নীরবতার পর পান্ডু বললেন—তাই! আমাকেই কুন্তীকে অনুরোধ করতে হবে, বেশ তাই হবে।

মাদ্রী খুশী হয়ে চলে গেলেন। মাদ্রীর কথাগুলো বুকের মধ্যে বর্শার ফলার মতো বিঁধে থাকে। সত্যিতো মাদ্রীর দুর্ভাগ্যের জন্য তিনি দায়ী। সে তো কোন অন্যায় করেনি। কুন্তীর মতো সেও একজন নারী।

একদিন সুযোগ বুঝে পান্ডু কুন্তীকে বললেন—কল্যানী আমার মুখ চেয়ে তোমাকে আমার একটি অনুরোধ রাখতে হবে। এই অনুরোধ শুধু বংশ বিস্তারের জন্য নয়, আবার মনের সন্তোষ লাভের জন্য।

—আপনি আবার পুত্র আকাঙ্খা করেছেন মহারাজ। আমি তো আপনাকে তিন তিনিটি সন্তান দিয়েছি তাতেও কি আপনি পরিতৃপ্ত নন। এর আগেও আপনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছি সে কথা নিশ্চয় আপনার স্মরণে আছে।

পান্ডু অসহায়ভাবে উত্তেজিত কুন্তীর দিকে তাকিয়ে বললেন—এই অনুরোধ আমি করছি কেবল মাত্র আমার সন্তোষের জন্য। এরপরেই তিনি কুন্তীর হাত ধরে অসহায়ভাবে বললেন—মাদ্রীর কাছে আমি বড় অপরাধী হয়ে আছি। সেও তোমার মতন একজন নারী। তুমি একবার তাব কথা ভেবে দেখ। সেতো আমারই কারণে সন্তান বঞ্চিতা। আমাব অনুরোধ তুমি তাকে পুত্রলাভের মন্ত্র একবার শিখিয়ে দাও, যাতে সে অত্যন্ত একটি পুত্র গর্ভে ধারন করতে পারে। মাদ্রীব কাছে আমাকে তুমি অক্ষমতার হাত থেকে রক্ষা কর।

রাজা পান্ডুর এই অনুবোধ ফেলতে পারলেন না কুন্তী। মনে মনে ভাবলেন সত্যিতো মাদ্রীতো তারই মত এক নারী। সেও তো আমার মতো স্বামীব কাছ থেকে কোন দেহ সুখ পাইনি। তার সন্তান না হওয়ার কারণ তো সে নয়। সে নিজে যে কারণে এতদিন দু:খী ছিল, সেই কারণে মাদ্রীর মনে দুঃখু থাকাই স্বাভাবিক। তাই অনেক ভাবনা চিন্তা করে কুন্তী বললেন স্বামী পান্ডুকে, আপনি চিন্তা করবেন না স্বামী, মাদ্রী যাতে সত্বর গর্ভবতী হয় তার যথাযথ ব্যবস্থা আমি করবো।

অতএব কুন্তীব এই উক্তি থেকে বোঝা গেল তিনি মাদ্রীকে সন্তান উৎপাদন মন্ত্র শেখাবেন। প্রয়োগ প্রথার যাবতীয় বিধান সম্পর্কে মাদ্রীকে ডেকে বিস্তারিত ভাবে বললেন কুন্তী, তারপর বললেন, শোন মাদ্রী এই মন্ত্রবলে সন্তান উৎপাদনের সুযোগ তুমি একবার মাত্র পাবে। তুমি তোমার মনের মতো কোন দেবতাকে শুচিশুদ্ধ ভাবে আরাধনা কর। তিনি তোমাকে পুত্র সন্তান দান করবেন।

কুন্তীর তুলনায় মাদ্রী কিন্তু অনেক বেশী আত্মনির্ভরতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি কোন দেবতাকে আহ্বান করবেন এই বিষয়ে তিনি স্বামী পান্ডুর কোন নির্দেশ গ্রহণ করেন নি। স্বইচ্ছা প্রয়োগ করেছেন। কুন্তী যদিও তাকে বলেছিলেন, মাদ্রী, তুমি কোন দেবতাকে আহ্বান করবে এই বিষয়ে স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করে কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছ কি?

মাদ্রী হেসে বললেন, দিদি, সন্তান ধারন করবো আমি। সন্তান প্রয়োজনে যে দেবতার সঙ্গে আমি মিলিত হব, তাকে নির্বাচন করার অধিকার নিজের হাতে থাকা উচিত নয় কি? স্বামী হয়ত যাকে নির্বাচন

করবেন তাকে হয়ত আমার পছন্দ নাও হতে পারে। অতএব আমি নিজেই আমার প্রিয় দেবতাকে আহ্বান করবো মিলনের জন্য।

মাদ্রীর কথায় কুন্তী কিন্তু খুব একটা সুখী হতে পারেন নি। শুধু বলেছিলেন—শুধুমাত্র একবার তুমি এই মন্ত্রের সুযোগ পাবে মাদ্রী। মাদ্রী তাকালেন কুন্তীর দিকে। তার ওঠদ্বয় কুঞ্চিত হল। চোখের তারা চঞ্চলতায় বোঝা গেল মাদ্রী কাকে আহ্বান করবেন তার প্রস্তুতি তিনি মনে মনে নিয়ে ফেলেছেন। কুন্তী তিনবার এই সুযোগ গ্রহণ করে, তিনটি সন্তান পেয়েছে, সে ক্ষেত্রে কুন্তী মাদ্রীকে বলেছে তিনি একবার মাত্র এই সুযোগ পাবেন। এইক্ষেত্রে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন মাদ্রী। তিনি কুন্তীকে বিস্মিত করে আহ্বান করলেন যুগলদেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে। একদানের সুযোগে দুই ফসল। মাদ্রীর গর্ভে জন্ম নিলেন নকুল ও সহদেব। কুন্তী এই প্রথম মাদ্রীকে সঠিক ভাবে চিনতে পারলেন। বুঝলেন মাদ্রীর মনের গোপন অভিলাষ। স্বামীর প্রতি তার সঠিকভাবে ভালোবাসার কোথায় যেন অভাব আছে। আসলে ছোটবেলা থেকে মাদ্রী অপরিসীম স্নেহে লালিত পালিত হয়েছিলেন। পেয়েছিলেন পিতা মাতার অপার স্নেহ। পরে পিতার মৃত্যু হলে তার ভাই শল্যরাজ তাকে স্নেহ নিবিড়তায় পালন করেছিলেন। এই পারিবারিক স্নেহ একটি সন্তানের বেড়ে ওঠার ফলে যথেষ্ঠ। কুন্তীর পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি পিতৃগৃহ থেকে কোন স্নেহ পাননি, বড় হয়েছিলেন পরজীবি প্রাণীর মতো কুন্তীভোজ রাজার কাছে। ফলে উভয়ের চরিত্রের মধ্যে গড়ে উঠেছিল এক বিশাল পার্থক্য। কুন্তী যে কারণে স্বামী নির্ভর, সেই একই জায়গায় অবস্থান করে মাদ্রী আত্মনির্ভর। তবে এটা ঠিক, মাদ্রীর এই যুগলদেবতাকে আহ্বানের ঘটনাটি মন থেকে ভালোভাবে মেনে নিতে পারেন নি কুন্তী। তবে মুখে কোন বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন নি।

মাদ্রী দুই পুত্র পেয়েও মনে হয় সুখী হতে পারেন নি। কুন্তীর তিনটি সন্তান তার মাত্র দুটি, এই ক্ষেত্রে আর একটি বার সুযোগের প্রয়োজন। কুন্তীকে ছাপিয়ে যাওয়ার একটা গোপন ইচ্ছা মাদ্রীর মধ্যে ছিল বলেই তিনি মহারাজ পান্ডুকে গিয়ে ধরলেন। বললেন, স্বামী এ কেমন অবিচার। কুন্তী তোমার প্রথমা স্ত্রী বলে ওই মন্ত্র ব্যবহারের সুযোগ

তিনবার পাবে আর আমি কনিষ্ঠা বলে সুযোগ পাব মাত্র একবার। তারপর একটু আবেশ ঘন কণ্ঠে পাণ্ডুকে বললেন, যদি তুমি আমায় সত্যি ভালোবাসো স্বামী, তাহলে আমার জন্য আর একবার এই সুযোগের ব্যবস্থা করে দাও কুন্তীকে বলে। পাণ্ডু বললেন, উতলা হও না মাদ্রী, আমি কুন্তীকে অবশ্যই বলবো তোমার কথা।

রাজা পাণ্ডু বলেও ছিলেন। কিন্তু কুন্তী পাণ্ডুব মুখে এই কথা শুনে প্রচণ্ড রাগে ক্ষীপ্ত হয়ে উঠলেন। কুন্তীর এমন রূপ এর আগে রাজা পাণ্ডু কোনদিন প্রত্যক্ষ করেন নি। রাজা পাণ্ডু সেই কারণে অসহায় ভাবে তাকালেন কুন্তীর দিকে, বললেন, তুমি এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন কুন্তী।

কুন্তী এবার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, আর আমাকে দিয়ে এমন কাজ আপনি. করাতে পারবেন না রাজা। আপনার কারণেই আমি ওকে সন্তানের জননী হাতে সাহার্য করেছিলাম। কিন্তু মাদ্রী অত্যন্ত চতুরা—একবার সুযোগ পাবে শুনে সে যুগল দেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আহ্বান করে একসঙ্গে দুই সন্তানের জননী হয়েছে, এরপর আমি যদি তাকে পুনরায় এই সুযোগ করে দিই তাহলে সে হয়ত এবার যুগলদেবতা মিত্রবরুনকে আহ্বানকে করে আমাকে অতিক্রম করে যাবে, এ' আমি কিছুতেই হতে দিতে পারি না রাজা। তাছাড়া আমার ক্ষেত্রে আপনি আমায় কোন দেবতাকে আহ্বান করবো তার নিদের্শ করে দিয়েছিলেন, আমি সেই নির্দেশমতো কাজ করেছি। কিন্তু মাদ্রীর ক্ষেত্রে আপনি তাকে কেন কোন নির্দেশ দিলেন না স্বামী? সে স্বঅধিকার প্রকাশ করে আমাকে ঠকিয়েছে। কাজেই আপনি আমায় মাদ্রীর হয়ে কোন অনুরোধ করবেন না। আর যদি তার সত্যি আগ্রহ থাকে তাহলে সে যেন সরাসরি আমার সঙ্গে কথা বলে। তাকে যা উত্তর দেবার আমি দেব। পাণ্ডু হেসে বললেন—কুন্তী আমি জানি তোমার ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণ আছে। তবু বলবো তুমি হলে মাদ্রীর তুলনায় অনেক বিচক্ষণ এবং প্রজ্ঞ। তোমাকে আমি নিদের্শ যা দিয়েছিলাম তা তুমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছ। কিন্তু মাদ্রী আমার কাছে কোন নিদের্শ নিতে আসেনি, এমনকি নিদের্শ দেবার মতো সুযোগ সে আমায় দেয়নি। তবু বলবো

প্রিয়তমা, মাদ্রী তোমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর মতো, তুমি ওকে ক্ষমা করে দাও। মনের মধ্যে কোন উষ্ণতা রেখ না।

কুন্তীর রাগ অনেকটা স্তিমিত হয়ে এল। বললেন, ক্ষমা আমি মাদ্রীকে সবসময় করে থাকি রাজা। এখনও করেছি, এমনকি যুগল দেবতাকে আহ্বান করার জন্য আমি তাকে কোন কথা বলিনি। শুধু আপনাকে অনুরোধ করবো, আপনি আমায় এই বিষয়ে পুনরায় কোন আদেশ করে অযথা বিহ্বল করবেন না। এরপর কুন্তী বললেন, মাদ্রী জানে আমি আপনার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারবো না, সেইজন্য সে আপনাকে দিয়ে আমাকে অনুরোধ করিয়েছে। অথচ তারতো উচিত ছিল আমাকে সরাসরি এই বিষয়ে বলা। আমি কি তাকে উপেক্ষা করতাম।

পাণ্ডু কুন্তীকে অনেক বুঝিয়ে শান্ত করলেন এবং সেই সঙ্গে কথা দিলেন তিনি মাদ্রীর হয়ে পুনরায় কোন অনুরোধ করবেন না। এই ঘটনা থেকে একটা বিষয়ে পরিস্কার হয়ে যায় যে কুন্তী ও মাদ্রীর মধ্যে বাহ্য সম্পর্ক যতই সুন্দর থাকুক না কেন, ভিতরে ভিতরে তারা ছিলেন পরস্পর বিরোধী। তবে এই বিরোধী মনভাব কোনদিনের জন্য প্রকাশ্যে আসেনি। তাছাড়া মাদ্রী জানতেন কুন্তী প্রথমা পত্নী। রাজা পাণ্ডু মাদ্রীর প্রতি যতই মোহগ্রস্থ হোন না কেন কুন্তীকে উপেক্ষা করার সাধ্য তার নেই। কুন্তীর চিন্তাভাবনা অত্যন্ত স্বচ্ছ। তাছাড়া মহাভারতের কাহিনী জুড়ে কুন্তীর একটা বিশেষ ভূমিকা আছে তুলনায় মাদ্রীর আর্বিভাব ও প্রস্তান উভয়ই যেমন আকস্মিক, তেমনি সংক্ষীপ্ত। রাজা পাণ্ডুও দুই নারীর চরিত্রকে ভালোভাবেই অনুধাবন করেছিলেন। সেই মতো তিনি উভয়ের সঙ্গে সমআচরণ করে সম্পর্কটা উভয়ের মধ্যে কখনই তিক্ত হতে দেন নি। তবে এটা সত্য মাদ্রী এরপর আর দ্বিতীয়বার পুত্র সন্তান লাভের অভিপ্রায় কুন্তীকে কোন অনুরোধ করেননি। বরং মাদ্রী বুঝেছিলেন দ্বিতীয়বার সুযোগ পেলে তিনি যে মিত্রবরুনকে আহ্বান করার সংকল্প নিয়েছেন এটা কুন্তী ধরে ফেলেছেন। সেই কারণে তিনি আর কুন্তীর কাছে সন্তান প্রত্যাশার জন্য মন্ত্র শেখার কোন কথা বলেন নি।

এবার আসা যাক হস্তিনাপুরের কথায়।

পাণ্ডু সিংহাসন ত্যাগ করে দুই সহধর্মিনীকে নিয়ে বনগমন করলেন। এই ঘটনায় সমগ্র হস্তিনাপুর হতবাক হয়ে গেলো। প্রজারা হতাশ হলেন। বিচলিত হলেন ভীষ্ম। রাজমাতা সত্যবতী পাণ্ডুর বনগমন সংবাদে মর্মাহত হলেন। তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না কি কারণে পাণ্ডুর এই সিদ্ধান্ত। দুই পত্নী থাকা সত্ত্বেও তারা এতদিনে কেউই গর্ভবতী হ'লো না। গান্ধারী পুত্রবতী হবেন এমন বিশ্বাস সত্যবতীর ছিল। কিন্তু কুন্তী ও মাদ্রী—তারা পুত্রবতী হলো না কেন? তবে কি বিচিত্রবীর্যের মতো পাণ্ডু'ও সন্তান উৎপাদনে অক্ষম। ভাবতে গিয়ে থমকে উঠলেন সত্যবতী। কিন্তু এখনতো আর কিছু করার নেই। ভীষ্মকে প্রশ্ন করে কোন যথার্থ উত্তর পাননি রাজমাতা সত্যবতী। তার মনে সংশয় ছিল ধৃতরাষ্ট্রকে নিয়ে। 'অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র কিভাবে রাজ্য পরিচালনা করবে? প্রজারা কি তাতে রাজা বলে মান্য করবে। ভীষ্ম পাশে আছেন তাই তিনি কিছুটা নিশ্চিন্ত। তবু ধৃতরাষ্ট্রের আচরণ সত্যবতীর মনে সন্দেহের উদ্রেগ করেছিল। পাণ্ডুর বন গমনে তিনি যে সুখী হয়েছেন এটা তার আচরণে বারবার পরিলক্ষিত হয়েছে। লোকে যাতে তাকে সন্দেহ করতে না পারে তার জন্য তিনি বনবাসী ভাইয়ের জন্য নিয়মিত অর্থ পাঠাতেন। তাদের খোঁজখবর রাখতেন। এত কিছু করা সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু পাণ্ডুকে কোনদিন রাজধানীতে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করেন নি। ভীষ্ম তাকে অনেকবার বলেছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তোমার উচিত কাজ হল কনিষ্ঠ পাণ্ডুকে গৃহে ফেরার জন্য অনুরোধ করা। ধৃতরাষ্ট্র অনুরোধ শুনেছেন। ভীষ্মের মুখোমুখি করেন নি। নির্লিপ্ত ভাব পোষন করে ভীষ্মের অনুরোধ তিনি এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে অন্যকান দিয়ে বার করে দিয়েছেন। আসলে ধৃতরাষ্ট্র চেয়েছিলেন মনেমনে রাজসিংহাসন। জ্যেষ্ঠপুত্র হয়ে সিংহাসনে বসার অধিকার হারানোর জন্য তার মনে যথেষ্ট বেদনা ছিল। তিন মনে মনে পাণ্ডুকে ঈর্ষা করতেন। আজ এতদিন বাদে ভাগ্যের প্রসাদগুনে তার ঈপ্সিত প্রত্যাশা সফল হয়েছে। তিনি পাণ্ডুর অবর্ত্তমানে রাজা হয়েছেন—এই অধিকার তিনি ছাড়বেন কি করে? যদি তিনি ভীষ্মের কথা মতো পাণ্ডুকে ঘরে ফেরার জন্য অনুরোধ করেন, এবং পাণ্ডু সত্যি যদি

রাজধানীতে ফিরে আসে, তাহলে তাকে আবার সিংহাসন হারাতে হবে। মনের গভীরে থাকা ঈপ্সিত বস্তু যখন তার ভাগ্য প্রসন্নতায় হাতের মুঠোয় এসেছে, তখন তিনি কোন অবস্থায় সেই মুঠি আলগা করতে রাজি নন। পান্ডু ফিরে এলে তার সমস্ত আশা-আকাঙ্খার স্বপ্ন ধুলিষাৎ হয়ে যাবে।

গান্ধারী গর্ভবতী হয়েছেন। এই খবর আগেই সকলে শুনেছেন। এবার বিদুর এসে কুন্তীর গর্ভবতী হওয়ার খবর দিলেন। খবরটা শোনা মাত্র আনন্দে বিহ্বল হলেন ভীষ্ম। তিনি রাজমাতাকে গিয়ে সংবাদ দিলেন। গোটা রাজ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল। সুহৃদ সচীবগণ সকলেই এই সংবাদে আনন্দিত হলেন। ধৃতরাষ্ট্র মুখে খুশীর ভাব দেখালেও মনে মনে শঙ্কিত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন। পান্ডু বর্ত্তমানে প্রকৃত রাজা। তিনি তার অবর্তমানে রাজত্ব করছেন। যদি সত্যি তার সন্তান হয়, তাহলে সেই সন্তানকে সকলে পরবর্তীকালে রাজা করবে না তো? তার পত্নী গান্ধারী আগে গর্ভবতী হয়েছে। কাজেই আশা করা যায় তার সন্তান আগে ভূমিষ্ট হবে। যদি সন্তান নিয়ম হিসারে তার সত্যি সত্যি আগে ভুমিষ্ট হয় তাহলে পরম্পরা অনুযায়ী বংশের জ্যেষ্ঠ হিসাবে তারই রাজা হওয়ার কথা। তখন কেউ কোন আপত্তি তুলবে না তো? এই জটিল বিষয়টাকে একটু ঝালিয়ে নেবার জন্য আনন্দিত ধৃতরাষ্ট্র সভাকক্ষে হঠাৎ করে তার প্রশ্নটা করে বসলেন। ভীষ্ম; বিদুর, কৃপ সহ সভায় উপস্থিত সচীব ও ব্রাহ্মনদের সামনে ধৃতরাষ্ট্র অকম্পিত কণ্ঠে বললেন—আপনাদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে?

—কি প্রশ্ন বল ধৃতরাষ্ট্র।

ভীষ্ম জানতে চাইলেন। কোনরকম রাখঢাক না করে ধৃতরাষ্ট্র পরিষ্কার ভাবে বললেন, আমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে যদি আমার পুত্র আগে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে বংশের ধারা অনুযায়ী নিশ্চয় সেই রাজা হবে? ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন শুনে মুহুর্তের জন্য থমকে গেলেন ভীষ্ম। একি প্রশ্ন করছে ধৃতরাষ্ট্র। মনে মনে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পেরে তাকালেন বিদুরের দিকে। বিদুর বুঝতে পারলেন ভীষ্ম তাকে ধর্ম অনুসারে উত্তর দেওয়ার জন্য ইঙ্গিত করছেন। তাই তিনি স্বহাস্যে বললেন—এখনই এসব প্রশ্ন ওঠে না।

ধৃতরাষ্ট্র সহজে ছাড়ার পাত্র নন। তিনি বললেন—কেন প্রশ্ন ওঠে না ভাই, উভয় পত্নী যখন গর্ভবতী হয়েছেন তখন আশা করা যায় ঈশ্বরের কৃপায় তারা উভয়ে পুত্র সন্তান লাভ করবেন। বিদুর বললেন— সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে এখনও দীর্ঘ সময় বাকি। তবে তোমার পুত্র যদি আগে ভূমিষ্ঠ হয় তাহলে প্রকৃত পক্ষে সেই হবে সিংহাসনের অধিকারী। তবে এই ক্ষেত্রে দেখতে হবে সে প্রকৃত পক্ষে রাজা হওয়ার যোগ্য কিনা।

বিদুরের কথায় চমকে উঠলেন ধৃতরাষ্ট্র। থমকে গেলেন কিছুক্ষণের জন্য। কপালের চিন্তার ভাঁজ পড়লো। বুঝলেন বিদুর কি বলতে চান। তাই বললেন—এই পরিবারের নিয়মানুসারে জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহাসনের দাবীদার হয়ে থাকে। আমি সিংহাসন বঞ্চিত হয়েছি।, অন্ধত্বের কারণে। কিন্তু আমার পুত্র যদি আমার মতো অন্ধ না হয়, যদি কোনরকম শারীরিক প্রতিবন্ধতা তার না থাকে, তাহলে নিশ্চয় রাজা হতে তার কোন অসুবিধে হওয়ার কারন নেই। বিদুর বললেন—তবু রাজার মধ্যে কিছু রাজকীয় লক্ষন থাকে, সেই লক্ষণ যদি তোমার পুত্রের মধ্যে থাকে তাহলে নিশ্চয় সে রাজা হবে।

বিদুরের কথা শুনে হঠাৎ ধৃতরাষ্ট্র উত্তেজিত হযে পড়লেন। বললেন—লক্ষণ, অলক্ষের কথা বাদ দাও, ওগুলো নিছক মন গড়া সংস্কার মাত্র।

ভীষ্ম এই অবস্থায় বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্রকে হাত তুলে তর্ক থামাতে অনুরোধ করলেন। হাজার হোক তিনি হলেন সকলের বড়, প্রজ্ঞ, জ্ঞানী, যোদ্ধা এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি। কুরুকুলের তিনি হলেন অভিভাবক। তার কথাই যে শেষ কথা এটা সকলেই জানতেন। ভীষ্ম বললেন শান্ত কণ্ঠে—বৎস ধৃতরাষ্ট্র, যদি তোমার পুত্র আগে ভূমিষ্ঠ হয় তাহলে নিশ্চিন্ত জেনো, সেই হবে ভরত-কুরু বংশের রাজা। তবে আমার মনে হয় এখন তোমার মন থেকে এই ভাবনা দুর করে সুন্দর একটি ভাগ্যবান পুত্র লাভের আশায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা উচিত।

আসলে ধৃতরাষ্ট্র নিশ্চিত ছিলেন গান্ধারীর সন্তান আগে ভূমিষ্ঠ হবে। কুন্তীর অনেক আগে গান্ধারী গর্ভবতী হয়েছেন। এখন তার গর্ভমুক্তির প্রতীক্ষা। কিন্তু বৎসরকাল অতিক্রম হয়ে যায় তবু গান্ধারীর সন্তান

ভূমিষ্ঠ হয় না। তিনি গর্ভবহন কবে নিয়ে চলেছেন। কতদিন আর কতদিন। ভালভাল সমস্ত রাজবৈদ্যদের এনে দেখানো হল। তারা কেউ কোন কারণ অনুসন্ধান করতে পারলেন না। কোন ওষুধে কোন কাজ হল না। ধৃতরাষ্ট্রের উৎকণ্ঠা বেড়ে যায়। এরই মধ্যে একদিন বিদুর এসে জানালেন কুন্তী নির্দিষ্ট সময়ে পুত্রবতী হয়েছেন। সংবাদ শুনে স্থীর হয়ে যান ধৃতরাষ্ট্র। একেই বলে ভবিতব্য। পায়ের তলা থেকে মাঠি সরে যায়। কেঁপে ওঠে ধৃতরাষ্ট্রের বুক। আশ্চর্য্য! গান্ধারীর পর গর্ভধারণ করে কুন্তী নির্দিষ্ট সময়ে পুত্র সন্তান লাভ করলো, অথচ তার পত্নী গান্ধারী সময় উতীর্ণ হওয়া সত্বেও এখনও গর্ভধারণ করে রইল নিশ্চল পাথরের মতো। হতাশায় বুক ভেঙ্গে যায়; অথচ ভাগ্যের লিখন তিনি খণ্ডন করবেন কিভাবে। এই ক্ষেত্রে গান্ধারীকে অভিযুক্ত করে কোন লাভ নেই। গান্ধারী একজন নারী। নারীমাত্র মনের গভীরে মা হওয়ার বাসনা প্রত্যেকের আছে এবং থাকে, অতএব বলা যায় এই ইচ্ছা গান্ধারীর মধ্যেও ছিল। আর ছিল বলেই গান্ধারী শিবের বর থাকা সত্বেও ব্যসদেবের কাছে শতপুত্রের জননী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন। কাজেই গান্ধারী নিজেও জানতেন তিনি একদিন না একদিন সন্তানের জননী হবেন। গর্ভধারণ এবং গর্ভমোচন কোনটাই মানুষের হাতে নয়। বিধির বিধান। এহলো ঈশ্বরের ইচ্ছা-অনিচ্ছার খেলা। কাজেই গর্ভধারণ করা সত্বেও ঠিক সময় মতো কেন গান্ধারী প্রসব করতে পারলেন না, কেন তাকে গর্ভ দীর্ঘসময় পর্যন্ত বহন করতে হল এই কথার উত্তর তার পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তার নিজেরও ভালোলাগছিল না এই গর্ভযন্ত্রনাকে ভোগ করতে। প্রতিদিন তাকে স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের কাছে অনেক কথা শুনতে হয়। ধৃতরাষ্ট্র পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রত্যাশায় অধীর হয়ে আছেন। গান্ধারী জানেন স্বামীর মনের এই উদবীগ্নতার কারণ। তাই তিনি বারবার উৎকণ্ঠিত স্বামীকে আস্বস্ত করে বলছেন—চিন্তা কর না স্বামী আমার সন্তান আগেই ভূমিষ্ঠ হবে। আমাদের সন্তানই হবে ভরত-কুরুবংশের জ্যেষ্ঠপুত্র। গান্ধারীর কথায় আস্বস্ত হয়েছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। কিন্তু কুন্তীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদে তিনি একাবারে ভেঙ্গে পড়লেন।

খবর গেল অন্দরমহলে। রাজমাতা সত্যবতী আনন্দে বিহ্বল হয়ে

পড়লেন। যাক ভরত-কুরুবংশের বৃদ্ধি ঘটেছে। তিনি এই বৃদ্ধি নিজের চোখে দেখে যেতে চেয়েছিলেন। শাঁখ বাজল, শোনা গেল উলুধ্বনি। বাজমাতা সত্যবতী স্বস্তি নিশ্বাস ফেললেন। তার মনের ভয় দুর হল।

কিন্তু কুন্তীর পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার খবর শুনে গান্ধারী মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে গেলেন। এ'কি শুনছেন তিনি? ঠিক কথা শুনছেন তো? তারপরে গর্ভবতী হয়ে কুন্তী পুত্রের জননী হয়েছে, অথচ তিনি এখনও গর্ভধারণ করে চলেছেন। এই প্রথম আমরা গান্ধারীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভ, ঈর্ষা, বেদনা প্রতিফলিত হতে দেখলাম। ধৈর্য্যশীলা গান্ধারী ধৈর্য্য হারিয়ে হাতের কাছে যা ছিল তাই রাগে ক্ষোভে ছুঁড়ে ফেললেন। বারবার মনে হল স্বামীকে তিনি এখন কি ভাবে সান্ত্বনা দেবেন। তার মনের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস ছিল, তা ওই এক সংবাদে বিনাশ হল। তাব মনে হল অকারনে তার আর এই গর্ভধারনের প্রয়োজন নেই। যে কারণের জন্য তার গর্ভধারণ সেই কারণের আসল জবাব কুন্তি দিয়েছেন। তার ভূমিষ্ঠ পুত্র সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, সেই হবে ভবিষ্যৎ কুরুবংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র। অতএব এতকাল ধরে তিনি যে আশা নিয়ে গর্ভধারণ করে এসেছেন তার আর কোন প্রয়োজন নেই। যে সন্তান নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হতে পারিনি, তার আর ভূমিষ্ঠ হয়ে দরকার নেই, গর্ভের মধ্যেই তার পরমায়ু শেষ হওয়াই বাঞ্চনীয়। আসলে মনের বিষন্ন বিহ্বলতা তাকে আত্মধিক্কারের মধ্যে দিয়ে আত্মপীড়নের পথে নিয়ে গেল। কাউকে কিছু না বলে একান্ত ঈর্ষার তাড়নায় তিনি হটকারী রমনীর মতো গর্ভপাতের চেষ্টা করলেন। আসলে কুন্তীর পুত্রসংবাদ ভূমিষ্ঠ হওয়া সংবাদ শুনে গান্ধারীর মতো একজন ধীর স্থীর রমনী যে সহসা উন্মাদিনীর মতো আচরণ করবে বোঝা যায় নি। গান্ধারীতো নারী, তারও সন্তানের প্রয়োজন, যদি নারীর কাছে সন্তানই কাম্য হয়, তাহলে গান্ধারী গর্ভপাত ঘটানোর সিদ্ধান্ত নিলেন, কেন? আসলে গান্ধারীর মনের মধ্যে যে ঈর্ষার আগুন প্রতিদিন তিলতিল করে জ্বালিয়ে দিয়েছেন অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র,—এটা হল সেই ঈর্ষার বহিঃপ্রকাশ, তার মনের দীর্ঘ প্রত্যাশার ভঙ্গের অন্তহীন ক্রোধের অভিব্যক্তি। বেদনা ক্লিষ্ট গান্ধারীর বারবার মনে হয়েছে তিনি তার অন্ধ স্বামীকে এখন আর কি বলে সান্ত্বনা দেবেন। এতদিন তিনি স্বামীকে

ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। তার মনে জাগিয়ে ছিলেন আশার আলো। আজ সেই আলো নিভে গেছে। কুন্তী পুত্র সন্তান প্রসব করেছে, অথচ এখনও তিনি একইভাবে গর্ত ধারণ করে বসে আছেন, গর্ভমুক্তির কোন লক্ষণ নেই। গান্ধারীর মনের যাবতীয় বেদনা, ঈর্ষার জন্য মুলত দায়ী ছিলেন অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র। স্বামীর ইচ্ছা'কে যথার্থভাবে পুরন করতে না পারার জন্যই তিনি আত্মপীড়নের পথ বেছে নিয়ে নিজের গর্ভপাতের জন্য নিজেই নিজের গর্ভে আঘাত করলেন। এই আঘাতের ফলেই হোক অথবা অসময়ে গর্ভপাতের জন্যই হোক গান্ধারী একটি গোলকার স্থুল লৌহকঠিন মাংসপিন্ড প্রসব করলেন। ওই মাংসপিন্ডটিকে দেখে শিউরে উঠলেন গান্ধারী। এতদিন ধরে ওই পাপ তিনি গর্ভে লালন করে এসেছেন। তিনি ওই মাংসপিন্ডটিকে জঞ্জালের স্তুপে ফেলে দেবেন বলেই ভাবছিলেন। ফেলে দেবার আগে একবার ভাবলেন তিনি তার অন্ধ স্বামীকে ডেকে বলবেন কিনা, দেখ স্বামী, তোমার ঔরসে আমার গর্ভে কি কদর্য এক মাংসপিন্ড আমি ধারন করেছিলাম। এই মাংসপিন্ড কখনই প্রাণ পেতে পারে না। আত্মহননের জন্য যে ক্রোধ, ক্ষোভ, অভিমান, ঈর্ষার প্রয়োজন হয়, সবই তখন সেই মুহুর্তে গান্ধারীর মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছিল। মন থেকে বিস্মৃত হয়েছিল ব্যাসদেবের আর্শীবাদের কথা। আসলে স্বামীর প্রত্যাশাকে পূর্ণ করাই ছিল গান্ধারীর উদ্দেশ্য। স্বামীকে তিনি কথা দিয়েছিলেন তার গর্ভজাত সন্তান কুরুবংশের জ্যেষ্ঠপুত্র হবে—সেই কথা তিনি রাখতে পারেন নি। কুন্তীর পুত্র হয়েছে কুরুবংশের জেষ্ঠপুত্র। এই লজ্জা ও ঈর্ষার যন্ত্রনায় উন্মাদিনী হয়ে গান্ধারী গর্ভপাত ঘটালেন। ওই মাংসপিন্ড তিনি অপবিত্র বলে জঞ্জালে ফেলে দেবার আগেই ত্রাণকর্ত্তা হিসাবে ব্যাসদেব এসে হাজির হলেন।

অনেকে হয়ত বলবেন, ব্যাসদেব ঠিক সেই মুহুর্তে উপস্থিত হলেন কি করে? কিভাবে জানলেন তিনি গান্ধারীর গর্ভপাতের ঘটনা? তিনি কি ওই সময় গান্ধারী ভবনে ছিলেন? না—আসলে ব্যাসদেব ধ্যানযোগে সমস্ত ঘটনা জানতে পারেন। আগের দিনের যোগী পুরুষেরা ধ্যানে জানতে পারতেন, ব্যাসদেব সেইভাবে ধ্যানযোগে ঘটনাটি জেনেছিলেন

এবং অতি সত্বব তিনি সুক্ষ্ম দেহে চলে আসেন গান্ধারী ভবনে। আসলে ব্যাসদেব গান্ধারীকে শতপুত্রের জননী হওয়ার আশীর্বাদ করেছিলেন। তার সেই আশীর্বাদ কখনই বিফল হতে পারে না। নিজের দায়বদ্ধতার কারণে তাকে আসতে হয়েছিল গান্ধারীর কাছে। তিনি গান্ধারীকে সস্নেহে বললেন, তুমি একি করলে মা! এত অধৈর্য্য হওয়া তোমার উচিত হয়নি। আমি তোমায় শতপুত্রের জননী হওয়ার আশীর্বাদ করেছিলাম, তুমি আমার প্রতি সেই বিশ্বাস রাখতে পারলে না।

গান্ধারী সেই মুহুর্তে ব্যাসদেবের সম্মুখে সমস্ত সত্য উপস্থিত করে বললেন—আমি আমার স্বামীকে কথা দিয়েছিলাম আমার পুত্র কুরুবংশের জ্যেষ্ঠপুত্র হয়ে জন্মাবে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য আমার পরে গর্ভধারণ করে কুন্তী আগে পুত্রবতী হয়েছে। তার পুত্রই হয়েছে এই বংশের জ্যেষ্ঠপুত্র। অথচ আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে আমার এখনও পর্যন্ত গর্ভমুক্তি হল না। স্বামীর কথা রাখতে না পারার কারণে তাই আমি নিজের প্রতি ধীক্কার বশে নিজেই নিজের গর্ভে আঘাত করে গর্ভপাত ঘটিয়েছি। তারপর কান্না ভেজা গলায় অনুযোগের সুরে ব্যাসদেবকে বললেন, আপনি আমায় শতপুত্রের বর দিয়েছিলেন কিন্তু আমি কি পেলাম ওই অশুচি গোলাকার স্থূল লৌহকঠিন একটি মাংস খণ্ড।

ব্যাসদেব সমস্ত ঘটনা অনুধাবন করে শান্ত কণ্ঠে গান্ধারীকে বললেন, কাজটা তুমি ঠিক করনি। মানুষের জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু—নিয়তির অধীন। যখন যার মুক্তির সময় আসবে তখনই তার মুক্তি, ঘটবে। জোর করে কেউ কাউকে সময়ের আগে মুক্তি দিতে পারে না। আমি তোমায় শতপুত্রের জননী হওয়ার বর দিয়েছিলাম, আমার সিদ্ধ বাক্যতো মিথ্যে হতে পারে না কন্যা। গান্ধারী বললেন, আমি চেয়েছিলাম, আমি এই বংশের প্রধানা মহিষী হিসাবে এই বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রসব করবো।

ব্যাসদেব বললেন, তোমার মনে যখন এই ইচ্ছা ছিল তখন তুমি আমায় সেকথা বলনি কেন? তুমিতো চেয়েছিলে শতপুত্র। তারপর একটু থেমে অত্যন্ত শান্ত সংযত কণ্ঠে ব্যাসদেব বললেন, শোন কল্যানী, অন্যের হিংসা আর অভিলাষকে চরিতার্থ করার জন্য নিজেকে কখনও নিয়োজিত কর না। এটা এক ধরনের পাপ। মনে রেখ, যা

সত্য, যা বিবেচনা যোগ্য তাই সর্বদা ঘটে থাকে। আর যা ঘটে সেটাকেই আমাদের মেনে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। মন থেকে তুমি এই বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র লাভের আশা ত্যাগ কর—এটা তোমার নিজস্ব অভিলাষ নয়। মনের মধ্যে শতপুত্র লাভের যে বাসনা তোমার ছিল, সেই বাসনাকে জাগিয়ে তোলো। মনের রেখ আমার কথা কখনও বিফল হতে পারে না। এই বলে ব্যাসদেব উপস্থিত দাসীদের একশোটি কলসিতে ঘি ভরে আনতে নির্দেশ দিলেন।

ব্যাসদেবের কথা মতো পরিচারিকারা একশোটি ঘৃতপূর্ণ কলসি নিয়ে এল। ব্যাসদেব আসনে বসলেন। তার সম্মুখে ওই মাংসপিণ্ড। তিনি মন্ত্র পড়ে প্রথমে ওই মাংস পিণ্ডটিকে একটি ঠাণ্ডা জল পূর্ণ পাত্রে রাখলেন। কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা জলে মাংস পিণ্ডটি ভিজিয়ে রাখার পর তিনি ওই ভিজে মাংসপিণ্ডটিকে খণ্ডন করতে শুরু করলেন। একশোটি খণ্ড একেকটি কলসির মধে রাখা হল। তারপর কলসির মুখ বন্ধ করে একটি সুরক্ষিত স্থানে রাখতে বললেন। তারপর গান্ধারীকে বললেন, মন থেকে সমস্ত গ্লানি ধুয়ে মুঝে ফেলে তুমি শুচীভাবে এই কলসীগুলিকে রক্ষনাবেক্ষণ করবে। একবছর সময় অতিক্রম হলে তবেই কলসির মুখ খুলবে। কোনরকম কৌতুহল প্রকাশ করে কলসির মুখ যেন আগে খোলা না হয়। মনে রেখ গান্ধারী আমার কথা বেদবাক্য, কখনই তুমি তা অমান্য করার চেষ্টা কর না। গান্ধারী লজ্জিত ভাবে নীরব রইলেন। ব্যাসদেব বললেন, কল্যানী গান্ধারী তুমি মনে হয় মনে মনে একটি কন্যা সন্তান প্রার্থনা করেছিলে সেই কারণে একটি অঙ্গুলিসমান খণ্ড উদ্বৃত্ত থেকে গেছে। ওই উদ্বৃত্ত খণ্ডটিকেও একই ভাবে প্রথমে ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে নিয়ে একটি ঘৃতপূর্ণ কলসিতে রেখে একই নিয়মে সুরক্ষিত স্থানে রাখা হল। ওই উদ্বৃত্ত খণ্ড থেকেই জন্ম হয়েছিল গান্ধারীকন্যা দুঃশলার।

ব্যাসদেব বারবার গান্ধারী বললেন, কন্যা কারো প্ররোচনায় আর কখনও নিজের মন বিরুদ্ধ কাজ করো না। এখন থেকে তুমি নিজে এই কলসিগুলির প্রতি যত্নবান হবে। কোন কৌতুহল প্রকাশ করবে না। এই বলে ব্যাসদেব চলে গেলেন।

বর্তমানের যারা পাঠক, তাদের কাছে ঘটনাটা অলৌকিক বলে মনে

হতে পারে। প্রশ্ন আসতে পারে এই পদ্ধতিতে সন্তান দান করা যায় কিনা? যারা মহাভারতের আধুনিক ব্যাখাকার তারা বলেছেন, ওই ঘৃতই ছিল আগের দিনের সমস্ত ঔষধ-রসায়নের প্রতীক। আর কুম্ভ শব্দের অর্থ হল কলসি, এই কলসিব মধ্যেই গান্ধারীর গর্ভস্থাপন নিশ্চয় সম্ভব নয়। আসলে আগের দিনের সমাজে কুম্ভদাসী বলে একশ্রেণীর রমনী ছিলেন, এদের চলতি ভাষায় বলা যায় বেশ্যাপতির দাসী। এদের গর্ভে কোন পুরুষের বীজ সংস্থাপিত করা হত। সম্ভবত এদেরই কুম্ভ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। মহাভারতেব যুগে অনেকেই কলসিতে জন্মেছেন, বশিষ্ঠ্যের জন্ম কুম্ভের মধ্যে। দ্রোণাচার্য্যের জন্ম দ্রোণ বা কলসীর মধ্যে। অর্থাৎ এদের পিতার বীজ অন্য কোন নারীর গর্ভে সংস্থাপিত করা হয়েছিল। শুক্রবীজ অন্যত্র প্রতিস্থাপনের জন্য অতি শীতলতার সঙ্গে আয়ুসকারী ঘৃতেব রসায়ন প্রক্রিয়ার কথা কল্পনা করা সত্যি অত্যন্ত বিস্ময়ের। আধুনিক বিজ্ঞানীরা যে নলজন্মা শিশুর অথবা অন্যমায়েব গর্ভে প্রতিস্থাপিত বীজের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করেন, এই বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির চিন্তাধারা যে মহাকবি ব্যাসের কল্পনায় এসেছিল তারই প্রমাণ হল এই কুম্ভজন্মা শিশুবা। ব্যাসদেবের ইচ্ছানুসারে সেদিন গান্ধারী গর্ভসংস্থ বীজ শতখণ্ডে বিভক্ত করে ব্যাসদেব শত কুম্ভে সংস্থাপিত করেছিলেন। অর্থাৎ একশ একজন কুম্ভদাসীর গর্ভে গান্ধারীর গর্ভস্থ বীজ ব্যাসদেব সংস্থাপিত করেছিলেন এবং এক বৎসরকাল পরে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে প্রথম পুত্র ওই কুম্ভনারী মারফৎ লাভ করেছিলেন, যার নাম হয় দুর্যোধন।

দুর্যোধনের জন্মমুহূর্ত আদৌ সুলক্ষণ ছিল না। তিনি জন্ম মুহূর্তে যে কান্নাটুকু কাঁদলেন, সেই কান্নার শব্দ ছিল অবিকল গাধার ডাকের মতো। শুধু গাধা নয়, শিয়াল, কুকুর, শকুন, কাক প্রভৃতি প্রানীরাও নাকি ডেকে উঠেছিল। অর্থাৎ বোঝা যায় তারজন্ম মুহূর্ত আদৌ শুভকর ছিল না। ববং শিশুর কান্নাশুনে অভিজ্ঞ প্রবীন লোকেরা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। বোঝা গেল এই ডাকের মধ্যে আছে ভরত বংশের দুর্ভাগ্যের সূচনা। ধর্মাত্মা বিদুর সর্বপ্রথম এই অমঙ্গল সূচক কান্না শুনে আতঙ্কিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন, হে জ্যেষ্ঠ, তুমি এখুনি তোমার

এই পুত্রকে হত্যা করার নির্দেশ দাও। এই সন্তানের জন্ম এই পরিবারের পক্ষে আদৌ সুখকর নয়। তার কারণেই এই বংশ ধ্বংস হতে পারে।

ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু বিদুরের এই কথায় কর্ণপাত করেন নি। মনে মনে বরং তিনি সুখী হয়েছিলেন। হাজার হোক তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তার বুকের মধ্যে তখনও জ্বলছে ঈর্ষার আগুন। মনে মনে তিনি যেন অনুভব করলেন, এই সন্তানই তাকে রক্ষা করবে। তার স্বপ্নকে সার্থক করবে। তাই তিনি আত্মমোহে বিভোর হয়ে বিদুরের কথায় কর্ণপাত করলেন না। বরং তিনি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আনন্দে বিভোর হয়ে এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসলেন রাজসভায় উপস্থিত গণ্যমান্যদের কাছে। বিশেষভাবে তার এই প্রশ্নটি ছিল মহামতি ভীষ্মের উদ্দেশ্যে। কি কঠিন, নির্মম প্রশ্ন অথচ কত সহজ ভাবে উচ্চারণ করলেন ধৃতরাষ্ট্র। তিনি ভীষ্মের উদ্দেশ্যে বললেন, আচ্ছা কুন্তী পুত্র যুধিষ্ঠির হল এই বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র—সেই হল সকলের বড়। তারপর নিশ্চয় আমার পুত্র। যুধিষ্ঠির যদি কোন কারণে সিংহাসনের অধিকার হারায় তাহলে নিশ্চয় তারপর এই সিংহাসনের দাবীদার হবে আমার পুত্র দুর্যোধন।

আশ্চর্য্য প্রশ্ন। এই মুহুর্তে এই প্রশ্নতো অবান্তর। কোন সুস্থ মানুষ কি কখনও এমন প্রশ্ন করতে পারে? তবে কি ধৃতরাষ্ট্রের মনের মধ্যে কোন অশুভ চিন্তার উদয় হয়েছে। একজন কার্যনির্বাহী রাজার মুখে এমন প্রশ্ন আদৌ শোভন নয়। এই প্রশ্নের মধ্যে অনেক অর্থ বহন করছে। কাজেই ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নটা শুনে ভীষ্ম অত্যন্ত সচকিত হয়ে তাকালেন বিদুরের দিকে। বিদুর স্পষ্ট বক্তা! তিনি বুঝতে পারলেন কি বলতে চান ধৃতরাষ্ট্র। তবে কি সে যুধিষ্ঠিরের প্রান নাশ করবে? তা নাহলে যুধিষ্ঠিরের পর তার পুত্র রাজা হবে কিনা এমন প্রশ্ন তার মাথায় এলো কেন? তবে কি সে মনে করছে, সেই হল যুধিষ্ঠিরের পরমায়ুর প্রধান কর্ত্তা।

ভীষ্ম উত্তর দিলেন না। তিনি নিঃশব্দে সভাকক্ষ পরিত্যাগ করলেন। বিদুর বললেন, এমন নীচতা মন থেকে দুর কর ভ্রাতা। এই মুহুর্তে ধৃতরাষ্ট্রকে কিন্তু কোনরকম বিচলিত হতে দেখা গেল না। এমনভাব করলেন যেন তিনি যুধিষ্ঠিরকে মন থেকে মেনে নিয়েছেন। মুখে কোনরকম হতাশা প্রকাশ না করলেও মনে মনে তিনি যে ঈর্ষান্বিত

হয়েছেন, এইভাবটা কিন্তু কিছুতেই চেপে রাখতে পারলেন না। রাজা হয়ে তিনি বেশ কিছু ব্যতিক্রম আচরণ করলেন। নিজের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া সত্বেও তিনি ব্রাহ্মনদেব অর্থ, বস্ত্র, জমি অথবা গোধন কিছুই দান করলেন না। এর কারণ তার অন্তরের জমায়িত ক্ষোভ। তার সন্তান তার ইচ্ছানুসারে জ্যেষ্ঠ হতে পারেনি। এছাড়া এই ব্রাহ্মণেরা তার সন্তানের জন্মলক্ষন বিচার করে বলেছিলেন, মহারাজ এর লক্ষণ কোন অবস্থায় শুভকর নয়। আপনার উচিত ধর্মজ্ঞ বিদুরের কথা মতো এই শিশু সন্তানকে হত্যা করা, আর যদি হত্যা করতে না চান তবে অবিলম্বে ত্যাগ করা। ধৃতরাষ্ট্র এর কোনটাই করেন নি। বরং তাকে নীরব থাকতে দেখে বিদুর উত্তেজিত কণ্ঠে বলেছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র তুমি রাজা—তোমার নিরপেক্ষ হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন সমগ্র রাজ্যের প্রজাকুলকে রক্ষা করা। রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আমি তাই তোমাকে ধর্মরক্ষার কারণে অনুরোধ করছি তুমি তোমার এই পুত্রকে অবিলম্বে হত্যা কর। তোমার শতপুত্রের মধ্যে একটি পুত্র নষ্ট হলেও তোমার নিরানব্বইটি পুত্র বর্তমান থাকবে। তুমি তাদের নিয়ে সুখী হতে পার। কোন প্রয়োজন নেই এই অশুভ লক্ষণযুক্ত সন্তানকে বাঁচিয়ে রেখে সমস্ত রাজবংশের ক্ষতিকরা, ধ্বংস করার। তারপর ধর্মজ্ঞ বিদুর আরো সহজভাবে ধর্মের ব্যাখা করে ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝালেন। বললেন—শোন শোন জ্যেষ্ঠ, সমগ্র গ্রাম বাঁচাতে হলে একটি কুলত্যাগ করা ভাল। আবার সমগ্র দেশ রক্ষা করার জন্য একটি গ্রাম ত্যাগ করা ভাল—এটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। আমি তোমাকে ভালোর জন্য অনুরোধ করছি। নচেৎ ভবিষ্যতে তোমাকে তোমারই নিজের কারণেই কষ্ট পেতে হবে। বংসকে যে ব্যক্তি সজ্ঞানে ধ্বংস করে তার মতো পাপিষ্ঠ কেউ হয় না। নরকেও তার স্থান হয় বলে জানা নেই। বিদুর বিদুরের মতো ধর্ম, ন্যায়, নীতির কথা, সত্যের কথা বলে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্র নির্বিকার, অবিচল। তার মনে হল তার পুত্রের প্রতি ঈর্ষার বশে রাজ্যশুদ্ধ মানুষ তার সন্তানকে পরিত্যাগের কথা বলছে। অসম্ভব—সন্তানকে পরিত্যাগ করা যায় না। বরং পুত্রের জন্ম মুহুর্ত থেকে ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে এক রাজসিক লালসা তাকে ভিতরে ভিতরে আড়া করে নিয়ে চললো। তার মনে হল, তার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে

তার যে করেই হোক বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তাকে এই বংশের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হিসাবে পথ করে দিতে হবে! হোক পান্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠপুত্র, যে করেই হোক যুধিষ্ঠিরকে সরিয়ে তার নিজের জায়গায় বসাতে হবে পুত্র দুর্যোধনকে। ভাবতে গিয়ে ওষ্ঠদ্বয় কুঞ্চিত হল। আবার উঠে এলো সেই এক প্রশ্ন—যুধিষ্ঠিরের পর আমার পুত্র রাজা হবে—তাইতো? এটাইতো সঠিক নিয়ম।

ধৃতরাষ্ট্রের মনের মধ্যে এই প্রশ্নটা বার এসেছিল কেন? তবে কি তিনি কোন গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন? কারা ছিল এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে? ভীষ্ম, বিদুর, কৃপ—এরা কেউই এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিলেন না। ছিলেন না রাজমাতা সত্যবতী। তাহলে কি গান্ধারী তাকে এই ষড়যন্ত্রে উৎসাহ যুগিয়েছেন? অসম্ভব গান্ধারীর মনে ব্যাথা বেদনা ক্ষোভ, ঈর্ষা, থাকলেও, তিনি কোন অবস্থায় যুধিষ্ঠিরের ক্ষতি হোক এটা চান নি। হাজার হোক তিনি একজন নারী এবং সর্বোপরি জননী। সেই কারণে তার মধ্যে যুধিষ্ঠিরের কোন ক্ষতি করার বাসনা ছিল না। প্রথম দিকে তার মধ্যে যে ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠেছিল তার জন্য দায়ী ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং। পরে ব্যাসদেবের কথায় তার সেই ঈর্ষা অনেকটা প্রশমিত হয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন ভাগ্যের বিধানকে কেউ খণ্ডন করতে পারে না। স্বাভাবিকভাবে ভাগ্যের গতি পথকে অবরুদ্ধ করতে গেলে যে বিকৃত অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা কখনই সমাজের কাছে মঙ্গলদায়ক হয় না। সমগ্র মহাভারত ঘেঁটে আমরা এমন কোন নজির বার করতে পারি না যাতে বলা যায় গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে তার মনের ঈর্ষাকে কার্যে পরিণত করার জন্য ইন্ধন যুগিয়ে ছিলেন। তবে এই ব্যাপারে অনুমান সত্য হোক বা মিথ্যে হোক একথা বলা যায় ধৃতরাষ্ট্রের মুল মন্ত্রনা দাতা ছিলেন শকুনি। ধৃতরাষ্ট্রের শ্যালক। ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি বুঝিয়েছিলেন, তুমি অন্ধরাজা তাই তুমি কারো চেহারাগুলোকে প্রত্যক্ষ করতে পারছ না। এই রাজসভায় তোমার পাশে যারা আছেন—সেই ভীষ্ম, বিদুর, কৃপ, এরা কেউই তোমার নিজের লোক নয়। এরা সকলেই পান্ডুর প্রতি দুর্বল। এরা কেউ তোমার ভালো চায় না। আর সেইজন্য তারা তোমাকে, তোমার পুত্রকে হত্যা করার কথা বলেছেন। আমি তোমার একজন নিকটতম আত্মীয়। আমি তোমার

পুত্রের ভাগ্য গননা করে দেখেছি। তোমার এই পুত্র হবে আগামী দিনে এই রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী। তারা এটা বুঝেছেন বলেই তোমাকে বার বার পুত্র হত্যার কথা বলছেন। শোন ধৃতবাষ্ট্র, আমি তোমায় বলছি তোমার পাশে ভীষ্ম নেই, বিদুর নেই, কৃপ নেই। একমাত্র আমি আছি। তুমি আমার বুদ্ধি ও বিবেচনা অনুযায়ী চলার চেষ্টা কর, তাহলে দেখবে তুমি তোমার অভিষ্ঠে পৌঁছাতে পেরেছ। এই সঙ্গে শকুনি আরও বিশেষ ভাবে সাবধান করে দিয়েছিলেন রাজমাতা সত্যবতী সম্পর্কে। তিনি ধৃতরাষ্ট্র বললেন, ওই বৃদ্ধা মহিলা আদৌ সুবিধার মহিলা নয়। তিনি পিছন থেকে সমস্ত কলকাঠি নাড়ছেন। ওরই কারণে তুমি 'জন্মান্ধ' বলে সিংহাসনে বসতে পারনি। আবার উনি তোমার কাছে বলে পাঠিয়েছেন, ধৃতরাষ্ট্র যেন তার নিজের সন্তানদের বিষয়ে বেশী না ভাবে। এই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হল পান্ডুর পুত্র যুধিষ্ঠির। রাজমাতা এই সিদ্ধান্তই এই রাজবংশের শেষ কথা। তার বিরুদ্ধে ভীষ্ম একটিও কথা বলবেন না। তিনি এই রাজবংশের দাবীদার নয়, সেবক মাত্র। শকুনি এমনভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে প্রতিনিয়ত বোঝাতে লাগলেন যে তার মধ্যে ঈর্ষার আগুন আরো দ্বিগুন ভাবে প্রজ্বোলিত হল। শকুনি বললেন, ওরা তোমাকে যে যাই বলুন না কেন, তুমি ওদের কোন কথায় কর্ণপাত করবে না। ভীষ্ম বৃদ্ধ হয়েছেন। বৃদ্ধ হলে প্রজ্ঞেরও মতিভ্রম হয়। তাছাড়া তিনি নিজের ইচ্ছায় কাজ করেন না, তাকে রাজমাতা যেভাবে নির্দেশ দেন তিনি সেইভাবে কাজ করেন। মনে রেখ তুমি এখন রাজা। রাজা হিসাবে তোমাব কাজ হল প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে এদেব প্রত্যেকের ক্ষমতাগুলো একে একে কেড়ে নিজের হাতে নেওয়া। একবার যদি তুমি ওদের ক্ষমতাগুলোকে খর্ব করে সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিতে পার, তাহলে তোমার মনের অভিলাষ মোটেই অপূর্ণ থাকবে না। আমি তোমার শ্যালক, তোমার একান্ত আপনজন, আমার ভগ্নীর নিরাপত্তার কারণেই আমি এই রাজপ্রাসাদের সবসময় তোমার কাছাকাছি আছি এবং থাকবো। তুমি আমার উপর আস্থা রাখতে পার। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার পুত্র দুর্যোধনকে আমি উপযুক্ত করে তুলবো। সেই হবে এই বংশের পরবর্তী রাজা।

শকুনির কথায় উদ্দীপ্ত ধৃতরাষ্ট্র তাই কারো কথা আর শোনার চেষ্টা

করেন নি। মনে মনে তিনি শকুনির উপর ভরসা করে নিজের মনের কল্পনায় ভেসে বেড়িয়েছেন। রাজা হিসাবে উপেক্ষা করতে শিখেছেন রাজমাতার আদেশ। ভীষ্মকে তিনি কেবল মাত্র নামমাত্র অভিভাবককে পরিণত করেছিলেন। কৃপ হলেন রাজসভার দর্শকমাত্র। আর বিদুর—তিনি ধর্মজ্ঞ ও সুবক্তা হলেও ধৃতরাষ্ট্র তাকে সবসময় পাশ কাটিয়ে গেছেন। ধীরে ধীরে অন্ধরাজার অন্যতম পার্শ্বচর ও মন্ত্রনাদাতা হয়ে উঠেছিলেন শকুনি।

এখন প্রশ্ন হল গান্ধারী কি শকুনির মনভাবের কথা কিছুই জানতেন না? তিনি কি গুনাক্ষরেও বুঝতে পারেন নি তার পরমপ্রিয় ভাই তার স্বামীর মনের মধ্যে ঈর্ষার ইন্ধন যুগিয়ে চলেছেন। মনে হয় নিশ্চয় জানতেন। তিনি একাবারে বোকাসোকা, নিলির্প্ত মহিলা ছিলেন না। হয়ত এটা ঠিক প্রথমদিকে তার মনের মধ্যে বেদনা ছিল, ক্ষোভ ছিল। ধৃতরাষ্ট্রে অন্তরের ঈর্ষা তাকে গর্ভবতী অবস্থায় প্রলুব্ধ করেছিল, পরে তিনি ব্যাসদেবের কথায় তার অন্তরের ক্ষোভ ও ঈর্ষাকে কিছুটা পরিত্যাগ করেছিলেন, তাবলে এই নয় যে তার মনে কোন সুপ্ত কামনা ছিল না। তিনি নিজেকে নিরপেক্ষ রেখেছিলেন। নিরপেক্ষ গান্ধারী ছিলেন না। তার পুত্র জ্যেষ্ঠপুত্র হয়ে জন্মাতে না পারার জন্য তার মনে যথেষ্ঠ দুঃখু ছিল, আর সেই কারণে হয়ত গান্ধারী শকুনির মতলব বুঝতে পেরেও চুপ করেছিলেন। একবারের জন্যেও তিনি তার ভাই শকুনিকে এই ঘরোয়া বিষয়ের ব্যাপারে নাক গলাতে নিষেধ করেন নি। তিনি সর্বক্ষণ মৌনতা নিয়েছেন। সবকিছু কানে শুনেও কোন রকম মন্তব্য করেণ নি। ভাবটা এমন যা হচ্ছে তা হয়ে যাক, তাতে আমার ভালো বই খারাপ কিছু হবে না। মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ। এই ভাবনা যদি তার মনে না থাকত তাহলে অবশ্যই তিনি শকুনিকে বাধা দিতেন। কেন তিনি ভাই শকুনিকে নিজের আশ্রয়ে হস্তিনাপুরে রেখেছিলেন? তার নিরাপত্তারতো কোন অভাব ছিল না, যে কারণে আত্মরক্ষার জন্য একজন আপনজন হিসাবে নিজের সহদরকে কাছে রাখতে হবে। ব্যাপারটা সাধারণ দৃষ্টিতে বিসদৃশ্য লাগতেই পারে। হাজার হোক একজন অন্য রাজ্যের যুবরাজ, তিনি তার নিজের রাজ্য ছেড়ে অন্যরাজ্যে নিজের ভগিনীর আশ্রয়ে পড়ে রইলেন কেন? কেন তিনি

গান্ধারীকে শ্বশুরালয়ে পৌঁছে দিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন না—সেকি গান্ধারীর অনুরোধে? মহাভারতের কবি সেই ব্যাখা দিতে গিয়ে গান্ধারীকে কোনভাবে দায়ী করেন নি, তবে বর্ত্তমানের দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে ঘটনা পরম্পরায় মনে হয় শকুনির হস্তিনাপুরে অবস্থানের পিছনে গান্ধারীর কিছুটা ভূমিকা নিশ্চয় ছিল। হয়ত গান্ধারী বুঝেছিলেন তার ভাই তার ভালোর জন্য তার অন্ধ স্বামীর পাশে ছায়ার মতো অনুসরণ করছে। শকুনি বুদ্ধিমান, অতএব সে বর্ত্তমান থাকতে তার স্বামীর কোন ক্ষতি হবে না। বরং ধৃতরাষ্ট্রের মনে রাজা না হওয়ার যে ক্ষোভ তা হয়ত শকুনি তার সন্তানের মধ্যে দিয়ে মিটিয়ে দেবে। গান্ধারী চেষ্টা করেও এই বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রশব করতে পারেন নি, এরজন্য তার মনে বেদনা ছিল, স্বামীর কাছে তিনি এই অপরাধবোধে মরমে মরে আছেন। শকুনি হয়ত ভগ্নীর সেই অন্তর বেদনা অনুভব করেছিলেন, সেই কারনেই তিনি ভগ্নীর দুঃখুমোচন করার উদ্দেশ্য নিয়ে হস্তিনাপুরে রয়ে গেলেন—এতে গান্ধারী কোন আপত্তি করেন নি আর শ্যালকের কৌশলে অবিভূত ধৃতরাষ্ট্র তাকে পরম নির্ভরতায় আঁকড়ে ধরেছিলেন। হস্তিনাপুর ছেড়ে গান্ধার রাজ্যে যেতে দেননি। শকুনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তিনি হস্তিনাপুরে পা দিয়ে বুঝেছিলেন এই রাজ্যে প্রকৃত শাসক হলেন ভীষ্ম। তাকে জ্ঞানে, বিচক্ষণতায়, বুদ্ধিতে এবং যুদ্ধ বিদ্যায় অতিক্রম করে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। তাই শকুনি যতটা পারতেন ভীষ্মকে প্রথম থেকে এড়িয়ে চলতেন। ভীষ্মও যে তাকে খুব একটা সুনজরে দেখেন না এটাও অত্যন্ত ভালো মতো জানতেন শকুনি। তিনি জানতেন ভীষ্ম অত্যন্ত ন্যায় পরায়ন ব্যক্তি, তিনি ভরত কুরুবংশের রক্ষক এবং অভিভাবক। কাজেই ধৃতরাষ্ট্রের অধর্মীয় ঈর্ষা এবং হিংসার পাশে তিনি সর্বক্ষন থাকবেন না। ধর্মের বিরুদ্ধচারণ করলেই বিদুর তাকে ত্যাগ করতে চাইবেন, বাক্যবানে তাকে জর্জ্জরিত করবেন। তবে বিদুরের চাইতে ভীষ্মের সমর্থন ও মতামত হল হস্তিনাপুরের মতামত। ধৃতরাষ্ট্রে মধ্যে আকাঙ্খা আছে কিন্তু সেই প্রত্যাশাপুরনের কৌশল তার জানা নেই। শকুনি বুঝলেন ধৃতরাষ্ট্রের কারণেই তার হস্তিনাপুরে থাকা দরকার। তবে তাকে কাজ করতে হবে নিঃশব্দে আড়াল থেকে, যাতে কেউ তাকে সন্দেহ করতে না পারেন।

শকুনি প্রথম হস্তিনাপুরের রাজনীতিতে নাক গলাতে শুরু করলেন, গান্ধারীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর। পাণ্ডু আগেই পিতা হয়েছেন। তিনি বসবাসে গেলেও, প্রকৃত পক্ষে তিনি হচ্ছেন হস্তিনাপুরের রাজা। তার অবর্ত্তমানে রাজকার্য চালাবার জন্য সিংহাসনে বসেছেন ধৃতরাষ্ট্র। এই অবস্থায় ভীষ্ম চাইছিলেন পাণ্ডু বনবাস জীবন ত্যাগ করে হস্তিনাপুরে ফিরে আসুক। তিনি নিজে বহুবার লোক পাঠিয়েছেন। রাজমাতার অনুরোধ নিয়ে বিদুর দেখা করছেন পাণ্ডুর সঙ্গে। কিন্তু পাণ্ডু বনবাস জীবন ত্যাগ করে হস্তিনাপুরে ফিরে আসতে রাজি হন নি। তার মনে অভিমান ছিল। জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র তাকে একবারও অনুরোধ করেন নি হস্তিনাপুরে ফিরে যাওয়ার জন্য। অথচ তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসনে ত্যাগ করে এসেছেন। ধৃতরাষ্ট্রের আচরণের মধ্যে যে গোপন হিংসা কাজ করছে এটা মনে হয় পাণ্ডু অনুভব করেছিলেন। আর এই কারণে নিজেদের নিরাপত্তার জন্যই মনে হয় তিনি হস্তিনাপুরের ফিরে আসতে চান নি। তবে এই কথা সত্য, ধৃতরাষ্ট্রের মতো পাণ্ডুর বৈষয়িক ব্যাপারে এতটা তীব্র লালসা ছিল না। যদি থাকতো তাহলে তিনি সন্তানদের ভবির্ষ্যতের কথা চিন্তা করে অবিলম্বে হস্তিনাপুরে ফিরে যেতেন। পাণ্ডু হস্তিনাপুরে ফিরে এলে ধৃতরাষ্ট্রের কোন স্বপ্নই সফল হত না। যুধিষ্ঠিরের পক্ষে জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে সিংহাসনে বসার দাবী আরও স্পষ্ট ও জোরদার হয়ে উঠতো। তখন বাধ্য হয়ে অস্থায়ী রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসন থেকে সরে যেতে হত। এই ক্ষেত্রে শকুনি তাকে রক্ষা করেছেন। ধৃতরাষ্ট্রের কানের ডগায় কেবল একটি কথা বাজিয়েছেন, ওহে অন্ধরাজা ভুলেও এমন কাজটি কর না। ভাতৃপ্রেমে গদগদ হয়ে কোন অবস্থায় যেন আবার তাকে বনবাসের পালা চুকিয়ে হস্তিনাপুরে ফেরার প্রস্তাব দিওনা। তুমি তার কারণে যত পার অশ্রুবিসর্জন কর, মৌখিক দুঃখু প্রকাশ কর, এমনকি রাজকোষ থেকে অর্থ সাহায্য কর, কিন্তু ভুলেও যেন পাণ্ডুকে হস্তিনাপুরে আসার কথা বলো. না।

ধৃতরাষ্ট্রও অক্ষরে অক্ষরে সেই আদেশ পালন করেছিলেন। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুর জন্য দুঃখু করেছেন, তার অকাল বৈরাগ্যের জন্য বেদনাহত হয়েছেন, নিয়মিত অর্থ পাঠিয়েছেন অথচ একবারের জন্য

কোনদিন পান্ডুকে বনবাসী জীবন ত্যাগ করে ঘরে ফেরার কথা বলেন নি। বরং ভীষ্ম, বিদুর তাকে বহুবার অনুরোধ করেছেন। রাজামাতা সত্যবতী পর্যন্ত আদেশ পাঠিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন, তিনি যেন অবিলম্বে পান্ডুকে হস্তিনাপুরে ফেরার কথা বলেন। অথচ ধৃতরাষ্ট্র প্রত্যেকের কথা শুনেছেন, সৌজন্যতা প্রকাশ করে পান্ডুকে হস্তিনাপুরে ফেরার জন্য অনুরোধ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েও, তিনি কিন্তু কখনই সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি। একবারের জন্য তিনি কাউকে দিয়ে বলে পাঠান নি, অথবা বিদুরকে বলেন নি, ভাই বিদুর তুমি পান্ডুকে হস্তিনাপুরে নিয়ে এস।

ধৃতরাষ্ট্রের মনের মধ্যে যে রাজসিক ঈর্ষা ও তাড়না তৈরী হয়েছিল, তার পিছনে একা শকুনির ইন্ধন ছিল একথা বললে বিশ্বাস করা কঠিন বলে মনে হয়। সব কিছু জেনে শুনে গান্ধারীর নির্বাক থাকা, নিশ্চয় সমর্থনদের লক্ষন বলতে হবে। তিনিতো শুনেছিলেন ভীষ্মের অনুরোধের কথা, সত্যবতীর আদেশের কথা, অথচ তিনি স্বামী ধৃতরাষ্ট্রকে এমন একটি মুহুর্তে কোন উপদেশ দিয়েছিলেন বলে দেখা যায়নি। বরং সবকিছু বুঝে শুনে, তিনি নীরব ভূমিকা পালন করে স্বামীকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন ভাই শকুনি যা বলছে তুমি তাই কর। বুদ্ধিতে সে অতুলনীয়। তার এই কুটবুদ্ধির কারণেই তাকে আমার এবং আমার সন্তানদের ভবিষ্যত নিরাপত্তার কারণে হস্তিনাপুরে আটকে রাখা। এমনকি যখন রাজামাতা সত্যবতী সহ বিদুর প্রভৃতি সভাসদেরা ধৃতরাষ্ট্রকে তার প্রথম সন্তানটিকে ত্যাগ করার কথা বলেছিলেন, তখনও কিন্তু গান্ধারী নীরব ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের কণ্ঠে আপত্তি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। সেদিন অন্ধারাজার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন গান্ধারী—তুমি ঠিক করেছ স্বামী। সন্তান ত্যাগ করা সম্ভব নয়। তুমি পিতা হয়ে যদি আপত্তি করে থাক, সেখানে আমিতো তার গর্ভধারিনী। প্রথম জন্মা সন্তানের প্রতি স্নেহ আকর্ষণ, কোন জননীর পক্ষে উপেক্ষা কর সম্ভব নয়। সন্তান আমাদের অশুভ শক্তির দ্বারা চালিত হয়ে কুলাঙ্কার হলেও জননী কখনই পারেনা তাকে বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কাজেই গান্ধারী যে একাবারে কিছু জানতেন না একথা বললে ভুল কথা বলা হবে। যদি তাই হতো, তাহলে গান্ধারী

কখনই ধৃতরাষ্ট্রকে ভীষ্ম অথবা রাজমাতা সত্যবতীর আদেশ অমান্যে মৌন থেকে সমর্থন করতেন না। কু-পরামর্শ দেওয়ার জন্য ভাই শকুনিকে গান্ধারী ভবন ছেড়ে গান্ধার রাজ্যে ফিরে যাওয়ার কথা বলতেন। গান্ধারী যখন এসব কিছু করেননি, তখন বুঝতে হবে শকুনি পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্রের মত তিনি আপ্লুত না হলেও তার কাজের প্রতি সমর্থন ছিল। আর এটা সঠিক গান্ধারী তীব্র আপত্তি থাকলে শকুনির পক্ষে হস্তিনাপুরে থাকা কোনভাবেই সম্ভব হত না।

শকুনির পরামর্শ মতো ধৃতরাষ্ট্র খুব ধীর গতিতে একের পর এক আস্থাভাজনদের উপক্ষো করেছেন। এই সময় রাজমাতা সত্যবতীর মানসিক প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল সেটা সঠিক ভাবে মহাভারতের কাহিনীকার আমাদের কাছে প্রকাশ করেন নি। তবে শকুনিকে তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নি। তিনি বুঝতে পাচ্ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হয়ে এমন ভাবে তাদের উপক্ষো করার সাহস ও বুদ্ধি কোথা থেকে পাচ্ছেন। একটি একটি করে প্রচলিত নিয়ম ভেঙ্গেছেন ধৃতরাষ্ট্র। উপেক্ষা করেছেন রাজামাতা সত্যবতীর আদেশ এমনকি কুরুবংশের অভিভাবক হিসাবে ভীষ্মের যে মর্যদা ছিল, সেই ভীষ্মকে পর্যন্ত রাজসভায় কোনঠাসা করেছেন ধৃতরাষ্ট্র। ভীষ্মের কাছ থেকে, ধৃতরাষ্ট্রের ধৃষ্ট আচরণের কথা শুনে মনে মনে দুঃখু পেয়েছেন রাজামাতা। বুঝলেন এই বংশের পাপের জন্য দায়ী তিনি নিজে। হাজার চেষ্টা করেও সেই পাপকে তিনি খণ্ডন করতে পারেননি। বংশানুক্রমিক ধারায় সেই পাপা বাহিত হচ্ছে। ভীষ্মের দিকে তাকিয়ে বড় কষ্ট হয়। কি নিঃসঙ্গ এই মানুষটি, অথচ মুখে কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তার নেই। সত্যবতী বেদনাক্লিষ্ট দৃষ্টি মেলে ভীষ্মকে বলছেন—সবই বুঝতে পাচ্ছি অথচ এখন আর করণীয় কিছু নেই। যা ভাল বোঝার তুমি তাই কর। তবে তুমি ধৃতরাষ্ট্রকে ত্যাগ কর না। আর একটা প্রশ্ন রাজমাতার মনের মধ্যে উঁকি দিয়েছিল, সেটা সন্দেহের প্রশ্ন। আসলে তিনি রাজমাতা, রাজরক্ত তার ধমনীতে প্রবাহিত ছিল, তাই তিনি হস্তিনাপুরে শকুনির অবস্থানকে ভালোচোখে দেখতে পারেন নি। কেন জানি না তার মনে হয়েছিল, ধৃতরাষ্ট্রের মতিগতির মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে তার পিছনে শুই শকুনির কালোছায়ার হাত আছে। তিনি ভীষ্মকে বলেছিলেন, গান্ধারী ভ্রাতা

শকুনি হস্তিনাপুরে কেন? ওকে হস্তিনাপুর ত্যাগ করতে বল। ভীষ্ম রাজমাতাকে কথা দিলেও, তিনি ছিলেন অপরাক। তিনি জানতেন শকুনিকে সরাসরি এইকথা বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাকে বলতে হলে বলতে হবে ধৃতরাষ্ট্রকে। ধৃতরাষ্ট্র কিছুতেই এই প্রস্তাব মেনে নেবে না। তাছাড়া গান্ধারী—তিনি কিছু মনে করতে পারেন। বিশেষ করে গান্ধারীর মুখের দিকে তাকিয়েই ভীষ্ম মনে মনে বিরক্ত প্রকাশ করলেও শকুনিকে কিছু বলতে পারেন নি। তবে ভীষ্ম অপারক হলেও, বিদুর কিন্তু প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছেন। বিশেষভাবে শকুনি যখন রাজকার্য পরিচালনায় অযাচিত ভাবে পরামর্শ দিতে এগিয়ে এসেছেন, তখনই ধর্মজ্ঞ বিদুর তাকে অত্যন্ত সংযত ভাষায় বাধা দিয়েছেন। বোঝাবার চেষ্টা করেছেন এই হস্তিনাপুরের রাজকার্যে হস্তক্ষেপ কবার কোন অধিকার তার নেই। এটা তার আলোচনার পরিধির মধ্যে পড়ে না। প্রত্যেক মানুষের একটা নিজস্ব পরিধি আছে। মানুষকে সেই সীমানা পরিধি বজায় রেখে চলতে হয়। সেই নির্দিষ্ট সীমানাকে অতিক্রম করলেই আসে বিরূপতা, সংঘাত। শকুনি কিন্তু ইচ্ছাকৃত ভাবেই হোক অথবা স্বভাবদোষেই হোক তারপর থেকে বারবার সেই নিজস্ব সীমানাকে লঙ্ঘন করেছেন আর এটা করেছেন অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের একান্ত প্রশয়ে। আসলে ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনে বসার পর থেকে তার মনের মধ্যে যে ইচ্ছা ও রাজসিক তাড়না তৈরী হয়েছিল তাকে অনেকাংশে উসকে দিয়েছিলেন শকুনি। ফলে শকুনির নানান কথাবার্তার মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে একটা জিনিষ পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল, হস্তিনাপুরের কোন আত্মীয়স্বজন তার পক্ষে নয়—সকলেই তার শত্রু। ভীষ্ম চাইছেন পান্ডু বন থেকে রাজধানীতে ফিরে আসুন, এমন ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন স্বয়ং রাজামাতা, এমনকি বিদুর, কৃপ সকলেই চাইছেন পান্ডু যাতে ফিরে আসেন, রাজ্যভার পুনরায় গ্রহণ করেন, এই অবস্থার মধ্যে শকুনি ছিলেন একমাত্র অন্ধরাজার ভরসা। তিনি বুঝেছিলেন পুত্র দুর্যোধনকে সিংহাসনে বসাতে হলে তার শ্যালক শকুনিকে পাশে রাখা প্রয়োজন। তার বুদ্ধি ও পরামর্শ অনুযায়ী চলা। আর এই কথা মনে হওয়ার কারণেই তিনি সবসময় শকুনিকে পাশে নিয়ে চলার চেষ্টা করেছেন। তার এই আচরণের জন্য ভীষ্ম মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেও, মুখে কোন

ক্ষোভ প্রকাশ করেন নি। তাতে শকুনির কথায় অপমানিত হতে দেখে বিদুর ঝাঁজিয়ে উঠে ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন, ভাই, তুমি তোমার শ্যালককে সংযত হতে বল। হস্তিনাপুরেব সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব তার হাতে কেউ তুলে দেয়নি। হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসন রক্ষার দায়িত্ব আমাদের, কাজেই আমাদের আলোচনায় অন্য কেউ অনাধিকার প্রবেশ করে নাক গলাক এটা আদৌ সমুচিত নয়। বিদুরকে উত্তেজিত হতে দেখে ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন, আহা বিদুর, তুমি ওর উপর অযথা রাগ করছ কেন। ওকি বলতে চায় শোনাই যাক না। শুনতে তো কোন আপত্তি নেই আমাদের। হাজার হোক শকুনিতে একজন যুবরাজ। রাজকার্যের ব্যাপারটা ও-ও ভালোবোঝে। ওকে বলতে দাও শুনি ওকি বলতে চায়। তারপর শকুনিকে উৎসাহিত করে, ধৃতবাষ্ট্র বলেছেন, তুমি বল শুনি শকুনি, কি তোমার অভিমত।

ধৃতরাষ্ট্রের এই উক্তির পব আর কারো পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়। বিদুর মনক্ষুন্নভাবে অপমানিত বোধ করে নিজের আসনে বসে পড়েছিলেন আর মহামতি ভীষ্মের অবস্থা হলো আরও করুণ। তিনি সব বুঝেও অভিভাবক হিসাবে একটি কথাও বলতে পারলেন না। লজ্জায় অপারক হিসাবে মাথা নীচু করে চুপ করে বসে রইলেন।

বিশ্বাস হয় না, গান্ধারী এসব কথা জানতেন না। নিশ্চয় জানতেন মহাভারতের কবি যতই তারপক্ষ নিয়ে বলুন না কেন তিনি স্বামীর অন্ধত্বের কারণে চোখ বেধে ছিলেন—হয়ত সেটা তার আত্মদুঃখের কারণে, পতিব্রতা হিসাবে যে নয় এটা পরিস্কার বোঝা যায় গান্ধারীর প্রতি পদক্ষেপে মৌনতার মধ্যে। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হলেও গান্ধারী জন্মান্ধ ছিলেন না। সেই কারণে নিশ্চয় তিনি অন্তরে বাইরে অন্ধ ছিলেন না। শকুনির প্ররোচনায় ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত অন্যায়কে তিনি মেনে নিলেন কি করে? কি করে তিনি মৌনতা সম্মতির লক্ষন দেখিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতিটি অনাচারকে মুখ বুজে সহ্য করলেন? তারতো উচিত ছিল পারিবারিক বিরোধ যাতে না বাধে তারজন্য জ্যেষ্ঠ পুত্রবধু হিসাবে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভাতৃবধুদের অবর্ত্তমানে নিজের ভ্রাতা ও স্বামীকে সংযত করা। গান্ধারী কিন্তু তা করেন নি। এমনকি পরবর্ত্তী পর্যায়ে আমরা দেখেছি দুর্যোধনের প্রতি অপোত্ত স্নেহের বশবর্তী হয়ে তিনি তার প্রতিটি অন্যায়কে,

দৌরাত্ম্যকে মেনে নিয়েছেন। শেষ মুহূর্তে গান্ধারী যখন প্রতিবাদ করেছিলেন তখন সব শেষ হয়ে গেছে। ঘটনা গড়িয়ে গিয়েছে বহুদুর। তখন তার প্রতিবাদ করা বা না করা দুই ছিল সমান। আসলে গান্ধারীর উচিত ছিল আরো আগে প্রতিবাদ করা। ভাই শকুনিকে বলা, তুমি আমার স্বামীকে অন্যায় ভাবে প্ররোচনা দিচ্ছ। তোমার কারণেই আজ আমাব স্বামীর পরিবার মানে আমাদের পরিবার বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তুমি এখুনি হস্তিনাপুর ছেড়ে চলে যাও। আমার স্বামীকে রক্ষা করার ভার যাদের উপর আছে তারা ঠিক তাকে রক্ষা করবেন, তুমি সময় থাকতে হস্তিনাপুর থেকে সরে পড়। গান্ধারী কিন্তু এতবড় কথা কখনই বলতে পারেন নি। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নিই তিনি নিশ্চয় তার স্বামীকে কিছু বলেছিলেন, তবু বাস্তব বিচারে বলতে হয় সেই বলার মধ্যে কোন সুকঠিন নির্দেশ ছিল না। শুধু বলার জন্য বলা বলতে যা বোঝায়, সেই ভাবে তিনি বলেছিলেন। ফলে ধৃতরাষ্ট্র অথবা শকুনি কেউই তার কথাকে গুরুত্ব দেয়নি।

আবাব ফিরে আসি রাজমাতা সত্যবতীর কথায় তিনি অন্তঃপুরে থাকলেও সমস্ত খবরই তার কাছে ছিল নখদর্পনে। ভীষ্ম তাকে প্রতিদিনের খবরা খবর জানতেন। সেই ভীষ্ম এখন নিজেই বিপন্ন। কি বলবেন তিনি রাজমাতা সত্যবতীকে। ভীষ্মের বলার মধ্যে হতাশা প্রকাশ না পেলেও, আগেরমতো স্বাভাবিক বলে তাকে মনে হতো না। দেখে মনে হতো মহামতি ভীষ্ম সকল সময় কিছু যেন একটা ভাবছেন, কিছু যেন গোপন করতে চাইছেন রাজমাতার কাছে। ভীষ্মের এই আচরণই সন্দেহ এনে দিয়েছিল সত্যবতীর মনের মধ্যে। তার মনে হয়েছে ভীষ্ম যেখানে অপমানিত, উপোক্ষিত, সেখানে তিনি কি করবেন। ভীষ্মই হলেন এই বংশের রক্ষক এবং অভিভাবক এতদিনে ধরে এই রীতি চলে এসেছে। এখন ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনে বসার পর হস্তিনাপুরের রক্ষক ও অভিভাবকের দায়িত্ব নিয়েছেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের শ্যালক শকুনি। তার পরিকল্পনা মাফিক ধৃতরাষ্ট্র একটি একটি করে পরিচিত নিয়োমগুলো ভাঙ্গছেন। উপেক্ষা করছেন রাজমাতাকে, মহামতি ভীষ্মকে। মনে মনে সত্যবতী বুঝতে পারেন দিন বদল হচ্ছে। এই বিরাট বংশ আগামী দিনে এক প্রবল ঘুর্নিঝড়ে বিধ্বস্ত হবে। এই কথা মনে হতেই বিদ্রোহিনী

হয়ে ওঠেন রাজমাতা সত্যবতী। ইচ্ছে হয় একবার প্রকাশ্যে রাজসভায় দাঁড়িয়ে শকুনিকে রাজ্য থেকে বার করে দেবার হুকুম দেবেন। কিন্তু পরক্ষণে মনে হয়েছে এখন আর তার সেই বয়স নেই, সেই তেজ নেই, সামর্থ নেই, সর্বোপরি আগের সেই মনও নেই। তবু কেন যেন, তিনি এই রাজঐশ্বয়ের বৈভবকে এখনও মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেন নি। রাজমাতা বলে তার মনের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন অহংকার যেমন খেলা করেছে, তেমনি পাশাপাশি কাজ করেছে এক গোপন পাপবোধ। তার পাপের কারণেই তো মহারাজ শান্তনুর বংশ আজ বিপন্ন। যে মানুষটার হাতে রাজ্যের ভার পড়লে এই বংশের যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি ঘটতো, সেই তিনি তারই কারনে রাজ্য হারিয়েছেন। হারিয়েছেন বংশবিস্তারের অধিকার। ধর্ম এই পাপ সহ্য করবে কেন। তাই তার মনের কোন আশাই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। দুই সন্তান অকালে চলে গেল, ফলে যার কারণে তার এত তোড়জোড় করা, তার পিতার এত সাবধানতা অবলম্বন—সেই ভীষ্মকেই তার শেষ আশ্রয় বলে ধরতে হল। আজ সেই উদার, নীতিবান, ধর্মজ্ঞ মানুষটিকে কিনা ধৃতরাষ্ট্র উপেক্ষা করছে। গান্ধার তনয় শকুনির এতবড় স্পর্ধা সে রাজকাজে ভীষ্মের উপরে কথা বলতে চায়। বালক দুর্যোধনের মতিগতিও ভালো নয়। ছোট থেকেই সে নিজেকে রাজা বলে ভাবতে শিখেছে। এইসব কথা চিন্তা করে সত্যবতীর মনে হয়েছে তার অন্যায়ের কারণেই আজ এই অঘটন, ভরত-করুবংশের এই বিপর্যয়। সেদিন যদি তার কারণে ভীষ্ম বঞ্চিত না হতেন, তাহলে হয়ত হস্তিনাপুরের অবস্থা ঠিক এই জায়গায় এসে পৌঁচ্ছতো না।

পাণ্ডুর বনগমনের যথার্থ কারণ মহাভারতের কাহিনীকার ব্যক্ত করেন নি। অনুমান করা হয় তিনি হয়ত আত্মরক্ষার কারণেই অল্পবয়সে সন্ন্যাস জীবনের ব্রত নিয়েছিলেন। সন্ন্যাস নিলে কেউ তাকে তখন আর সন্তান উৎপাদনের জন্য ব্যতিব্যস্ত করবে না। তাছাড়া পাণ্ডু বিষয় নিয়ে, রাজ্যধিকার নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের মতো এতকিছু ভাবেন নি। তার মধ্যে সন্তান কামনার জন্ম হয়েছিল গান্ধারী গর্ভবতী হওয়ার খবর শোনার পর। তার এই সন্তান চাহিদার মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের মতো কোন উৎকণ্ঠা

তার মধ্যে ছিল না। তিনি একবারের জন্য ভাবেন নি তার সন্তান যেন বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্তান হয়ে জন্মায়, যেন সে পরবর্ত্তী পর্যায়ে রাজা হতে পারে। পান্ডু সন্তান কামনা করেছিলেন কেবল মাত্র বংশধারা রক্ষা করার জন্য। তার মনের মধ্যে বৈরাগ্যের জন্ম হয়েছিল কিনা জানা যায় না, তবে শোনা যায় চরিত্র বিচারে তিনি ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের বিপরিত এবং তার মধ্যে বিষযভাবনা আদৌ ছিল না। বিষয়ের প্রতি আকাঙ্খা থাকলে তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে এত সহজে সিংহাসনে বসার সুযোগ দিয়ে বনগমন করতেন না। তবে তার প্রতি যে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিঞ্চিত ঈর্ষা প্রবন, এই সিংহাসনে জ্যেষ্ঠ হয়ে বসতে না পারা জন্য বেদনা আছে, এটা কিন্তু পান্ডু অনুভব করেছিলেন। সেই কারণে হয়ত তিনি সিংহাসনে ধৃতরাষ্ট্রকে বসার সুযোগ নিয়ে দুই পত্নীকে নিয়ে বনগমন করেন। আসলে পান্ডু বনগমনের পর ভেবেছিলেন ধৃতরাষ্ট্র হয়ত তার প্রতি ঈর্ষার ভাব কিছুটা পরিত্যাগ করবেন। কিন্তু তার সেই প্রত্যাশা বাস্তবায়িত হয়নি। সন্তান জন্মের পর তাকে হস্তিনাপুরে ফিরে আসার জন্য সকলে অনুরোধ করেছেন, কিন্তু পান্ডু কারো কোন অনুরোধ রক্ষা করেন নি। তিনি অপেক্ষায় ছিলেন রাজা হিসাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাকে রাজ্যে ফেরার জন্য একবার অত্যন্ত মুখ ফুটে কিছু বলুক। এমন কথা তিনি বিদুরকে বলেও ছিলেন। অভিমানে বলেছেন, তোমরা আমায় রাজ্যে ফিরে যেতে অনুরোধ করছ, কিন্তু রাজ অনুরোধ কই। কই আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুরোধ। পান্ডুর এই মনভাব জানার পর বিদুর ভীষ্মকে বলেছিলেন। ভীষ্ম, বিদুর কৃপ এমনকি রাজমাতা সত্যবতী পর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করে বলেছিলেন, তুমি পান্ডুকে স্ত্রীপুত্রসহ হস্তিনাপুরে ফিরে আনতে বল।

ধৃতরাষ্ট্র শুনেছেন, অনুরোধ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েও তিনি কেবল আর্থিক সাহায্য পাঠিয়ে দায়মুক্ত হয়েছেন কিন্তু মুখে কখনই ফিরে আসার কথা বলেন নি। ধৃতরাষ্ট্রের আচরণ এবং শকুনির প্রাধান্যের ফলে একটা ধারনা রাজমাতার মনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, আগামী দিনে এই ভাতৃবিরোধ চরম আকার নেবে। ঘটনার গতি যে পথে এগিয়ে চলেছে তাতে ভয়ানক কোন একটা কিছু ঘটবে এই ভরত-কুরুবংশে।

ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র হল। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা এমন কথা ভাবতেই পারি না। আসলে মহাভারতের যুগে শত, হাজার এই সব শব্দগুলি ঘুরে ফিরে বহুবার ব্যবহার হয়েছে। যেমন সগর রাজার একহাজার পুত্র; ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র, রাজা যথাতির হাজার বছরের জরা, কৃষ্ণের ষোলো হাজার স্ত্রী—এই সব সংখ্যাতত্ত্ব আদপে বিশ্বাসযোগ্য নয়। আসলে এই বিশাল সংখ্যা দিয়ে বহুত্বকে নির্দেশ করা হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্রের নাম মহাভারতের কাহিনীকার গোটা একটা অধ্যায় জুড়ে ব্যক্ত করেছেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা মাত্র কয়েকজনের নাম পাই, বাকিদের কোন কার্যকারী ভূমিকা ছিল বলে জানা যায় না। তবে ধৃতরাষ্ট্রের একশত সন্তান না থাকলেও সংখ্যা বিচারে পাণ্ডু পাঁচ পুত্র অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল একথা আমাদের মানতে হবে। পুত্রের সংখ্যা বেশী হওয়ার কারণে ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে খুশী হয়েছিলেন। কারণ তার পুত্রেরা একত্র দাঁড়ালে দুর্যোধনের পক্ষে পাণ্ডুর পাঁচসন্তানকে অধিকারচ্যুত করতে কোন অসুবিধে হবে না।

এদিকে প্রিয়দর্শন পাণ্ডু পাঁচপুত্র নিয়ে পরমানন্দে বনবাসে দিন কাটাতে লাগলেন। একেবারের জন্য তার মনে এলো না তার পুত্রদের রাজ্যাধিকারের কথা। কুন্তী ও মাদ্রী কেউই তাকে হস্তিনাপুরে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন না। আসলে পাণ্ডুর দুই স্ত্রীর মধ্যে কেউই খুব একটা বিষয়ী ছিলেন না। যদি ওদের মধ্যে একজন অত্যন্ত বিষয়ী হতেন তাহলে হয়ত পাণ্ডুর মনে পুত্রদের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তাভাবনার উদয় হত। আসলে তারাও পাণ্ডুর মতো ছিলেন পুত্রদের ভবিষ্যত ভাবনায় উদাসিন। গান্ধারী যতটা পুত্র ভাবনায় সচেতন থেকে স্বামীর অন্যায়কে মুখ বুজে মেনে নিয়েছিলেন, সেখানে কুন্তী ও মাদ্রী মুলত চালিত হয়েছিলেন স্বামী পাণ্ডুর ভাবনায়। তাছাড়া এটাও তো ঠিক দুই পত্নীর মধ্যে যদি রাজা পাণ্ডু কারো একজনের বিষয় ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে পুত্রদের ভবিষ্যত চিন্তা করে রাজধানীতে ফিরে আসতেন তাহলে হয়ত 'মহাভারতের কাহিনী অন্যরকম ভাবে লেখা হত। মহাভারতের কবি সচেতন ভাবেই এদিকে নজর রেখেছিলেন। কুন্তী ও মাদ্রী দুটি ভিন্ন মানসিকতা সম্পন্ন চরিত্র হলেও এদের কারো মধ্যে আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাধারা ছিল না। ছিল না রাজ্যাধিকার নিয়ে সন্তানদের

সম্পর্কে বিশেষ ভাবনা। তারা জানতেন বংশের ধারানুসারে যুধিষ্ঠির যেহেতু জ্যেষ্ঠপুত্র সেই হেতু হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসার অধিকার তার আছে। মহামতি ভীষ্ম যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে সন্তান সম্পর্কে উদ্‌বীঘ্ন হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারেন না। আসলে হস্তিনাপুরের প্রকৃত অবস্থা, ধৃতরাষ্ট্রের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে তাদের কোন ধ্যান ধারণা ছিল না। কুন্তী রাজকন্যা হলেও তিনি পরগৃহে পালিতা হয়েছিলেন, ফলে রাজনীতির কুট প্রভাব সম্পর্কে তার মধ্যে কোন ধারণা জন্মাতে পারে নি। আর মাদ্রী ছিলেন পিতা একমাত্র আদুরে কন্যা। তিনি নিজের সখী ও সুখ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। বিয়েও হয়েছিল অল্প বয়সে—কাজেই তার মধ্যে কোনরকম রাজসিক ভাবনা তৈরী হয়নি। সিংহাসন নিয়ে যে ভাইদের মধ্যে কখন কোন বিবাদসৃষ্টি হতে পারে এমন ধারণা তার মনের মধ্যে ছিল না।

মহাভারতের কবি কুন্তী চরিত্রটিকে সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেভাবে কলম ধরেছিলেন, সেই ভাবে তিনি মাদ্রীকে আমাদের সামনে তুলে ধরেননি। অত্যন্ত অল্প পরিসরের মধ্যে তাই আমরা মাদ্রীকে বিচরণ করতে দেখি। সাদা চোখে চরিত্রটিকে দেখার পর মনে হয়, কাহিনীকার অযথা মাদ্রী চরিত্রটিকে সৃষ্টি করলেন কেন—কি প্রয়োজন ছিল তার চরিত্রটিকে সৃষ্টি করার? তিনি তো অনায়াসে পারতেন মাদ্রিকে বাদ দিতে। মাদ্রীকে আমরা প্রথম দেখতে পাই কুন্তীর প্রতিদ্বন্ধী চরিত্র হিসাবে। পান্ডুর সঙ্গে কুন্তীর বিবাহ হওয়ার পর যখন দীর্ঘসময় অতিবাহিত সত্বেও কুন্তীগর্ভবতী হতে পারলেন না, তখনই কুন্তীর মাতৃত্ব নিয়ে সন্দেহ উঁকি দিয়েছিল রাজমাতার মনে। বংশধারা রক্ষার জন্য তখনকার দিনে বহুবিবাহ করার প্রচলন থাকায় ভীষ্ম পান্ডুর দ্বিতীয় বিবাহের জন্য উদবীঘ্ন হয়ে পড়লেন। মদ্র রাজকন্যাকে পছন্দ করে বহুমুল্য দিয়ে তিনি তাকে ক্রয় করে আনলেন, তাদের দেশীয় আচার মেনে পান্ডুর সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য। অথচ এই নববুধ হস্তিনাপুরের অন্তর মহলকে ভালোভাবে চেনার আগেই পান্ডু হঠাৎ করে বনগমনের সিদ্ধান্ত নিলেন। তার এই সিদ্ধান্তের কারণেই মাদ্রীর পক্ষে প্রকৃত ভাবে হস্তিনাপুরের রীতিনীতি সম্পর্কে ভালোভাবে কিছু জানা সম্ভব হয়নি। এখানে তিনি কুন্তীকে অবলম্বন করলেন। কুন্তীও তাকে ছোট বোনের মতো আড়াল

করে রেখেছিলেন। তাদের সম্পর্কে মধ্যে প্রথম চিড় ধরে কুন্তীর সন্তান হওয়ার পর। কুন্তীর তিন-তিনটি সন্তান প্রসব করার পর মাদ্রীর মধ্যে মাতৃত্বের ইচ্ছা গভীরভাবে মাথা চড়া দেয়। তখনই তিনি রাজা পাণ্ডুকে অভিযুক্ত করেন। ভাগ্যের এমন নির্মম পরিহাস, যে কুন্তীর কারণে পাণ্ডুর মাদ্রীকে বিবাহ করা—সেই পুত্র মাদ্রী লাভ করলেন কুন্তীর মন্ত্রকৃপায়। এই ক্ষেত্রে তাহলে মাদ্রীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কি রইল। বিশ্লেষণ করলে একটা বিশেষ বৈশিষ্ঠ্য মাদ্রীর মধ্যে আমরা দেখতে পাই, তাহলো সন্তান কামনায় একটিবারের সুযোগকে অত্যন্ত প্রখর বুদ্ধিমতীর মতো কাজে লাগিয়ে স্বামীর অনুমতি ছাড়াই যুগল দেবতা—অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আহ্বান করার মধ্যে। মাদ্রীর এহেন আচরণে কুন্তী ক্ষুন্ন হয়েছিলেন, ভয়ছিল মাদ্রীকে দ্বিতীয়বার এই সুযোগ দিলে মাদ্রী হয়ত পুত্র সংখ্যায় তাকে ছাপিয়ে যেতে পারেন মিত্র-বরুনের মতো আবার কোন যুগল দেবতাকে আহ্বান করে। এই আশঙ্কার কারণে মনক্ষুন্ন কুন্তী স্বামী পাণ্ডু অনুরোধ করা সত্বেও মাদ্রীকে দ্বিতীয়বার মন্ত্র ব্যবহারের সুযোগ দেন নি। সতীনে সতীনে বিরোধ থাকাই স্বাভাবিক। এইক্ষেত্রে বিরোধ থাকলেও সেই বিরোধ কিন্তু সাংসারিক বিভিষিকায় পরিণত হয় নি। বড় বউ হিসাবে কুন্তী সমস্ত দায়িত্ব বহন করেছেন। কাজেই মাদ্রীর একমাত্র দুটি সন্তান প্রসব করা ছাড়া তার কোন ভূমিকা আমাদের চোখে পড়েনি। তাই পাঠকদের মনে হতে পারে মাদ্রীর চরিত্রটি মহাকাব্যের কবি সৃষ্টি করলেন কেন? কি তার উদ্দেশ্য ছিল। এই ক্ষেত্রে একটা কথা বলি, মহাকাব্যের ক্ষেত্রে সব চরিত্রের—নিখুঁত পূর্ণতা পাওয়া কখনই সম্ভব হয় না, তাবলে আবার প্রয়োজনকেও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। মাদ্রী তাই অপ্রাসঙ্গিক কোন নারী চরিত্র নয়, মহাকাব্যের রচয়িতা তাকে প্রয়োজনের খাতিরেই সৃষ্টি করেছেন আবার প্রয়োজন মিটে যেতেই চরিত্রটির চ্ছেদটেনে দিয়েছেন। রামায়নে যেমন উর্মিলা, তাকে মহাকাব্যে উপেক্ষিতা বলা হয়েছে, তবু কিন্তু কাব্য খাতিরে তার প্রয়োজন ছিল। মহাভারতের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি মাদ্রী চরিত্রের প্রয়োজন ছিল। রামায়ন ও মহাভারত শুধু মাত্র কবি কল্প, সাহিত্যধর্মী কাব্য কথা নয়—এই দুই মহাকাব্যের মধ্যে আছে জীবনবোধ, মননের বিষদ বিশ্লেষণ, তেমনি ফুটে উঠেছে সমাজ দর্শন

ও রাজনৈতিক চিত্রকল্প। অতএব কোন চরিত্র অপ্রয়োজনীয় নয়।-প্রতিটি চরিত্রের সঙ্গে প্রতিটি চরিত্রের অদ্ভুদ একটা যোগ সূত্র লক্ষ করা যায়। একটা চরিত্রকে বাদ দিলে অপর একটি চরিত্র মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এই যে মাদ্রী—যাকে সাধারণ দৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় বলে আমাদের মনে হয়েছে, সেই মাদ্রী হলেন রাজা পান্ডুর মৃত্যুর কারণ। যদি মাদ্রী না থাকতেন, তাহলে তো এত সহজে মহাকাব্যের কবি পান্ডুর মৃত্যু ঘটাতে পারতেন না। আর পান্ডুর মৃত্যু নাহলে হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে এতবড় একটা লড়াই হত না। হয়ত তখন মহাভারতের রচয়িতাকে অন্য কোন পথের আশ্রয় নিতে হত, যার ফলে মহাকাব্যটি বাস্তব রূপ পেত না।

আগেই বলেছি কুন্তী ও মাদ্রী পাশাপাশি অবস্থান করলেও উভয় চরিত্রের মধ্যে যথেষ্ট ভিন্নতা ছিল। কুন্তী ছিলেন পরগৃহে পালিতা ফলে তার জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল অনেক বেশী। তিনি জীবন যুদ্ধে যেমন ছিলেন পরিনত, বাস্তবধর্মী, তেমনি তার মধ্যে ছিল সুস্থ মনন ক্ষমতা। তিনি তার কামনাকে, বাসনাকে, জীবনের চাহিদা গুলিকে অনেক যুক্তি দিয়ে সংযত ও অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি সমস্ত ঘটনাকে বিচার করতে পারতেন, তাই আমরা তাকে রাজরানী হওয়া সত্বেও কখনই উচ্ছ্বাস প্রবণ হতে দেখিনি। দেখিনি পান্ডুর দ্বিতীয় বিবাহের সময়ে দুঃখে ম্রিয়মান হতে। বরং আঘাত যত এসেছে কুন্তীর ব্যক্তিত্ব ততোবেশী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অপরদিকে মাদ্রীর জীবনে কোন সংগ্রাম ছিল না। অনায়াসে জীবন চালনার ফলে তার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন জীবন গভীরতার সৃষ্টি হতে পারেনি। তিনি পারেননি নিজের দৈহিক কামনা বাসনাকে কুন্তীর মতো সংযমের বেড়াজালে আবদ্ধ রাখতে। মাদ্রী হলেন সেই সমাজের মেয়ে, যে সমাজে সংগ্রাম নেই, কষ্ট নেই, বিপন্নতা নেই, সংযম নেই, সহ্য নেই, এবং কোন সুস্থ ভাবনা নেই। শুধু ছিল তার মধ্যে দেহবিলাসিতার মোহ, ছিল অপরিণত বয়সের অনাবিল দৈহিক প্রেমের মাদকতা। কুন্তীর মধ্যে যে দেহমিলনের আকাঙ্খা ছিল না এমন কথা বলা ভুল হবে। তার মধ্যে দেহমিলনের আকাঙ্খা ছিল কিন্তু মাদ্রীর মতো মিলন আকাঙ্খার মোহ তার মধ্যে ছিল না। তাই হয়ত কুন্তী নিজেকে সংযত

রাখতে পেরেছিলেন, মাদ্রী পারেন নি। অবশ্য মিলনের ক্ষেত্রে একা মাদ্রীকে দোষারোপ করে কোন লাভ নেই, তার প্রতি রাজা পাণ্ডুও ছিলেন অতিরিক্ত মাত্রায় আস্বক্ত। যদি ধরে নিই মৃগমুনীর গল্পোটি সত্য তাহলে রাজাপাণ্ডু কেন অবধারিত মৃত্যু জেনেও স্বেচ্ছায় মাদ্রীর সঙ্গে সঙ্গমে লীপ্ত হলেন। তবে কি ধরে নিতে হবে তিনি অভিশাপ বিস্মৃত হয়েছিলেন? মনে হয় না— মানুষ আর যাই করুক নিজেকে ভালোবাসে সবচেয়ে বেশী। এমন কোন বোকা লোক নেই যে মৃত্যু নিশ্চিন্ত জেনে সেই দিকে পা বাড়ায়। তাহলে পাণ্ডু সব জেনেশুনে মাদ্রীকে কেন সেদিন রতি মিলনে আহ্বান করলেন! হয়ত অদৃষ্টবাদীরা বলবেন, সবই নিয়তি। নিয়তিকে খণ্ডন করে কার সাধ্য। এই ক্ষেত্রে মনে হয় বর্ত্তমানের দৃষ্টিকোন থেকে এই ব্যাখা যথার্থ নয়। মৃগমুনি'র অভিশাপের গল্পটি নিছক গল্প মাত্র। পাণ্ডু মনে হয় ভিতরে ভিতরে যুদ্ধের ক্লান্তি এবং বনবাস জীবনের কঠোর ব্রতপালনে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে ছিলেম। এমনিতেই তিনি রক্ত শূন্যতায় ভুগতেন, যে কারণে তার নাম পাণ্ডু। এই গোপন অসুস্থতার কথা হয়ত পাণ্ডু নিজেও জানতেন না। তাই মাদ্রীর যৌবন মাধুর্য তাকে আকর্ষণ করেছিল। হয়ত এমনও হতে পারে কুন্তীকে না জানিয়ে তারা প্রতিদিন গোপনে দেহমিলনে লিপ্ত হতেন। ফলে পাণ্ডুর অসুস্থতা বেড়ে যায় এবং মাদ্রীর সঙ্গে কোন এক বসন্ত দিনে গোপন মিলন কালে মুখ থেকে রক্ত উঠে মারা যান। মৃগমুনীর ঘটনাটার চাইতে এই যুক্তি অনেক বেশী বাস্তব সম্মত।

সেদিন কি ঘটেছিল। দিনটা ছিল সম্মোহনকারী ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাব লগ্ন। বনবাসী রাজা চলেছেন বন বিহারে। প্রকৃতির নবতম বসনে তখন সুসজ্জিতা। পলাশ, তিলক, আম্র, চম্পক বৃক্ষ সমারোহ চারদিকে সমাকীর্ণ। পদ্ম, কুমুদ, কহলার প্রভৃতি জলজ পুষ্পের সুরভিত গন্ধে চারদিক তখন মাতোয়ারা হয়ে আছে। হাঁটতে হাঁটতে বনবাসী রাজার মন কেমন যেন নেশাগ্রস্থ হয়ে যায়। বনবাসী রাজার পিছনে তাকে অনুসরণ করে চলেছেন মাদ্রী। তিনি কোথায় চলেছেন? কার অভিসারে চলেছেন? এত দেহসাজ তার কার জন্য? কার সঙ্গে তিনি মিলিত হবেন? প্রশ্ন আসতেই পারে মাদ্রী রাজা পাণ্ডুকে অনুসরন করলেন কেন? কেন তিনি নিজেকে প্রায় অর্ধনগ্না পোষাকে আবৃত্ত

করে রাজাকে প্রলুব্ধ করলেন? তিনি কি মৃগমুনির অভিশাপের কথা জানতেন না। যদি জানতেন তাহলে কেউ এমনভাবে দেহ কামনার উদগ্র বাসনা নিয়ে স্বামীর পশ্চাৎ অনুসরণ করেন? মাদ্রী যে জানতেন না এমন নয়, সন্তান বাসনা মাদ্রী যখন প্রকাশ করেছিলেন তখনই রাজা পান্ডু তাকে বলেছিলেন মৃগমুনির কথা। তাহলে মাদ্রী রাজার সঙ্গে একপথে অনুগামিনী হলেন কেন? রাজা যেতে যেতে পশ্চাতে ফিরে তাকান। দেখতে পান মাদ্রীকে। আসলে ওই যে বললাম কুন্তীকে এড়িয়ে তারা যে গোপনে দেহমিলনে লিপ্ত হতেন—এটা হল তারই ইঙ্গিত। তা না হলে মাদ্রী ওমন বেশভূষা পরে বনবাসী রাজার পিছন পিছন হাঁটতে লাগলেন কেন। একসময় তারা দুজনেই উঠে এলেন শতশৃঙ্গ পর্বতে। পর্বতের কন্দরে কন্দরে তখন যেন বসন্তের মহামিলনের মোহময় গন্ধ তাদের আচ্ছন্ন করেছে। সেই দেহ মিলনের হাতছানিকে অস্বীকার করার সাধ্য কারো নেই। পলাশ, অশোক, নাগ কেশরের গন্ধে বনবাসী রাজা পান্ডুর বৈরাগ্যের খোলশ গেল খুলে। নিজের মনের যাবতীয় সংযমের বন্ধনকে ঝেড়ে ফেলে রাজা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মাদ্রীর দিকে। মাদ্রীর রূপ যেন আজ বসন্ত শোভার অঙ্গরাগে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। রাজা পান্ডু আবে। ঘন কণ্ঠে বললেন—তুমি এত সুন্দর মাদ্রী।

—এই সবই তোমার জন্য রাজা।

আশ্চর্য্য। আজ যেন মাদ্রীকে অনেক বেশী কামনাময়ী, মায়াবিনী এক নারী বলে হল রাজা পান্ডুর। তার সুচারু বস্ত্রের অন্তরালে থাকা দেহের প্রতিটি ভঙ্গিমা রাজাকে গভীর ভাবে প্রলুব্ধ করে তোলে। হয়ত রাজা পান্ডু সেই দুরন্ত কামনার মোহাচ্ছন্নতায় ভুলে গেলেন মৃগমুনির অভিশাপের কথা। আবার অভিশাপ যদি না বলি তাহলে বলবো তিনি তার শারিরীক অসুস্থতার কথা একবারের জন্য মনে না রেখে মাদ্রীকে নিজের বাহুবন্ধনের মধ্যে আহ্বান করলেন। রাজা পান্ডু সন্তান উৎপাদনে অক্ষম, সেই কারণে তার আত্মরক্ষার তাগিদায় বৈরাগ্য গ্রহণ। পুরুষ প্রজনন অক্ষম হলেও তাদের মধ্যে দেহক্ষুধার লয় হয় না। যারা জীবতত্ত্ববীদ তারা বলেন প্রজনন শক্তির অক্ষমতা কারো মধ্যে নানা কারণে ঘটে থাকে। নারীর সঙ্গে শারীরিক মিলনে হয়ত তাদের সমস্যার

সৃষ্টি হতে পারে, তাতে তার আসঙ্গ লিপ্সায় বাধা পড়ে না। কারণ দেহের উপর তখন মনের প্রভাব বেশী থাকে। তাছাড়া অনেক সময় পুরুষের শুক্রবীর্যে প্রান না থাকার কারণে সন্তান উৎপাদন সম্ভব হয় না। তাবলে এই ক্ষেত্রে যে সেই পুরুষের মধ্যে শারীরিক লিপ্সা থাকবে না এমন নয়। স্বাভাবিক নিয়মেই এখানে মিলন সম্ভব হতে পারে। কাজেই মনে হয় রাজা পান্ডুর মধ্যে প্রজনন ক্ষমতা না থাকলেও তার মধ্যে সম্ভোগ ইচ্ছা ছিল অত্যন্ত প্রবল আর সেই প্রবল ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে তিনি কুন্তীকে এড়িয়ে সুন্দরী মাদ্রীর সঙ্গে দেহ মিলনে লিপ্ত হতেন। মাদ্রী হয়ত জানতেন পান্ডু শারিরীক দিক দিয়ে অসুস্থ আছেন। এই অবস্থায় দেহ মিলনে বিপদ ঘটতে পারে তাই তিনি রাজা পান্ডুকে মৃগমুনি গল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সংযত হতে বললেন মাত্র। তার বলার মধ্যে বাধা ছিল না, অনুরোধ ছিল। মাদ্রী শুধু বলেছিলেন, আপনি আমাকে স্পর্শ করবেন না। কিন্তু মাদ্রী পারেন নি স্বামী অসুস্থ জেনেও, সেই স্থান পরিত্যাগ করতে। নিজেকে রাজার বাহুমুক্ত করতে। ফলে রাজা পান্ডু গোপন ক্ষয়রোগ নিয়েও কামনার উদগ্র নেশায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন মাদ্রীর বুকের উপর। তাকে রাজা পান্ডু কামনার মদিরতায় ডুবিয়ে দিলেন। একজন ক্ষয়রুগীর পক্ষে অসংযমী জীবন যাপন মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে। অন্যদিন তিনি মাদ্রীকে উপভোগ করে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, আজ তার মুখ নিয়ে নির্গত হল তাজা রক্ত। মহাকাব্যের কবি বাস্তবকে বাদ দিয়ে মৃগমুনির গল্পের উপর অঙ্গুলি নিদের্শ করে বললেন—দৈব নির্বন্ধ অখণ্ডনীয়। যা হবার তাই হল। ক্ষয়রোগে আক্রান্ত পান্ডু অধিক রক্তপাতের কারণে মারা গেলেন। মহাকাব্যের কবি বললেন, দৈব্যকে খণ্ডন করা যায় না। যা ঘটার তাই ঘটবে। মৃগমুনির অভিশাপে রাজা পান্ডুর মৃত্যু হল। মৃগমুনিতো পান্ডুকে বলেই ছিলেন, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে সংযমে লীপ্ত হলে, তোমার মৃত্যু হবে। তার কথাই লেগে গেল। মুনি ঋষির কথা কখনও বিফল হয় না।

পান্ডুর মুখ থেকে অত রক্ত নির্গত হতে দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন মাদ্রী। কুন্তী তখন পাঁচপুত্রকে নিয়ে ঘর সামলাছিলেন। মনে হয় তিনিও রাজার এই অসুস্থকার কথা জানতেন। অসুস্থতার কথা না

জানলে কুন্তীর অতিঅবশ্যই জানাছিল মৃগমুনির কথা। তাই তিনি মাদ্রীর কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলেন। বুঝতে পারলেন কোন একটা সাংঘাতিক ঘটনা নিশ্চয় ঘটেছে তানাহলে মাদ্রী ওই ভাবে আর্তনাদ করে উঠবে কেন। তিনি দৌড়ে এসে পৌছালেন অকুস্থানে। দেখতে পেলেন রাজা প্রাণশূন্য অবস্থায় পড়ে আছেন। তাজা রক্তে ভেসে গেছে চারপাশ। কুন্তী বললেন—তুমি একি করলে মাদ্রী। তুমি মৃগমুনির অভিশাপের কথা জানতে না। আমি তাকে কত যত্ন নিয়ে এতদিন রক্ষা করে এসেছি। তোমারতো উচিত ছিল এই মানুষটিকে আমার মতো করে রক্ষা করা।

অর্থাৎ কুন্তি মাদ্রীকে বলতে চাইলেন তুমি জানতে না স্বামীর ওই ক্ষয়রোগের কথা। আমি তাকে এত সেবা যত্ন করে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করছিলাম, তোমারও তো উচিত ছিল আমার মতো তাকে রক্ষা করা।

ক্ষয়রোগে সংযম হল প্রধান ঔষধ। এই কথা মনে করেই কুন্তী ক্ষোভের সঙ্গে মাদ্রীকে বললেন, আমি যদি নারী হয়ে আবার কামনা বাসনাকে সংযত করতে পারি, তাহলে তুমি পারলে না কেন? কেন তুমি এই নির্জন বনভূমিতে এমন মোহনী বেশধরে তার সঙ্গ নিলে? কেন তুমি তাকে গোপনে প্রলুব্ধ করলে? তুমি কি জানতে না মৃগমুনির অভিশাপের কারণে তার মনের মধ্যে একটা গোপন দুঃখু ছিল। আমি কোনদিন তাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করিনি মাদ্রী। আমি তাকে এড়িয়ে গেছি। কুন্তীর এই শোকার্ত অভিযোগ থেকে বোঝা যায় মাদ্রীর সঙ্গে রাজা পান্ডুর গোপন মিলনের বিষয়ে তিনি কিছুই জানতেন না। তার শুধু অভিযোগ মাদ্রীতো তার অসুস্থতা অর্থাৎ মৃগমুনির অভিশাপের কথা জানতেন তা সত্বেও কেন তিনি স্বামীকে মিলনে প্রলুব্ধ করলেন। তারপর অশ্রু বিসর্জিত নয়নে বললেন, তবে তুমি ভাগ্যবতী মাদ্রী। তুমি রাজার প্রসন্ন প্রেমের রূপ দেখতে পেয়েছে। আমি সেই প্রেমস্পর্শিত রূপ দেখার থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তবে তার জন্য আমার মনে কোন আক্ষেপ নেই। কিন্তু একথা সত্য যে তিনি তোমারই কারণে চলে গেলেন।

কুন্তীর এই উক্তির মধ্যে দিয়ে মহাভারতের কবি বুঝিয়ে দিয়েছেন

কেন তিনি মাদ্রী চবিত্রটিকে এনেছিলেন। যেহেতু তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে সেই কারণে মহাকবি এই চরিত্রের উপর চ্ছেদ টানতে চেয়ে মাদ্রীর মুখ দিয়ে আসল কথাটি বলিয়ে দিলেন—বিশ্বাস কর, আমি রাজাকে অনুরোধ করেছিলাম কিন্তু তিনি আমার কোন অনুরোধ শোনেননি।

কুন্তী বললেন আক্ষেপের সুরে—যা হবার হয়ে গেছে, আর তো ভাবনা করে কোন লাভ হবে না। আমি তার প্রাথমা পত্নী, শাস্ত্রমতে প্রকৃত স্ত্রী, তাই এর কর্মফল আমারই প্রাপ্য। আমি আমার প্রাণপ্রিয় রাজার সঙ্গে সহমরণে যাব। তুমি এই পাঁচ বালককে দেখ।

মাদ্রী বললেন—তা হয় না দিদি, আমি সত্যি বলছি স্বামী সহবাসে আমি তৃপ্ত হয়েছি। আমি তার সঙ্গে সহমরণে যাব। আমি দৈহিক সুখে তৃপ্ত হয়ে তার মৃত্যুর কারণ হয়েছি, অতএব আমারই অধিকার আছে তার সঙ্গে সহমরণে যাওয়ার। তার দেহের সঙ্গে আমার দেহ দগ্ধ হোক। আমার অনুরোধ তুমি শুধু আমার দুইপুত্রকে দেখ।

কুন্তী আপত্তি করলেন না। আসলে মহাভারতের কবি মাদ্রী চরিত্রের উপর যখন চ্ছেদ টানতে চাইছেন তখন কুন্তী আপত্তি করবেন কেন। তাছাড়া মহাভারতের মতো কাহিনীতে কুন্তীব যে এক বিশেষ ভূমিকা আছে। তিনি তো পঞ্চপান্ডবের প্রকৃতমাতা। মাদ্রীতো তারই মন্ত্র উচ্চারণ করে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের দ্বারা দুটি সন্তান দিয়ে দায়িত্ব মুক্ত হয়েছেন, তাদের একত্রে মানুষ করার ভারতো তাকেই নিতে হবে। এই মহাভারতের কাহিনীকার পান্ডুর প্রথমা পত্নী কুন্তীর উপর পঞ্চপান্ডবের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে মাদ্রী চরিত্রের উপর ছেদ টানলেন।

পান্ডু ও মাদ্রীর মৃত্যু হলে দেবতুল্য মহর্ষিগণ ও মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণরা একত্র হয়ে সকলে স্থির করলেন, মহাযশঃ মহারাজ মহাত্মা পান্ডু রাজ্য পরিত্যাগ করে এই স্থানে আমাদের শরণাগত হয়ে তপোনুষ্ঠান করেছিলেন। কাজেই আমাদের উচিত কাজ হল তার এবং তার কনিষ্ঠা পত্নীর মৃতদেহ সহ কুন্তী ও পঞ্চবালক'কে নিয়ে হস্তিনাপুরে যাওয়া এবং মহামতি ভীষ্ম এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে তাদের সমর্পণ করা। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ রাজাপান্ডু ও মাদ্রীর শবদেহ

সহ কুন্তী ও তার পঞ্চবালক'কে নিয়ে হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্য যাত্রা করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তারা পায়ে হেঁটে কুরুজাঙ্গলে এসে প্রবেশ করলেন।

উল্কার বেগে পাণ্ডু 'ও মাদ্রীর মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছালো হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে। বীনা মেঘে ব্রজপাতের মতন এই খবর পেয়ে রাজপরিবারের সকলে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। রাজকার্য মুলতুবি রেখে ভীষ্ম ও বিদুর গেলেন শবদেহ আনতে।

শবদেহ আনাহল রাজবাড়ির উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে। নগরবাসীরা পাণ্ডুর বিরহে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। সেই চরম মুহূর্তে ভীষ্ম, বিদুর, কৃপ পাণ্ডু বিরহে কাতর হলেও ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। তিনি স্থির, অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আসলে ধৃতরাষ্ট্র ভাবতে পারেননি এত তাড়াতাড়ি তার সহদর ভাই মারা যাবেন। এই মুহুর্তে তার কর্তব্য কি এটা বোঝার জন্য তিনি অসহায় ভাবে খুঁজতে লাগলেন শকুনিকে। দুটি শবদেহের পাশে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন সদ্য বিধবা হওয়া কুন্তী তার পাঁচপুত্রকে নিয়ে। এ' এক করুন দৃশ্য। অলিন্দের আসেপাশে অনেক মুখ দেখা গেল। অথচ সেই করুন মুহুর্তের মধ্যে আমরা একাবারের জন্য গান্ধারীকে দেখতে পেলাম না। সদ্য বিধবা হওয়া কুন্তী পাঁচ-পাঁচটি অনাথপুত্রকে নিয়ে অসহায় ভাবে তাকিয়েছিলেন অথচ একবারের জন্য কেউ তাকে হাত ধরে অন্দরমহলে নিয়ে গেলেন না। এই সময়তো উচিত ছিল সর্বাগ্রে গান্ধারীর এগিয়ে আসা। কিন্তু কোথায় গান্ধারী? তিনি কি পাণ্ডু ও তার স্ত্রী মাদ্রীর বিয়োগে এতই শোকতপ্ত হয়ে পড়েছিলেন যে একবারের জন্য গান্ধারী ভবনের বাইরে এসে দাঁড়াতে পারলেন না? অথচ গান্ধারীর কাছে এটা ছিল মস্ত কর্তব্য—তারই উচিত ছিল কুন্তীর পাশে দাঁড়িয়ে তাকে হাত ধরে বলা—এস বোন, ভিতরে এস।

রাজপ্রসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে অশ্রু বিসর্জন করলেন রাজমাতা সত্যবতী। তার দুই চোখের কোন বেয়ে ঝরে যেতে লাগল অবিরাম অশ্রুধারা। পাণ্ডুর এই অকাল বিয়োগ সহ্য করা কঠিন। নিরিহ পাঁচটি শিশু পুত্রের দিকে তাকিয়ে তিনি অত্যন্ত ভাবিত হয়ে উঠলেন। যদিও রাজমাতা জানতেন মহাত্মা ভীষ্ম এবং ধর্মজ্ঞ বিদুর থাকতে তার

চিন্তার কোন কারণ নেই, তবু তিনি মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন ধৃতরাষ্ট্রের কথা মনে করে। একটু দুরে দাঁড়িয়ে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা অলংকারে শোভিত হয়ে সমবয়সি পিতৃহারা পাঁচ বালকের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। ধৃতরাষ্ট্র নীরব। পাশে মন্ত্রনাদাতা শকুনি। কুন্তীর দিকে তাকাতে পারলেন না সত্যবতী। কোন রকমে সংযত বাক্যব্যায়ে অশ্রুসম্বরণ করে বললেন, ওদের ভিতরে নিয়ে এস।

পুত্র বিরহে অঝরে কাঁদতে লাগলেন অম্বালিকা, তাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারলো না। তিনি ঘনঘন মুর্চ্ছা যেতে লাগলেন। একজন পরিচারিকা এসে রাজামাতা সত্যবতীর নিদের্শ মতো কুন্তী সহ পঞ্চ পুত্রকে নিয়ে গেলেন অন্দর মহলে।

ভীষ্ম ও বিদুরের তত্বাবধানে মহাসমারহে পান্ডু ও মাদ্রীর প্রেতকার্য সুসম্পন্ন হল। এই প্রথম আমরা ধৃতরাষ্ট্রকে সামান্য আবেগানুসারে বলতে শুনলাম, ভাই বিদুর, তুমি আমাদের পরম প্রিয়ভ্রাতা ও তার পত্নী দেবী মাদ্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যাতে মহাসমারোহে মর্যাদা সহকারে সুসম্পন্ন হয় তার ব্যবস্থাকর। পান্ডুর গচ্ছিত যে ধনরত্ন, বস্ত্র, গোধন আছে তা সমস্ত আর্থিগণের মধ্যে দান কর। তার পবিত্র প্রেতকার্যের জন্য আমার রাজকোষ সদা উন্মুক্ত থাকবে। তুমি দেবী কুন্তীকে দিয়ে মাদ্রীদেবীর সংস্কার করাও। মহিষী মাদ্রীকে এমনভাবে সুসংবৃত কর যাতে বাসুদেব বা সূর্যদেব তাকে দেখতে না পায়।

ধৃতরাষ্ট্রের এহেন বক্তব্যে বিদুর কিন্তু আদৌ বিমোহিত হলেন না। কারণ ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি জানেন, চেনেন। এই অন্ধরাজা যে কতটা চতুর, এবং ছলনা প্রবণ তা তিনি বহুবার টের পেয়েছেন। তিনি জানেন পান্ডুর প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের মনভাবে কথা। বরং বিদুরের সেই মুহুর্তে মনে হলো, পান্ডুর এই অকাল বিয়োগে সবচেয়ে খুশী হয়েছেন অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র। তার কারণেই আজ পান্ডুর এই অকাল বিয়োগ। তিনি একবার অনুরোধ করলে পান্ডু পত্নীপুত্রসহ রাজ্যে ফিরে আসতে পারতেন। তাকে তিনি এবং ভীষ্ম বহুবার অনুরোধ করেছেন কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র সেই অনুরোধে কর্ণপাত করেন নি, বরং নিশ্চিন্ত মনে সিংহাসনে বসে তিনি তার উত্তরাধিকারী হিসাবে নিজ পুত্রদের মনে আশা আকাঙ্খা জাগিয়ে তুলেছেন। একবারের জন্য ভাবেন নি পান্ডুর কথা। ভীষ্ম তাকে বহুবার

অনুরোধ করেছিলেন, অনুবোধ করে পাঠিয়েছিলেন বাজমাতা, অথচ তিনি প্রত্যেকের সমস্ত অনুরোধকে উপেক্ষা করেছেন। বরং চেষ্টা করেছেন বোঝাতে, আমি পাণ্ডুকে রাজ্যে ফিরে আসার জন্য অনুবোধ করবো কেন, আমিতো তাকে বনবাসের নির্বাসন দণ্ড দিই নি। সে স্বইচ্ছায় বন গমন কবেছে। তার মধ্যে বৈরাগ্যের উদয় হয়েছে, আমি তার সাধনা পথকে বিঘ্নিত করতে যাব কেন।

আজ এই মুহুর্তে দাঁড়িয়ে বিদুরের অনেক কথাই মনে পড়ছিল। মনে পড়ছিল ধৃতরাষ্ট্রের সেই চবম প্রশ্নটি,—"আচ্ছা যুধিষ্ঠীর এই বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র, সেই হল এই সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী আমি জানি। তবু প্রশ্ন করি, তারপর নিশ্চয় আমার পুত্র রাজা হবে।" লোভী ঈর্ষা পরায়ন একজন মানুষেব এই প্রশ্নের ইঙ্গিত ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। সকলেই বুঝেছিলেন কি বলতে চান ধৃতরাষ্ট্র। আর তার কথার মমার্থ বুঝেছিলেন বলেই মহামতি ভীষ্ম কোন উত্তর না দিয়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করেছিলেন। সেই প্রশ্নটা মাথায় আসতেই বিদুর যেন একটু বেশী সতর্ক হলেন।

ভীষ্ম সহ রাজপরিবারের গণ্যমান্য সকলে অশ্রুসজল নয়নে শবদেহ সমাহারে এসে উপস্থিত হলেন ভাগীরথীর তীরে। তারপর দুই মৃতদেহকে ঘৃত, অগুরুগন্ধে ও চন্দনে সিক্ত করে বহু মুল্যবান কাঠের দ্বারা দাহ কার্য সুসম্পন্ন করা হল।

এদিকে অম্বালিকাকে নিয়ে মহিলারা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। পুত্র হারা জননী ঘন ঘন মুর্চ্ছিত হয়ে পড়ছেন। তাকে সান্ত্বনা দেবে কে? রাজমাতা সত্যবতী তিনি নিজেই শোকে বিহ্বল, দিশাহারা। তিনি কিছুতেই পাণ্ডুর এই অকালমৃত্যুকে মেনে নিতে পাচ্ছেন না। তার নিজের দুই পুত্র এইভাবে অকালে চলে গেছে। পুত্রের অকাল বিয়োগ মায়ের হৃদয়কে যে কত গভীরভাবে ব্যথিত করে তা তিনি জানেন। অম্বালিকাকে সান্ত্বনা দেবার মতো কোন ভাষা তার নেই। বারবার তার মনে হল এই পরিবারে যে অকাল মৃত্যু ঘটছে, তারজন্য তার বাহিত পাপ-ই-দায়ী। তার পাপের ফলে ভরত-কুরুবংশের আয়ু ক্রমশ সীমিত হয়ে আসছে। অদুর ভবিষ্যতে এইবংশের আয়ু হয়ত আরও সংক্ষীপ্ত হবে। তিনি ক্ষুব্ধ ধৃতরাষ্ট্রের আচরণে। এতবার তাকে তিনি

অনুরোধ করে পাঠানো সত্ত্বেও, একবারের জন্য তিনি তার কথায় কর্ণপাত করেন নি। বরং ধৃতরাষ্ট্রের উত্তর শুনে ভীষ্মকে বলেছেন, ধৃতরাষ্ট্র স্পর্ধার গণ্ডি অতিক্রম করে যাচ্ছে, তোমরা যদি ওকে এখুনি সংযত করতে না পার, তাহলে ভবিষ্যতে এর ফল হবে মারাত্মক। ভীষ্ম নিরুত্তর। রাজামাতার বুঝেছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের আচরণে ভীষ্ম'ও তার প্রস্তাব কার্যকর করতে অপারক। হাজার হোক সে রাজা। রাজাকে লক্ষণ ভীষ্ম কিভাবে করবেন, তিনি যে এই বংশের রক্ষক ও অভিভাবক। নিজেকে তাই সেদিন ধীক্কার দিয়েছিলেন রাজমাতা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এই রাজপুরীতে এখন সমস্ত কিছু ধৃতরাষ্ট্রের অধীনে চলছে। পুরোনো কোন নিয়ম সে মানছে না, শুধু নিয়ম ভেঙ্গে যাচ্ছে একের পর এক। অথচ রাজমাতা হিসাবে তার করণীয় কিছু নেই। এখন তার আদেশ কেউ মান্য করে না। তার কথাকে গুরুত্ব দেয় না, বয়স্কাবৃদ্ধা বলে তাকে সকলে একপাশে সরিয়ে রেখেছে। এই পরিবারের মধ্যে এখন চলেছে ধৃতরাষ্ট্র ও তার শ্যালক শকুনির প্রভাব। মাঝে মাঝে অসহ্য লাগে সত্যবতীর, কিন্তু অসহ্য লেগে কোন লাভ নেই। তার এই শূন্য জীবনে একমাত্র মহামতি ভীষ্মই হলেন আশ্রয়— সেই ভীষ্ম পর্যন্ত আজ উপেক্ষিত। কৌরব রাজসভায় এখন তার অবস্থান নেহাতি দর্শকের মতো। ধৃতরাষ্ট্র যা করে চলেছেন, তাতে আগামী দিনে সমগ্র বংশ যে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়বে তা নিয়ে কোন সংশয় সত্যবতীর মধ্যে ছিল না। ভাবতে গিয়ে তার মনে হয়েছে, দোষ তার নিজের। তারই কারণে এই বংশের প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে তার পালিত পিতা বঞ্চিত করেছেন তার কল্যাণ কামনায়। কিন্তু এই কল্যাণতো তিনি চাননি। তিনি চেয়েছিলেন সুস্থ জীবন, পরম নির্ভরতা। হায়রে বিধাতা এই কি তোমার ইচ্ছা ছিল! সেদিনের এক পাপের ফল যে এত সুদর প্রসারী হতে পারে এই ধারণা সত্যবতীর ছিল না। এখন তিনি জীবন থেকে সব কিছু হারিয়ে শূন্য হৃদয়ে একরাশ শোক বহন করে একাবারে জীবনের কিনারায় এসে ঠেকেছেন। তিনি বুঝতে পারছেন তার পাপের ফলে একটা সুশোভিত মর্যাদা সম্পন্ন বংশ শেষ হতে চলেছে। এই সর্বনাশ থেকে কোনভাবেই হস্তিনাপুরের ভরত-কুরু বংশকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত চতুর। পান্ডু ও মাদ্রীর পারলৌকিক কাজ অত্যান্ত জাঁকজমক ভাবে অনুষ্ঠিত করলেন। ব্রাহ্মণদের ভূমিদান, গ্রামদান, গোদান করা হল। শ্রাদ্ধকার্যে উপস্থিত হলেন মহাভারতের কবি স্বয়ং ব্যাসদেব। তাকেতো আসতেই হবে। তার না এসে কোন উপায় নেই। প্রত্যক্ষভাবে না হোক পরোক্ষভাবে তিনি হলেন ভরতবংশের একজন অন্যতম পুরুষ, তাবই ঔরসের ধারায় এই বংশ রক্ষিত হয়েছে। কাজেই তাকে বাদ দিয়ে তো কোন ক্রিয়ানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হতে পারে না। মৃত পান্ডুর পিতা হিসাবে যতই বিচিত্রবীর্যের নাম উচ্চারিত হোক না কেন, পান্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের পিতাতো তিনি স্বয়ং। অতএব পুত্রের পারলৌকিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানে তার মতো একজন ত্রিকালদর্শী ঋষির উপস্থিত ঘটবে না এমন তো হতে পারে না। তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে চারদিক পর্যবেক্ষণ করলেন। এই সর্বজ্ঞান সম্পন্ন মানুষটি কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করতে পেরেছিলেন ভরত-কুরু বংশের বিপর্যয়কে। ধ্বংস আসন্ন প্রায়। ধৃতরাষ্ট্রের হিংসা, দুর্যোধনের প্রতিহিংসা, ক্রোধ এবং শকুনির নীচতা এইবংশকে দ্রুত ধ্বংসের দিকে নিয়ে চলেছে। এর থেকে ভরত-কুরু বংশের কোন মুক্তি নেই। মনে মনে তিনি কষ্ট অনুভব করলেন রাজমাতা সত্যবতীর জন্য। হাজার হোক তিনি হলেন এই মহাঋষির গর্ভধারিনী। সন্তান হিসাবে এমন-দুর্দিনে মায়ের পাশে দাঁড়ানো হল প্রধান কর্তব্য। রাজমাতা হিসাবে এই বিশালরাজপুরীতে যে তিনি একাকী, নিঃসঙ্গ এটা বুঝতে ব্যাসদেবের কোন অসুবিধে হল না। অথচ একদিন এই বৃদ্ধাই যৌবনে বৈরাগ্যের হাতছানিকে উপক্ষো করে, রাজ ঐশ্বর্যের পিছনে ছুটেছিলেন। চেয়েছিলেন ভোগ বিলাশ আর ঐশ্বর্য্য। তার পালিত পিতা দাসরাজ তার ভবিষ্যতকে কণ্টক মুক্ত করতে অত্যন্ত সুকৌশলে বঞ্চিত করেছিলেন এইবংশের প্রকৃত উত্তরাধিকারী শান্তনুর প্রথমা পত্নীর পুত্র গাঙ্গেয়কে। এ'যে কত বড় অন্যায় কাজ হয়েছিল সেদিন দাসরাজা নিজেও বুঝতে পারেন নি। সেই অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। বিধাতা এতবড় অপরাধ সহ্য করবেন কেন? ওই এক পাপের কারণেই সমগ্র ভরত-কুরুবংশের আজ এই দুরাবস্থা। অথচ সত্যবতীতো অনায়াসে পারতেন এই বৈভবের মোহকে পরিত্যাগ করতে। তিনি তো পেয়েছিলেন ব্যাসদেবের মতো একজন পুত্রকে,

পেয়েছিলেন পরাশরের মতো মহামুনির প্রেমস্পর্শ। তবু সেদিন তার কুমারী হৃদয় তাকে অধ্যাত্মিক সাধন পথে যেতে দেয়নি, তার চেতনার মধ্যে স্পষ্ট হয়নি সাধনতত্ত্বের গূঢ় রহস্য। তিনি যে দাসকন্যা নয়, তিনি বসুরাজার কন্যা—এই গরবে গরবিনী হয়ে তিনি চেয়েছিলেন রাজকন্যার প্রকৃত রাজসুখ। তাই পরাশরের কাছে চেয়েছিলেন অক্ষয় কুমারীত্ব। পেয়েও ছিলেন কুমারীত্ব মহামুনির আর্শীবাদে। ঋষির শুভ আর্শীবাদে তিনি রাজকন্যা হিসাবে পেয়েছিলেন রাজা শান্তনুর মতো একজন স্বামীকে, এসেছিলেন ভারতের বিখ্যাত কুরুবংশের রাজরানী হয়ে। কিন্তু সুখ কপালে না থাকলে কে তাকে সুখ দেবে। ভাগ্যের বিধান কারো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। সে চলে নিজের নিয়মে। যার ভাগ্যে সুখ লেখা নেই তাকে কে সুখী করবে? বয়সের ব্যবধান থাকা সত্বেও তিনি কেবল মাত্র রাজরানী হওয়ার আকাঙ্খা নিয়ে রাজা শান্তনুকে বিয়ে করলেন। কিন্তু সুখ তার কপালে সইল কোথায়। বিয়ের কয়েক বছর দুই পুত্রকে কোলে নিয়ে যখন তিনি সুখ স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন, তখনই চলে গেলেন রাজা শান্তনু। তারপর থেকেই শুরু হল হস্তিনাপুরের কুরুবংশের চ্ছেদ। স্বাভাবিক বংশধারা রক্ষিত হল না। বংশধারা রক্ষার জন্য দায়িত্ব নিতে হলো কুমারী বাসবীর ঋষিপুত্র ব্যাসদেবকে। অথচ আশ্চর্য্য! জন্মদানের পর মুহূর্ত থেকে এই ঋষি পুত্রের প্রতি তার কোন দায়বদ্ধতা ছিল না। রাজসুখে দিন কাটাবার সময় একবারের জন্য তার মনে পড়েনি কুমারী অবস্থায় তার গর্ভজাত ঋষি সন্তান ব্যাসদেবের কথা। মনে পড়লো কখন, যখন তিনি বিপন্ন—ভরতবংশের বংশধারা ব্যহত হওয়ার মুখে। এরজন্য সর্বত্যাগী ঋষির মনে মায়ের প্রতি কোন অভিযোগ ছিল না। বরং তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি মাতা সত্যবতীর আদেশকে। যখন মা হয়ে সত্যবতী তাকে ডেকেছেন তখনই হাজির হয়েছেন বাসবীর পুত্র ব্যাসদেব। মা বলে সম্ভাষণ করেছেন। কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। আসলে ব্যাসদেব তার কুমারী মাতা রাজনন্দিনী বাসবীর কাছে এই মুল্যবান জীবনের জন্য ঋণি। এই ঋণ শোধের কারণেই তিনি যেন মাতৃপ্রেমে বিভোর হয়েছিলেন। হাজার হোক তার মতো একজন পবিত্র নারীর গর্ভ না পেলে মুনি পিতা পরাশরের পক্ষে তাকে জন্ম দেওয়া সম্ভব হত না।

তিনি জানতেন ঘটনা পরাপরায় তাকে মায়ের কাছে আসতে হবে। তাই জন্ম মুহূর্তে পিতার সঙ্গে বনগমন কালে বলেছিলেন—'আপনি প্রয়োজন হলে আমাকে স্মরণ করবেন, আমি যেখানে যে অবস্থায় থাকি না কেন আপনার কাছে উপস্থিত হব।' সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার কারণে ব্যাসদেবের হস্তিনাপুরে আসা—রক্ষা করা বিখ্যাত ভরত-কুরুবংশকে। আসলে এক আর্যঋষির তেজ সত্যবতীর দেহে সঞ্চারিত হয়েছিল—সেই সৌভাগ্য বশত ব্যাসদেবের মতন সন্তান তার বংশধারাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কর্মফলের গন্ডি সত্যবতী অতিক্রম করতে পারেন নি। ভীষ্মের প্রতি বঞ্চনা তাকে আজ এক মহাশূন্যতার মধ্যে এনে দাঁড় করিয়েছে। জীবনের কাছে ভাগ্য শুভফল দায়ক হলেও, কর্মদোষে ভাগ্যের সুফল স্পষ্টত প্রকাশ পায় না। তাই হয়ত সত্যবতীকে পরাশরের স্নেহধন্যা হওয়া সত্বেও, ব্যাসদেবের মতো ঋষি সন্তান পাশে থাকা সত্বেও গঙ্গাপুত্রের প্রতি বঞ্চনার কারণে তাকে প্রতিমুহূর্তে আত্মপ্রবঞ্চনার যন্ত্রনায় ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছে।

পান্ডুর শ্রাদ্ধক্রিয়া শেষ হল। সমগ্র রাজপুরি শোকস্তব্ধ, হস্তিনাপুরে ঘিরে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। কারো মুখে কোন কথা নেই। মহামতি ভীষ্ম বেদনাহত। ভাতৃশোকে কাতর হয়ে পড়েছেন ধর্মাত্মা বিদুর। রাজামাতা সত্যবতী শোকে পাথর হয়ে গেছেন। জীবনে প্রিয়জনের মৃত্যু দেখতে দেখতে এখন তার দুচোখের জল শুকিয়ে গেছে৷ নিজের কক্ষে বিষন্ন চিত্তে বসে ভরাক্রান্ত মন নিয়ে তিনি ভাবছিলেন, তাকে আর কত মৃত্যু দেখতে হবে, আর কত শোক সহ্য করতে হবে, আর কত কঠিন দুঃখকে সহজ ভাবে মেনে নিতে হবে। কিসের অপরাধে তার এমন ভাগ্য বিপর্যয়। জন্ম মুহূর্ত থেকে ভাগ্যের এই বিপর্যতা তাকে সহ্য করতে হয়েছে। মাতাকে তিনি দেখেন নি, পিতাকে তার জানা নেই। শুধু জানেন তিনি ছিলেন বসুরাজের কন্যা। মাতার মানকুল সম্মানের না হওয়ার কারনে, তিনি কন্যাসন্তান হওয়ার অপরাধে তার পিতা বসুরাজ তাকে ত্যাগ করেছিলেন, তুলে দিয়েছিলেন দাস পিতার হাতে। রাজকন্যা হয়ে তাকে বড় হতে হয়েছে কৈবর্ত পল্লীতে। যে রাজসুখ-ভোগের ইচ্ছায় তিনি রাজা শান্তনুকে বিয়ে

করেছিলেন সেই সুখ তার সহ্য হয়নি। যৌবনে বৈধব্য যন্ত্রনা সহ্য করেছেন। একজন নারীর পক্ষে যৌবনে বৈধব্য যন্ত্রনা সহ্য করা যে কত কঠিন তা তিনি জানেন আর সেই অভিজ্ঞতার কারণে আজ তার যৌবনবতী কুন্তীর দিকে তাকাতে কষ্ট হচ্ছে। দুই চোখ জলে ভরে ওঠে—বুক থেকে উঠে আসে দীর্ঘশ্বাস। গন্ডদেশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে মুক্তার বেদনাস্র।

হায়রে জীবন কি নিষ্ঠুর—মানুষ তার পরিণতির কথা আগেভাগে জানতে পারে না বলেই তাকে অকারনে পথ চলতে চলতে কর্মফল অনুসারে দুঃখুকে বরণ করে নিতে হয়। সেদিন যখন ভীষ্মকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেওয়ার পর দাসরাজা নিশ্চিন্ত মনে সত্যবতীকে হস্তিনাপুরে স্বামীর গৃহে পাঠিয়েছিলেন —সেদিন কি তিনি জানতেন বসুরাজের কন্যাকে জীবনভোর শুধু দুঃখ বহন করতে হবে। রাজসুখ, ঐশ্বর্য্য, বৈভব সব কিছু ভেসে যাবে এক বঞ্চনার কারনে। বারবার ঘুরে ফিরে ভীষ্মের কথাই মনে হয় সত্যবতীর। কি অসাধারণ ধর্ম সচেতন, কর্মবীর, দায়িত্ব সচেতন এই মানুষটি। শান্তনুর প্রথমা মহিষী গঙ্গা সত্যি ভাগ্যবতী—প্রনম্য দেবী, তা নাহলে তিনি ভীষ্মের মতন সন্তান প্রসব করলেন কি করে। রাগ নেই, অভিমান নেই, হিংসা নেই, প্রতিহিংসা নেই, শুধু আছে ধর্মরক্ষার প্রতিশ্রুতি, আছে কর্মে সততা। তিনিও তো মহারাজ শান্তনুর ঔরসজাত সন্তান—ওই একই ঔরসে তার গর্ভজাত সন্তানেরা তো কেউ প্রকৃতভাবে মানুষ হল না, দীর্ঘায়ু পেল না—এতো একমাত্র তার পাপের ফল। তিনি এখন এই বংশের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করে বুঝতে পেরেছেন মহারাজ শান্তনুর প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন এই ভীষ্ম। ন্যায়, নীতি, ধর্ম, সত্যকে অত্যন্ত সততার সঙ্গে রক্ষা করেছেন মানুষটি। অথচ একদিন রাজসুখের মোহে পড়ে তিনি এই দেবতুল্য, ঋষিতুল্য মহারাজ শান্তনুর যোগ্য ও প্রকৃত উত্তরাধিকারী সন্তানকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করেছিলেন। ভেবেছিলেন ভীষ্মকে বাদ দিয়ে তার দুই পুত্রের প্রতিষ্ঠার মধ্যে রাজামাতা হয়ে হস্তিনাপুরে চিরসুখে বিরাজ করবেন। কিন্তু কোথায় গেল তার সেই প্রত্যাশা? তিনিতো এখন ভিতরে ভিতরে শূন্য হয়ে গেছেন। চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর থেকে তিনি ভীষ্মকে নিজের প্রয়োজনে, নিজের

সন্তানের প্রয়োজনে আঁকড়ে ধরেছেন। বুঝেছেন সমগ্র হস্তিনাপুরে একমাত্র তিনি হচ্ছেন তার নির্ভরযোগ্য আশ্রয়, যাকে আশ্রয় করে থাকলে তিনি হয়ত বিপদ মুক্ত হতে পারবেন। দেবতুল্য পুত্র প্রতিম মানুষটি সত্যি একজন শুদ্ধাচারী পুরুষ। তাকে বঞ্চনা করার অপরাধে তার ভাগ্যদেবী তার প্রতি প্রসন্না হতে পারেন নি। সব কিছু দিয়ে আবার সব কিছুকে কেড়ে নিয়েছেন। হায়রে নিঠুর দরদী ভাগ্য—প্রথমে স্বামীর মৃত্যু, তারপর দুই পুত্রের অকাল মৃত্যু আর এখন পৌত্র পাণ্ডুর অকাল মৃত্যুর দুঃখু তাকে সহ্য করতে হচ্ছে। মৃত্যু আর মৃত্যু—এই মৃত্যুর কষ্ট তাকে যেন অসহ্য করে তুলেছে। নিজের কাছে নিজেকে একজন সর্বহারা নারী বলে মনে হয় তার। রাজমাতা বলে একদিন যে দাপট, যে অহংকার তার ছিল, এখন সেইটুকুও হারাত বসেছেন। আগের মতো কেউ আর তার কাছে পরামর্শ নিতে আসে না। আসে না শ্রদ্ধা ও সন্মানের দায়বদ্ধতা প্রকাশ করতে। একমাত্র ভীষ্ম—তিনি আসেন। তার বিষন্নতা আরও যেন অসহায় করে তুলেছে সত্যবতীকে। তিনি বুঝতে পাচ্ছেন ধৃতরাষ্ট্রের উদ্ধত্ত আচরণে ভীষ্ম ক্ষুব্ধ, ধর্মজ্ঞ বিদুর অসন্তুষ্ট। তারই কারণে পাণ্ডুর সিংহাসন ত্যাগ করে বনগমন। অথচ তিনি আবার ভীষ্ম বলেছেন, 'ধৃতরাষ্ট্র অন্যায় করলেও তাকে তুমি পরিত্যাগ কর না।' কেন এমনটা বলেছেন সত্যবতী—বলেছেন স্নেহের বশে, মায়ার বশে। হাজার হোক সে হল এই বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র, অন্ধত্বের কারনে সিংহাসন বঞ্চিত হওয়ার জন্যে তার মধ্যে বেদনা থাকতেই পারে—সেই বেদনার ক্ষোভটুকু যেন ভীষ্ম ক্ষমা করে দেন।

সত্যবতী অনুরোধের কারণেই হয়ত ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রের আচরণে মনে মনে ক্ষুব্দ ও অপমানিত হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে সংযত রাখেন। আগে আগে ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। ধর্মের কথা বলে তাকে সংযত করার চেষ্ট করতেন। এখন ভীষ্ম রাজসভায় এক নীরব দর্শক মাত্র। তিনি বুঝতে পেরেছেন ধৃতরাষ্ট্র সকলকে উপেক্ষা করতে চাইছেন শকুনির প্ররোচনায়। মানুষ যখন অসৎ সঙ্গদোষে ভুল পথে চালিত হয় তখন তাকে ধর্মের কথা বলে কোন সুফল পাওয়া যায় না। তখন তার কাছে তার কর্মই সঠিক বলে মনে হয়। এই কর্মফলের কারণে ভবিষ্যতে তাকে কঠিন ফল পেতে হয়। অনেক সময় ধর্মজ্ঞ বিদুর

প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করেছেন—কিন্তু চতুর ধৃতরাষ্ট্র শান্তভাবে তার উষ্মাকে এড়িয়ে গেছেন। সকলের সব কিছু উপদেশ শুনে তিনি শকুনির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করেছেন। তবু প্রশ্ন থাকে ভীষ্ম কেন একবারের জন্যেও প্রকাশ্যে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করলেন না। তিনি তো ধৃতরাষ্ট্রের বিকৃত মানসিকতাকে অনুভব করেছিলেন। এর উত্তরে বলা যায় ভীষ্ম হলেন এই রাজবংশের রক্ষক ও অভিভাবক। একজন দক্ষ অভিভাবক হিসাবে ধৈর্য ও সহ্য ক্ষমতাকে তিনি প্রকাশ করেছেন। পিতা শান্তনুকে তিনি কথা দিয়েছিলেন একজন প্রকৃত রক্ষক হিসাবে তিনি এই বংশকে রক্ষা করবেন। রাজমাতা সত্যবতীর অনুরোধ করেছেন তিনি যেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে ত্যাগ না করেন—কাজেই সত্যরক্ষার কারণেই ভীষ্মের পক্ষে সম্ভব হয়নি ধৃতরাষ্ট্রে প্রতি বিরূপ আচরণ প্রকাশ করা।

পান্ডুর অকাল মৃত্যু ভীষ্মকে আবার নতুন এক প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বেড়ে গেছে তার দায়িত্ববোধ। ধর্মত পান্ডুপুত্র যুধিষ্ঠীর হলেন ভারত-কুরু বংশের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র এবং তার জ্যেষ্ঠ পুত্র নাবালক দুর্যোধনের আচরণে তিনি যথেষ্ট ভাবিত। রাজমাতার মনেও এখন পান্ডু পুত্রদের নিয়ে নিরাপত্তার প্রশ্ন এসেছে। বালক দুর্যোধনের আচরণ এবং তার প্রতি গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রশয় তাকে শঙ্কিত করে তুলেছে। তাই তিনি পান্ডুর মৃত্যুর বহু আগেই পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার মুহুর্তে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন—পান্ডু পুত্র যুধিষ্ঠীর এইবংশের জ্যেষ্ঠপুত্র। অতএব সেই ভাবে এই বংশের ভবিষ্যত রাজা।

বিপন্ন রাজমাতা সত্যবতী আপন চিন্তায় ক্ষতবিক্ষত। তিনি কক্ষের বাইরে আসেন না। ভীষ্ম দেখা করতে এসে দরজা বন্ধ দেখে ফিরে যান।

ব্যাসদেব এই সময় হস্তিনাপুরেই ছিলেন। হয়ত আশ্রমে ফিরে যাওয়ার তোড়জোড় করছিলেন। এইসময় একদিন বিদ্ধস্ত ভীষ্মদেব এসে ব্যাসদেবকে প্রণাম করে রাজমাতার মনের দুর্বিসহ আস্থার কথা জানালেন। ব্যাসদেব বললেন—মানুষ নিয়তির অধীন। সংসারে দুঃখু, কষ্ট, জরা, ব্যধি, মৃত্যু থাকবেই—এরজন্য মানুষের উচিত আগে থেকে

সর্তক হয়ে নিজেকে মায়ামুক্ত করা। মা, সংসারের মায়ায় জড়িয়ে আছেন বলেই তাকে এত দুঃখু পেতে হচ্ছে।

ভীষ্ম বললেন—আপনি ওকে বোঝান। একমাত্র আপনি পারেন তাকে এই শোকমুক্ত হওয়ার মন্ত্র দিতে। ব্যাসদেব বললেন, মহাপ্রাণ ভীষ্ম, আপনি ভাগ্যবান। সংসারে থেকেও আপনি নিজেকে বৈরাগ্য সাধনে নিয়োজিত রেখেছেন। আর সেই কারণে আপনার নিরাসক্ত চিত্তে কোন দুঃখের কালিমা নেই।

—আছে।

—জানি, যেটা আছে সেটা হল আপনার ধর্মরক্ষার্থে পিতাকে কথা দেওয়া। শুনুন মহামতি ভীষ্ম সন্তানের কর্তব্য হল পিতামাতার কথাকে রক্ষা করা। এই যে আমি হস্তিনাপুরে বারবার ছুটে আসি তা কেবলমাত্র মাকে কথা দেওয়ার কারণে। তাকে রক্ষার দায়িত্ব আমার। আর আপনাকে হস্তিনাপুরে থাকতে হবে যেহেতু আপনি আপনার পিতাকে কথা দিয়েছেন এই বংশকে আপনি প্রাণ দিয়ে রক্ষা করবেন। অতএব আপনাকে আমৃত্যু সমস্ত দুঃখু কষ্টের মধ্যে দিয়ে এদের রক্ষার ভার নিতে হবে। আর এখন আপনার কাছে গুরু দায়িত্ব হল পান্ডুর স্ত্রী কুন্তী এবং তার পঞ্চপুত্রকে রক্ষা করা। আপনি একজন নিষ্ঠাবান জ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞ এবং ধর্মাত্মা কাজেই আপনাকে কিছু বলার নেই। এইবলে ব্যাসদেব ভীষ্মের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজমাতার কক্ষে প্রবেশ করলেন। বিষন্ন মুহুর্তে ঋষিপুত্র ব্যাসদেবকে সামনে দেখে মন ভরে গেল সত্যবতীর। তিনি অশ্রু সম্বরণ করে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। মহর্ষি দ্বৈপায়ন ব্যাস একজন ত্রিকালদর্শী পুরুষ। জ্ঞানে, অজ্ঞানে তিনি টের পান প্রতিটি মানুষের অন্তর ভাবনার স্পন্দন, তার কাছে কারো কোন কিছু লুকোবার নেই। তিনি হলেন মহাভারতের রচয়িতা—তার হাতেই, তার কল্প শক্তির মধ্যেই সমস্ত চরিত্রের বিন্যাস ঘটেছে। তিনি সত্যবতীকে শোকাচ্ছন্ন দেখে শান্ত কণ্ঠে বললেন, মাগো আপনি শোক পরিহার করুণ। মনুষ্য জীবনে শোক হল অনিবার্য ভবিতব্য। জীবন যত দীর্ঘায়িত হবে ততো বেশী মানুষকে শোক গ্রহণ করতে হবে। মহাত্মা পান্ডুর মৃত্যুর জন্য শোক করবেন না। তার জীবনের ভোগদশা শেষ হয়েছে তাই তার আর পৃথিবীতে থাকার কোন

প্রয়োজন ছিল না বলেই সে চলে গেছে। যে যায় সে ভালই যায়। কারো চলে যাওয়ার পথে অশ্রুজল ফেলে বাধা দান করা সমুচীন নয়, তাতে তার বৈকুণ্ঠ ধামে যাওয়ার পথে বাধারসৃষ্টি হয়। মনে রাখবেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই অনিত্য। আজ যা আছে তা কাল থাকবে না। সময় বদল হয়—সেই ভাবে বদলে যায় আমাদের চারপাশেব দৃশ্য। একদিনতো আপনার সব কিছু ছিল, আপনি কি কাউকে ধরে রাখতে পেরেছেন। রূপ, যৌবন, অহংকার, প্রাচুর্য, যশ, বৈভব কোনটাই চিরকাল থাকে না। ভবিতব্যকে তাই আমাদের মেনে নিতে হয়।

ব্যাসদেবের শান্ত সংযত দীর্ঘ সান্ত্বনা বাক্য শুনে সত্যবতী আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করে বললেন, তুমি সাধক, দেবর্ষি তাই কোন শোক তোমাকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু পুত্র, আমি একজন সামান্যা সংসারী নারী, কুরুবংশের রাজমাতা, তাই এই বংশের কারো অকাল মৃত্যুর দুঃখু আমাকেতো স্পর্শ করবেই বাছা। আমি এই শোক অতিক্রম করবো কি করে বল। স্নেহ মায়ার বন্ধনকে অতিক্রম করা যে বড় কঠিন।

ব্যাসদেব বললেন—আপনি সামান্যা নারী নন মা। আপনি আমার পরম শ্রদ্ধেয়া জননী। কুমারী অবস্থায় সেদিন যদি আপনি আমায় গর্ভেধারণ না করতেন, তাহলে আমার প্রকাশ সম্ভব হত না। দেখতে পেতাম না এই সুন্দর পৃথিবীকে। মাগো আমি আগামী দিনগুলোকে আমার চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

—কি দেখছ পুত্র?

—ভয়ংকর একদিন আসছে মা। আরও বেশী শোক, দুঃখু আরো বেশী মৃত্যু চারদিক থেকে আপনাকে গ্রাস করবে। আপনি এখানে থাকলে সেই শোকে ক্রমশ মুর্চ্ছমান হবেন। আপনার চোখের সামনে এই কুরুবংশ ধ্বংস হবে।

ব্যাসদেবের কথায় চমকে উঠলেন রাজমাতা সত্যবতী। রাজমাতা হয়ে একি তিনি শুনছেন মহর্ষি ব্যাসদেবের মুখ থেকে। তার কথাতো মিথ্যে হতে পারে না। তাই তিনি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—এই বংশ ধ্বংস হবে কেন?

ব্যাসদেব বললেন, ধর্মের কারণে অধর্মের ধ্বংস হয়। যে বংশধারা স্বনিয়মে এবং স্বগতিতে বৃদ্ধি পায় না, সেই বংশ ধ্বংস হতে বাধ্য। আপনি চিন্তা করে দেখুন আপনার এই বংশতো আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে কেবল আমার কারণে তারা আজও বর্ত্তমান। তবে আগামী দিনে পাপ, অনাচার আরও বৃদ্ধি পাবে, আর এই পাপের কারণে ধ্বংস হবে আপনার সাধের বংশ। তারপর সত্যবতীর দিকে তাকিয়ে বললেন, মনে রাখবেন পৃথিবী ক্রমশ যৌবন হারাচ্ছে। ক্রমশ পৃথিবী হচ্ছে শস্যশূন্যা, ফলহীনা। মানুষের জন্মহাব বেড়ে চলেছে। আপনার এই পরিবারের বর্ত্তমানে যারা আছে, তাদের দৌরাত্ম ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। সেই কঠিন দৃশ্য আপনার পক্ষে সহ্য করা হবে দুর্বিসহ। একদিন আপনি যে চোখে পৃথিবীকে সুন্দর দেখেছিলেন, সেই যৌবন বয়সের চোখের সৌন্দর্য আজ তার অবশিষ্ট নেই। হিংসা, ঈর্ষা, নীচতা, প্রতিহিংসা, স্বার্থপরতা, লোভ, কাম পৃথিবীকে ক্রমশ রূপহীনা করে তুলছে। যা এখনও কিছু বর্ত্তমান আছে, আগামী দিনে সেটুকুও থাকবে না। ছলনা, কপটতা বাড়বে, যত রকমের পাপ আছে তা গ্রাস করবে পৃথিবীকে। লুপ্ত হবে ধর্ম, সদাচাব, লোকাচার। হানাহানি, মারামারি রক্তারক্তিতে রাঙা হয়ে উঠবে এই শ্যামল সুন্দর বসুন্ধরা।

—তাহলে এই অবস্থা থেকে আমার পরিত্রানের উপায় কি বৎস?

—সংসার বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া।

—আমিতো সংসার বাসনা থেকে মুক্তি পেতে চাই।

ব্যাসদেব হেসে বললেন—এই চাওয়া আপনার সত্য নয়। সত্য এটাই আপনি কি পারবেন সংসারে মোহবন্ধন থেকে মুক্ত হতে?

—কেন পারবো না?

ঋষিপুত্র দ্বৈপায়নব্যাস হেসে বললেন—আপনি বলছেন পারবেন, অথচ আপনার দুই চোখের কোলে এখনও পান্ডু বিরহের অশ্রু লেগে আছে। এমন মায়াময় শোক বুকে নিয়ে আপনি সংসার ত্যাগ কিভাবে করবেন মা? তারপর একটু থেকে পুত্র ব্যাসদেব বললেন—শুনুন মা, মৃত্যু হল জীবনের একটি স্বাভাবিক নিয়ম। এই নিয়মকে আমাদের নিয়ম বলেই মেনে নিতে হয়। পৃথিবীতে যা কিছু দেখছেন, তার ধ্বংস আছে। এই আমি, আপনি, আমাদের সকলকেই একদিন চলে যেতে

হবে। এই চলে যাওয়া যদি সত্যি হয় তাহলে শোক কার জন্য করবেন। তারপর কিছুক্ষণের জন্য ব্যাসদেব চোখ বুজিয়ে নীরব রইলেন। সত্যবতী অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ঋষিপুত্রের দিকে। ব্যাসদেব একসময় বললেন, শুনুন মা, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এক অনিবার্য বিপর্যয়। বর্ত্তমানে হস্তিনাপুরের যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার পরিণতী অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। আপনার প্রাচীন মুল্যবোধের সাথে আগামীদিনের মুল্যবোধের মধ্যে যে সংঘাত সৃষ্টি হবে, তা সহ্য করা আপনার পক্ষে হবে খুবই কঠিন।

আসলে ব্যাসদেবের কথার মধ্যে এক গূঢ় ইঙ্গিত ছিল। তিনি বোঝাতে চাইলেন পাণ্ডু নেই কিন্তু তার পঞ্চপুত্র বর্ত্তমান। তারাই হল এইবংশের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। কিন্তু অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ঈর্ষার যে অনল প্রজ্বোলিত করেছেন, সেই আগুনে তার শতপুত্র দগ্ধ হবে। মহাশ্মশানে পরিণত হবে এই বিশাল সাম্রাজ্য। ধর্মের সঙ্গে অধর্মের এই সংঘাতে প্রচুর প্রাণ নাশ হবে। এত মৃত্যু সহ্য করা আপনার (সত্যবতী) পক্ষে কঠিন হবে। তাই বলছি মা, সময় থাকতে আপনি আমার সঙ্গে চুলন, এই পাপপুরী পবিত্যাগ করে আমার কাছে তপোবনে থাকুন। সেখানে যোগধর্মের দ্বারা আপনার মনের উত্তরণ ঘটবে। আপনি মায়ামুক্ত হবেন, অহংকার মুক্ত হবেন, শোকমুক্ত হবেন। পরম শান্তিতে জীবন শেষকটা দিন পরমাত্মার চিন্তায় আনন্দে কাটাতে পারবেন। আপনি যত সময় এই রাজবাড়িতে থাকবেন ততো সময় আপনি কেবল আপনার কুলের ক্ষয় দেখতে পাবেন।

সত্যবতী নীরব। তবু যেন মনের দ্বন্দ্ব দুর হতে চায় না। একদিন বড় স্বাদ করে তিনি এই সংসারকে সাজিয়ে ছিলেন—রাজমাতা হয়ে সকলের মধ্যে বেঁচে ছিলেন—সেই সাধের সংসার ছেড়ে তিনি চলে যাবেন কি করে। এক কঠিন কষ্টবোধ তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে আকঁড়ে ধরে। সংসার বাসনাকে ছাড়তে যে বড় কষ্ট হয়।

সত্যবতীর মনের ভাবনাকে অনুধাবন করে পুত্র দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব এবার আরও কঠিন ভাষায় বললেন,—অপরাধ নেবেন না, যা সত্য তাই আজ আপনাকে বলছি। একদিন আপনি যৌবনের গর্বে আর কামনা ও বাসনায় উন্মত্ত থেকে নিজের অন্যায়কে প্রত্যক্ষ করতে পারেন

নি। মানুষকে তার নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়, আপনি এখন সেই কৃতকর্মের ফল ভোগ করছেন। গঙ্গাপুত্র ভীষ্মকে বঞ্চিত করে যে পাপ আপনি করেছিলেন, তারই প্রবাহধারা এইবংশকে সংক্রামিত করেছে। চিন্তা করে দেখুন, আপনার দুই পুত্র চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য—একজন ক্রোধ ও হিংসার বসে, অন্যজন কামাবশে অকালে চলে চলে গেছে। অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র যেদিন থেকে পাণ্ডু সিংহাসনে বসেছে সেই দিন থেকে তাব মৃত্যুকামনা করেছে' তার সন্তান দুর্যোধন হল কামনা, বাসনা হিংসা ও লোভের প্রতীক। প্রতিহিংসা ছাড়া সে আর কিছু জানে না। আমি বলে রাখি, সত্য বলে যদি কিছু থাকে, তাহলে সেই সত্য হলো—ওই সন্তানই হবে এই বংশের ধ্বংসের কারণ। রাজমাতা হয়ে আপনি ধৃতরাষ্ট্রকে সংযত কবতে পারেন নি। পারেননি মহামতি ভীষ্ম ও বিদুরের কথা মেনে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে রাজমাতা হয়ে নিদের্শ দিতে—'ধৃতরাষ্ট্র তুমি তোমার ওই সদ্যজাত প্রথম পুত্র সন্তানটিকে ত্যাগ কর। আপনি সব কিছু দেখেছেন, বুঝেছেন আর মেনে নিয়েছেন। মহামান্য ভীষ্ম এই বংশের অভিভাবক হওয়া সত্বেও তিনি আপনার কারণেই অপারক ও নিস্পৃহ হয়ে পড়েছিলেন। আপনি তাকে ধৃতরাষ্ট্রকে ত্যাগ করতে নিষেধ করেছিলেন। আপনার কারণেই ভীষ্ম তার প্রতি কঠিন হত্তে পারেন নি। তাকে মুখ বুজে অপমান সহ্য করতে হচ্ছে। ধৃতরাষ্ট্র যে শকুনির পরামর্শে রাজকার্য চালাছে এই কথা জানা সত্বেও আপনি রাজমাতা হয়ে তাকে ডেকে একবারের জন্য হুঁসিয়ার করে দেন নি। মা, আমার অপরাধ নেবেন না, যা সত্য আমি তাই বলছি। আপনার অন্যায়ের কারণে আজ এই বংশের এমন শোচনীয় অবস্থা। তারপর কণ্ঠস্বর নরম করে ঋষিপুত্র মাতা সত্যবতীর দিকে তাকিয়ে বললেন—মা, স্নেহ, প্রেম, মায়া এইগুলি সবই হল একেকটি সম্পর্কে বাধার শর্ত, তবে দেখতে হবে এই কোনটাই যেন মাত্রা ছাড়া না হয়ে যায়। সংসারের মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া খুব কঠিন। আপনি যদি সেই মায়াবন্ধন থেকে মুক্ত হতে না চান তাহলে এই অভিশপ্ত রাজপ্রসাদে আবদ্ধ থাকুন। আমি আপনাকে বাধা দেব না। শুধু বলবো, এই প্রসাদে বসে থাকলে আপনাকে এখানে চিরবন্দিনী হয়ে স্বচক্ষে নিজের বংশের অনেক ক্ষয়কে

দেখতে হবে। সেই মৃত্যু, সেই শোক সহ্য করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই বলছি সময় থাকতে রাজমাতার শূন্য বৈভবের অহংকার পরিত্যাগ করে আমার সঙ্গে বনগমন করুন, অত্যন্ত আমার তপোবনে থাকলে জীবনের শেষ কটা দিন শান্তিতে কাটাতে পারবেন।

সত্যবতী এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন পুত্র ব্যাসের কথা। তাঁর দুই চোখ বেয়ে অশ্রুঝরে যাচ্ছিল। তিনি বুঝতে পারলেন তার মহাঋষি পুত্র তাকে কি বোঝাতে চাইছেন। একদিন যে মহাঋষির সঙ্গ করে কুমারী অবস্থায় সন্তান পেয়েছিলেন, সেই ঋষি তাকে চেয়েছিলেন প্রকৃত বৈরাগ্যের পথে যুক্ত করতে। কিন্তু সেদিন তিনি গ্রহণ করেন নি। আজ সেই ঋষির ঔরসজাত পুত্র তার গর্ভধারিনীকে সেই পথে চলার নির্দেশ দিচ্ছেন, এই সুযোগ আর তিনি হেলায় হারাতে চান না। এখন তার আর সংসারের প্রতিমোহ নেই, নেই রাজসিক অহংকার। এখন তিনি আপন পরিজনের মৃত্যু দেখতে দেখতে শোকহীন শিলাময় মুর্ত্তিতে পরিণত হয়েছেন। এই প্রসাদ ত্যাগ করতে তার কোন দ্বিধা নেই।

মন ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয়। দুই চোখের জল. মুছে সন্ন্যাসিনীর মতো উঠে দাঁড়ান সত্যবতী। তার মনে হয় সত্যিতো কি হবে তার এই প্রসাদে থেকে, এতো মৃতসারের মধ্যে বাস করে রাজবৈভব ভোগ করা। এ'তো অর্থহীন, সম্মানহীন, আনন্দহীন, প্রেমহীন বৈভব। এর চেয়ে বৈরাগ্যে শ্রেয়—বৈরাগ্য সাধন'ই হল তার মুক্তির পথ। ওই পথে গিয়ে তিনি তার পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত করতে চান। তাই ঋষিপুত্র ব্যাসদেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি তোমার সঙ্গে যাব পুত্র। আমি প্রস্তুত হয়ে আছি। তবে তার আগে আমার কর্তব্য হিসাবে একবার অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে কথা বলে নিতে চাই। অম্বালিকা পুত্র শোকে কাতর—ওদের প্রতি আমার কিছু দায়বদ্ধতা আছে। এই দুই যুবতী নারী, তারাতো স্বামীর কাছ থেকে প্রকৃত পক্ষে কোন সুখ পাইনি। তারা গর্ভে যে সন্তান ধারণ করেছিল—সেতো তোমারই পুত্র। তুমি একবার ওদের কথা দুজনের ভাব।

একথা সত্যি মহাভারতের কবি এই দুই নারীর প্রতি প্রকৃতপক্ষে অবিচার করেছেন। রাজকন্যা হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে, মাতা হিসাবে—কোন অবস্থায় তাদের জন্য বেশী শব্দ ব্যয় করেন নি। তাদের বিবাহপর্বে

যে উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল, বিবাহের পর রাজপুরীতে প্রবেশ করে তা ম্রিয়মান হয়। কুরু পরিবারের রাজনীতির সঙ্গে এই দুই নারীর প্রকৃত পক্ষে কোন যোগ ছিল না। তাদের দুজনের মধ্যে কাউকে একবারের জন্য রাজসিক বিষয় সম্পদ নিয়ে কোন মন্তব্য করতে দেখা যায় নি। তারা সর্বদা সত্যবতীর বিশাল ব্যক্তিত্বের পাশে আড়াল থেকে গেছেন। সত্যবতীর স্নেহচ্ছায়ায় তারা ছিলেন যেন তার দুই পুত্রবধূ নয়, যেন দুই কন্যা। ফলে বিদায় মূহুর্তে সত্যবতীর ওদের দুজনের কথা মনে পড়লো। শুধু বললেন ব্যাসদেবকে—তুমি অপেক্ষা কর পুত্র, আমি রাজপুরী ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে একবার অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে কথা বলতে চাই। ওদের আমার কিছু কথা বলার আছে। আমি চলে গেলে ওরা দুইজনে এই বিশাল রাজপুরীতে বড় একা হয়ে পড়বে। এই বলে সত্যবতী ডেকে পাঠালেন তার দুই পুত্র বধুকে। তারা এসে দাঁড়ালেন। অম্বালিকার মুখে তখন পুত্র শোকের কাতরতা ছড়িয়ে আছে। সত্যবতী অম্বিকাকে লক্ষ্য করে বললেন, শোন কল্যানী, আমি এই প্রসাদ ও রাজসুখ পরিত্যাগ করে ঋষিপুত্র ব্যাসের সঙ্গে বনগমন করছি। তুমি এই মুহূর্তে তোমার কনিষ্ঠা অম্বালিকার দিকে তাকিয়ে দেখ সে পুত্রশোকে কতটা কাতর হয়েছে। আগামী দিনে এর চাইতেও বেশী শোক, তোমাকে বহন করতে হবে। সমগ্র কুরুকুল ধ্বংস হবে তোমার অন্ধপুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও তোমার আদরের নাতি দুর্যোধনের কারণে। যদি তুমি মনে কর সেই শোক তুমি সহ্য করতে পারবে তাহলে তুমি থাকতে পার। আর যদি মনে হয় সেই শোক তোমার পক্ষে সহ্য করা কঠিন হবে, তাহলে কনিষ্ঠা ভগ্নী অম্বালিকার হাত ধরে তুমি আমার পশ্চাৎ অনুসরণ কর। চল আমরা চলে যাই ব্যাসের পবিত্র আশ্রমে।

রাজমাতার কথায় তার দুই পুত্রবধু কেউই কোন উত্তর দিল না। সত্যবতী বললেন—কি ভাবছ? তোমরা কি আমার সঙ্গে যাবে? অম্বিকা বললেন—আমি তো সবসময় আপনাকে অনুসরণ করে এসেছি মা, অম্বালিকা বললেন—আমি আমার পুত্র শোকের যন্ত্রণা সহ্য করতে পাচ্ছি না। এখানে থাকলে অর কথা আমার আরও বেশী করে মনে

পড়বে। আমি এই শোক ভুলতে চাই। তাই আমি মহাঋষির তপোবনে যেতে প্রস্তুত।

তিন নারী তপোবনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে ব্যাসদেব যাত্রার উদ্যোগ শুরু করলেন। অম্বিকা ও অম্বালিকা যে ব্যাসের আশ্রমে সহজে যেতে রাজি হবেন এটা আমাদের বুঝতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কারণ এই দুই নারী সত্যবতীর মতো ব্যক্তিত্বপরায়না ছিলেন না। বরং তাদের উপস্থিতি একবারের জন্য মহাভারতের অন্যত্র কোন পর্বে পৃথক গুরুত্বে ধরা পড়েনি, তারা দুজনেই রাজমাতা সত্যবতীর স্নেহচ্ছায়ায় আবৃতা ছিলেন। কাজেই রাজমাতা রাজপ্রসাদ ত্যাগ করলে তাদের ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে অর্থহীন হয়ে যায়। আর তা ছাড়া ব্যাসদেব তো তাদের অত্যন্ত আপনজন। এতদিনে তারা দুজনেই ব্যাসদেবকে ভালোভাবে বুঝে গেছেন, চিনে গেছেন। একদিন এই মহাঋষির ঔরসে তারা দুজনেই গর্ভবতী হয়ে সন্তান ধারণ করেছিলেন, কুরুবংশের বিস্তার ঘটেছিল। কাজেই সেই অর্থ বিচারে বলা যায় এই মহামুনি তাদের স্বামী। কাজেই স্বামীর সঙ্গে স্বামী গৃহে যেতে তাদের আপত্তি থাকবে কেন। মনে মনে খুশী হলেন ব্যাসদেব। বোঝা গেল তিনি যেন ঠিক এমনটাই চেয়েছিলেন।

এ' এক অভাবনীয় দৃশ্য। রাজমাতা সত্যবতী তার দুই পুত্রবধুকে সঙ্গে নিয়ে রাজপ্রসাদ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, এমন একটা খবর রাজপুরীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লেও কারো মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। পরিচারিকারা কেবল রাজমাতাকে ঘিরে অশ্রু বিসর্জন করলেন। কুন্তীকে একবার মাত্র দেখা গেল। তিনি বিরস বদনে এসে তাদের প্রণাম করলেন। ব্যাস এইটুকু। কিন্তু গান্ধারী—সেই সতী-সাবিত্রী মহিলা গেলেন কোথায়? তিনি কি খবর পাননি, নাকি তিনি গৃহকর্মে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে রাজমাতাকে বিদায় মুহূর্তে মৌখিক শিষ্টাচারটুকু প্রকাশ করার অবকাশ পাননি। গান্ধারী সব জানতেন, তবু জেনে শুনে তিনি দেখা করলেন না। এমনকি অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র পর্যন্ত দেখা করলেন না। শুধু রাজমাতার বিদায় বেলায় কাছে এগিয়ে এলেন বিষন্ন বদনে ধর্মাজ্ঞ বিদুর সহ মহামতি ভীষ্ম। ভীষ্ম যে আসবেন এটা সত্যবতী

জানতেন। আর ভীষ্ম না এলেও তিনি নিজে গিয়ে দেখা করে আসতেন তার সঙ্গে। এই মানুষটি তো তাকে এতদিন প্রকৃত অভিভাবকের মতো আগলে ছিলেন। তিনি হলেন এই বংশের জ্যেষ্ঠ, অভিভাবক এবং রক্ষক। তাকে না জানিয়ে তার সঙ্গে দেখা না করে কি চলে যাওয়া যায়। সত্যবতীর সামনে এসে দাঁড়ালেন ভীষ্ম। বিনীতভাবে প্রণাম করলেন। সত্যবতী তার কাছে অনুমতি চাইলেন। ভীষ্ম বললেন, মা, মহাঋষি ব্যাসদেব স্বয়ং যখন আপনার এবং আপনার দুইপুত্র বধুর ভার গ্রহণ করেছেন তখন আমার কাছে আপনার কোন প্রশ্ন কর৷ সাজে না আর আমারও আপত্তির কোন কারণ থাকে না। তবে আপনি আমাকে এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে রেখে গেলেন। জানি না কুরুবংশ রক্ষার যে দায়িত্ব পিতা আমাকে অপর্ণ করেছিলেন, সেই মর্যাদা আমি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারবো কিনা—এখন আর আমার নিজের উপর আর সেই আত্মবিশ্বাস নেই।

সত্যবতী বললেন—তবু তোমাকে পারতে হবে। তোমার উপর ভরসা রেখে তোমার পিতা স্বর্গ গমন করেছেন, এখন আমিও বন গমন করছি। তুমি আমার পুত্র প্রতিম, তোমার উদ্যোগেই আমার এই পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। আমি এবং আমার পালিত পিতা একদিন তোমার প্রতি যে অবিচার করেছি, আজ যা কিছু ঘটছে এগুলি হল তারই সেই পাপের অকৃত্রিম ফল। তুমি আমাকে ক্ষমা কর পুত্র।

সত্যবতীর কণ্ঠস্বর ধরে এলে। ভীষ্ম সহাস্যে বললেন, মিথ্যে আপনার মার্জনা চাওয়া। গাঙ্গেয় কারো কোন অপরাধ মনে রাখে না। ক্ষমা, সহ্য, সংযম, ধৈর্য, ন্যায়-নীতি, ধর্ম—এগুলিকেই আমি সত্য বলে মানি। এই সত্যব্রত পালনই জীবনের লক্ষ্য। আমি আমার স্বর্গত পিতাকে যে কথা দিয়েছিলাম, সেই সত্যরক্ষার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করবো। তবে আপনি পাশে থাকায় এতদিন যে ভরসা ছিল, আজ এই মুহুর্ত থেকে সেই ভরসার স্থান আমি হারালাম। আপনার অনুপস্থিতি আমি এখন থেকে প্রতি মুহুর্তে অনুভব করবো। তারপর উদাস কণ্ঠে বললেন—আপনি শোক দুঃখু ভুলে বৈরাগ্য সাধনে মুক্ত হন, ঈশ্বর সাধানায় নিজেকে পবিত্র করে তুলুন এই আমার কাম্য।

সত্যবতী নিজের চোখের জল আড়াল করলেন। তারপর পা বাড়ালেন সামনের পথের দিকে। এই রাজপ্রাসাদ, রাজকীয় বৈভব সবকিছুকে চিরকালের জন্য ছেড়ে যেতে মন চায় না। তবু তাকে যেতে হয়। মন তাকে বলছে, আর নয়, অনেক হল, এবার তুমি সত্যের সন্ধানে পা বাড়াও। জীবনের সবপাপ ধুয়ে মুঝে পবিত্র হও। বৈরাগ্য সাধনের পথই হল মুক্তির পথ—ওই পথ ধরে এগিয়ে চল।

মহামুনি দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব চলেছেন আগে আগে। পিছনে চলছেন ওই অঙ্কিত পদচিহ্ন অনুসরণ করে তিন নারী। একজন জননী, অপর দুজন হলেন স্ত্রী—যাদের গর্ভে জন্মেছেন তার ঔরস জাত কুরুবংশের দুই সন্তান। মহাভারতের কাহিনীকার এই প্রসঙ্গে খুব একটা বর্ণনা দেননি। আসলে তিন নারীর মধ্যে কেউই নিজেদের অধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে নিজেদের পরিপূর্ণ ভাবে যুক্ত করতে পারেননি। সংসারের প্রতি তখনও ছিল তাদের মোহ। ব্যাসদেব তাদের মানসিক অবস্থা অনুধাবন করে বদরিকাশ্রমের একটি নির্জন স্থান বেছে নিলেন, সেখানে নিরুপায় হয়ে তিননারীর পক্ষে যোগাভ্যাস করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। ধীরে ধীরে একসময় তারা যোগ বলে মনসংযোগ উদ্যোগী হলেন। ব্যাসদেবের প্রেরণায় রাজমাতা সত্যবতীর অহংকারী মন আবরণ খসে গেল। একদিন কুমারী অবস্থায় মহামুনি পরাশরের আধ্যাত্মিক শক্তিকে অস্বীকার করে পুত্র প্রসবের পর অক্ষয় কুমারীত্ব নিয়ে মহারাজ শান্তনুর কামনার নারী হয়ে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করেছিলেন, আজ সেই তিনি জীবন সায়াহ্নে এসে সেই ঋষি পুত্রের প্রচেষ্টায় পরম বৈরাগ্যের পথ বেছে নিয়ে জীবনের প্রকৃত সত্যকে খুঁজে পেলেন। কুমারী মাতা বাসবীর এখানেই ঘটলো প্রকৃত উত্তরণ।